শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

তিন সঙ্গী ॥ ৫৭-সি কলেজ স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭৩

Shyamal Gangopadhyayer Galpasangraha
Volume I
Omnibus of stories by Shyamal Gangopadhyay

প্রথম প্রকাশ : পয়লা বৈশাখ, ১৩৭০

প্রকাশিকা : প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়
তিন সঙ্গী
৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রক : কৃষ্ণগোপাল মল্লিক
অধুনা
১৭/১ ডি, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

রমা মুখোপাধ্যায়

নীহারকুমার মুখোপাধ্যায়

আমার বোন ও ভগ্নীপতিকে

দখল

কলকাতা থেকে ছেচল্লিশ কিলোমিটার গিয়ে রেল লাইন শেষ। তারপর কয়েকখানা লঞ্চ আছে। সেসব না-থাকারই মত। কেননা, এদিকটায় এত নদী, এত খাল, তারই ফাঁকে ফাঁকে এখানে সেখানে এত ঘরগেরস্থালি যে, সব জায়গায় লঞ্চ যায়ও না। জায়গাগুলোর নানা রকমের নাম। লাট অঞ্চল। কেউবা বলে বাদা এলাকা। কেউ বলে আবাদ। বর্ষাকালে ডাঙার সঙ্গে যোগাযোগ কমে যায়। শীত এলে চলাচলের পথ নিরাপদ হয়ে ওঠে। কেনার লোক নেই—তাই ওখানে দুধ সস্তা। নতুন ধান উঠলে দর খুব কম থাকে। সেই একই কারণ। কেনার লোক নেই। বলা দরকার. ডাঙা মানে যেখান থেকে রেললাইনের শুরু। তা যাই হোক, বাদা হোক—যাই হোক—ওদিকটায় এখন পশারের আশায় ডাক্তারও গিয়ে বাসা বাঁধছে। সরকারী পরিবার পরিকল্পনার তাঁবুও পড়ে মাঝে মাঝে। এমন কি সিনেমাও যাচ্ছে।

ডাঙায় গোলমাল করে ওদিকটায় গিয়ে লোকে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। ফেরার সময় কারও বউ বা বোন ভাগিয়ে ফেরে। পথে এক একটা নদী পড়ে যায়। বেশীর ভাগই ভাঁটার সময় বুজে আসা বুক তুলে লঞ্চ কোমপানির বাবুদের ভাবিয়ে তোলে—আর খানিক খানিক স্মৃতি মুছতে মুছতে মেয়েমানুষেরা পিছটানের সবটুকু ঝেড়ে ফেলে ডাঙায় পা দেয়। রেলে চড়ে। তারপর আস্তে আস্তে কলকাতার পথে ভিখারী হয়। ঝি হয়। তেমন সুযোগ সুবিধা থাকলে চাইকি কেউ কেউ রক্ষিতাও হয়।

ছেলেছোকরারা এদিকটায় বসে ব্যবসা বলতে ট্রেনের কামরায় কামরায় পাউরুটি বেচে। ক'দিন পরে তারাই প্ল্যাটফর্মে তক্কে তক্কে থেকে ছিনতাই করে। দু'একজন বেরিয়ে গিয়ে ওয়াগন ব্রেকার হয়েছে। নয়ত বেশির

তাগই ভোরবেলা পানজাবি হোটেলের ঢাউস ঢাউস চুলোর ছাই ঘেঁটে কয়লা খোঁজে। তারপর আস্তে আস্তে বয়স হতে দেখা যায় এরাই কেউ পুরনো কাগজ কিনে বেড়ায়। কেউবা পুরনো গ্রামোফোন, টাইপরাইটার, টায়ার।

ন্যাশনালাইজেশনের পরে আমাদের এদিকটায়ও একটা ব্যাংক হয়েছে। তার বাবুরা দশটা দশের ট্রেনে এখানে এসে নামে। ডিপোজিট বিশ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ায় একজন অ্যাকাউন্টান্ট আসবেন শোনা যাচ্ছে। এখানে এত টাকা জমা পড়ার কারণও আছে। আবাদের সস্তার দুধের ছানা নিয়ে আমাদের গাঁয়ের উপর দিয়ে ট্রেন ভোরে কলকাতায় যায়। ফিরতি ট্রেনে এখানকার নতুন কলেজের মাস্টারমশাইদের নিয়ে ফেরে। আসলে আমাদের হল গিয়ে কেনাবেচার জায়গা। আটজন এম বি বি এস, সতেরোজন উকিল, একুশজন প্রাইমারি টিচার, একজন করে পোস্টমাস্টার, হেডমাস্টার, স্টেশনমাস্টার থাকায় আমাদের এই স্টেশনবাজার এলাকার বিরুদ্ধে অনেকেরই হিংসে। তাছাড়া একটি হেলথ সেণ্টার আছে। আছে পঞ্চানন অপেরা পার্টি। উপরন্তু ফি শনিবার গোহাটা বসে। তাতে দাড়িঅলা কাবলি ছাগলও আমদানি হয়।

বলতে গেলে অনেক কথা আছে আমাদের। শুধু এইটুকু বলি, আমাদের এখান থেকেই মাছ, মুড়ি, তাড়ি, ঠিকে ঝি, ভিখারি, জেন্টস ফার্স্ট লোকালে কলকাতায় যায়। কলকাতা থেকে লরিতে গম এলে এখানকার একান্নটা দশ-ঘোড়ার গম্কল গোঁ গোঁ আওয়াজ করে তাকে আটা বানায়। আবার এখানেই লোকের ওপর ভর হলে মাথায় ভরা-কলসি নিয়ে পঞ্চাননতলায় আসে। বিয়ের বাজারে একটা পার্টিই সব কটা রিক্সা সাইকেল ভাড়া নিয়ে ফেলে। তখন আর উপায় কি! হাঁটো একা একা। রবিবার ভাগা দিয়ে মাংস বিক্রি হয়। আমাদের এখানে কসাই তিনজন। থানা এখান থেকে পাঁচমাইল। ফাঁড়িতে একজন জমাদার থাকে। তার নাম তারাপদ মালাকার। বয়স কম। দিনে দুপুরে পরিষ্কার ঘুষ খায়, কোন ছাপাছাপি নেই।

একটা খাল আছে আমাদের এখানে। তা ঘুরে ঘুরে মগরমপুর পর্যন্ত গেছে। জল নোনা বলে চাষে লাগে না। মাছ হয়। লোকে সারাদিন ঘাঁটাঘাঁটি করে চাবলি, চিংড়ি, ট্যাংরা—যাহোক কিছু পায়। এই খালটাই তবু এখানকার কিছু আদি দৃশ্য ধরে রেখেছে। জায়গাটা নতুন হয়ে যাচ্ছে।

তার ভেতর এখানকার যা-কিছু পুরনো—তা এই খালেরই গায়ে। যেমন, বয়স্ক বিষধর সাপেদের গর্তগুলোর বেশির ভাগ এই খালেরই তোলা মাটির বাঁধে। বাঁধটার নাম অবশ্য কোমপানির বাঁধ। কেন যে তা কেউ বলতে পারে না।

দূর থেকে দেখা যাবে—বিশাল মাটির বাঁধ আকাশের সঙ্গে মিশে থেকে পেছনটা আড়াল করে আছে। তা এই খালেরই গায়ে রেল কোম্পানির একেবারে গোড়ার দিককার ইঁট বানানোর পুকুরমার্কা সব গর্তগুলো জলে বোঝাই হয়ে পড়ে থাকে। এখানেই এত লতাপাতা, জঙ্গল যে চরতে বেরিয়ে পাতিহাঁস শেয়ালের পেটে যায়। এই পথেই রেলের স্লিপার চুরি হয়ে জলে জলে ভাসিয়ে নিয়ে লোকে রাতারাতি করাতকলে চেরাই করে নির্দোষ তক্তা বানিয়ে ফেলে।

এখানে দিনের বেলা ছ' সাতশো বিঘা জুড়ে রোদ্দুর হাসে। বেশি রাতে চাঁদ এখানেই আলাদা রকমের তেরছা জ্যোৎস্না ফেলে। শান্ত স্তব্ধ গম্ভীর চৌকো জ্যোৎস্না। তার ভেতরে গভীর রাতের বাতাসে বুনো লতার ডগাগুলো তির তির করে কাঁপে। তখন মালগাড়ি শান্টিংয়ের আওয়াজ ইঁটখোলার জলেও কাঁপনি তোলে। গাছপালা ছাড়া এসব দেখার কোন সাক্ষী থাকে না তখন। দিনের বেলা হলে গরু চরাতে এসে রাখালরা তবু দেখে।

তা এখানে ভবেন এল। লোকটাকে লোকে ভবেন বলেই ডাকতে লাগল। মাথার টাক জুড়ে কিছু কাঁচাপাকা চুলের রেলিং। নোনাজলের পোড়খাওয়া গর্ত গর্ত মুখ। নাকের পাটা বাঁকানো বাঁকানো। গায়ে একটি রংচটা গলাবন্ধ গেঞ্জি। পরনে হাঁটুঝুলের ঢোলা হাফপ্যাণ্ট। খালি পা। তার দুটি আঙুলে আবার নখ নেই। চওড়া হাত জুড়ে জেগে ওঠা শিরার লাইন। চোখে ফাঁকা দৃষ্টি। তা এই ভবঘুরে প্যাটার্নের লোকটি এক শনিবার দুপুরে আবাদের দিক থেকে ট্রেনে এসে ডাউন প্ল্যাটফর্মে নামল।

সঙ্গে একটি মেয়েছেলে। কাপড়ের পুটুলিতে কিছু বরবটি। আর একটি মাটির হাঁড়ি। সবাই বলল, ও হল গিয়ে ভবেনের ভাগানো মেয়েমানুষ। দ্যাখো গিয়ে লাট অঞ্চলের কারো বউ টউ হবে। সেখানে নাকি আইন, সভ্যতা এখনো পাকাপাকি শেকড় নামাতে পারেনি। সবই শোনা কথা। এদিককার বেশির ভাগ ভদ্দরলোক-ক্লাশের লোকজন ভোর ভোর জুতোপায়ে

কলকাতায় চাকরি-বাকরি করতে যায়। সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফিরে সকালের কাগজ মন দিয়ে পড়ে। আর খালি পায়ের লোকজন জনখাটে। পাঁচ মাইল হেঁটে মেলায় যায়।

ক'দিনই কলকাতার ডেলি প্যাসেঞ্জাররা দেখলো, ডাউন প্ল্যাটফর্মে হাফ-প্যান্ট পরা একটা লোক ইটের চুলোয় কাঠকুটো গুঁজে ভাত সেদ্ধ করছে মাটির হাঁড়িতে। তার পাশে ঘোমটা টেনে একটি মেয়েছেলে ঘট হয়ে বসে থাকে।

ক'দিন বাদেই প্ল্যাটফর্ম আবার ফাঁকা। ওদের আর দেখাই গেল না। আমাদের এখানে আগের মতই লোকাল ট্রেনগুলো নিয়মিত লেট হতে লাগলো। সূর্য টাইম মত উঠতে লাগল। ফাল্গুন চৈত্রে আমাশার প্রকোপ কম বলে লোকাল ডাক্তারদের মুখগুলো শুকনো। পেশেণ্ট কম।

ওদের দেখা আবার যে প্রথম পেল বছর তিনেকের তফাতে সেদিনই সবে সে এখানে ফিরছে। আমাদের এখানকার সবেধন আধা-ডাকাত আধা-চোর। এমনি দেখতে মিনমিনে। চাদ্দিক আঁধার করা বর্ষার রাতে এই মানুষই সড়কি হাতে গোলা কেটে ধান সরায়। আমাদের আদরের সন্তোষ টাকি। মাথা-মুখ ছোবড়া ছাড়ানো পুজোর নারকেলটি। দু'টি ফিকে ভ্রূ ছাড়া ও তল্লাটে কোথাও একগাছি চুল নেই। তাই সন্তোষ টাকি।

আলিপুরে খালাশ পেয়েছিল ভোরবেলা। দশটা দশের ট্রেনে এখানে নেমে দেখে অনেক কিছু পালটে গেছে। তিন বছর আগে জেলে যাবার সময়কার স্টেশনমাস্টার, পোস্টমাস্টার, হেডমাস্টার—তিনজনই বদলি হয়ে গিয়ে নতুন লোক বসেছে। একটা ব্যাংকবাড়ি হয়েছে। লোকে সেখানে টাকা রাখে। একটা কলেজও বসেছে। হাতে ঘড়ি দিয়ে ছেলেরা পড়তে যায়।

তখন দুপুর বেলা। জুতো পায়ের লোকজন সব তখন কলকাতায়। জনখাটার লোকজন যে যার বাড়িতে খেতে গেছে। বিড়ি তামাকের দোকানদাররা ভয়ে ভয়ে একটা দুটো বিড়ি এগিয়ে দিল সন্তোষ টাকিকে।

কেউ বলল, এ-বেলাটা এখানে শুয়ে থাকো।

কেউ বলল, আর ওসব পথে না গিয়ে এবার খাটাখাটি করে খাও।

আরও অনেক কথা ঘুগনি খেতে খেতে সন্তোষ টাকি শুনলো। যেমন:

এবার একটা ঘরদোর বানিয়ে থিতু হও। বয়স তো বসে নেই।

তুমি তো ঝাড়া হাত পা। একটা পেটের জন্যে এত ঝামেলায় জড়ানো কেন? বেশ তো দোকান ঘরটর করে থেকে যেতে পারো।

আমি তো অন্য কোন কাজ জানিনে। লেকচার না দিয়ে একটা গ্লাস জল দে তো। গলায় আটকে যাচ্ছে ঘুগনি। জেলের সাঙাতরা বোধ হয় মনে নিচ্ছে।

বেলাবেলি নিজের কাজের জায়গায় রওনা দিল সন্তোষ টাকি। শীতে ভুগে ভুগে রোদটা এখন সবে কড়া হতে শুরু করেছে। মাটি এই সময় ফেটে ফেটে নুন তুলে দেয়। সেই গুঁড়ো মাটি ঝিনুক দিয়ে চেঁছে মাটির মালশায় তুলে নিয়ে বাড়ি গিয়ে জলে ফোটালে নুনটা তলানি হয়ে জমে। সেই নুন ভাতের পাতে খায়। আবার অভাবে পড়ে মুদি দোকানে দিয়েও আসে লোকে। তাতে পঞ্চাশ ষাট পয়সা যা আসে তাই লাভ।

খাল কাটার সময়কার কোন্‌কালের সেই তোলামাটি লোকের মুখে মুখে কোমপানি বাঁধ। রাখালরা গরু চরাতে এসে বলে—খালধার কিংবা খালপাড়। বিশাল ঢাল তুলে এবড়োখেবড়ো সে-মাটি সিধে দ্বারিকপোতার দিককার আকাশে উঠে গেছে। সেখানটায় খালটা দু' ফাঁক হয়ে দু' দিকে চিরে গেছে।

এখানটা নির্জন। লোকে বলে খালের তেমাথানি। এখানেই জানাশুনো গর্তে সন্তোষ টাকি যন্ত্রপাতি রাখে। দু' একবার সাপখোপ তাড়িয়েও যন্ত্রপাতি রাখতে হয়েছে। জিনিসপত্র পেলে ওখানকারই আশপাশের ঝুপসিজঙ্গলে দিনে দিনে সেঁধিয়ে রেখে রাতারাতি হাবিশ করতে হয়েছে তাকে। এই কোমপানি বাঁধেরই প্রায় আধাআধি অব্দি লোক নুনমাটি কুড়োতে আসে। জ্যোৎস্নারাতেও পায়েচলতি পথটাকে নুন ফুটে উঠে শাদা করে রাখে। বর্ষার জল দাঁড়ায় না। কিন্তু এঁটেল মাটি বলে পা ভীষণ হড়কায়।

কোমপানি বাঁধে উঠে সন্তোষ টাকি তো অবাক। সেই সে প্রায় তেমাথানির কাছাকাছি গিয়ে কে এখন নুনমাটি কুড়োচ্ছে। কার বুকে এত সাহস? এই অবেলায়। অমন নির্জনে? সূর্য সবে কাৎ হয়ে পড়েছে। বাঁধের আধাআধি পৌঁছে বুঝলো মেয়েছেলে। দিব্যি বসে পড়ে মাটি কুড়োচ্ছে।

আরও এগিয়ে সন্তোষ টাকি বুঝলো, মাটি কুড়োচ্ছে না। আসলে

ঝোড়ায় করে মাটি বয়ে দিচ্ছে। প্রায় চল্লিশ হাত রাস্তা হেঁটে গিয়ে মাটির ঝোড়া মাথা থেকে নামিয়ে দিল। আর সেখানে হাফপ্যান্ট পরা একটা লোক খালের জল দিয়ে সে-মাটি পায়ে মাড়িয়ে জাব করছে। একটা ঘরের দেওয়াল উঠেছে অনেকটা। পাশেই তালপাতার ঝুপড়ি। তার গা দিয়ে লাউচারা সবে সিধে হচ্ছে। কোত্থেকে দু'টো বাবলা গুঁড়ি ঠেসান দিয়ে খালের জলে ঘাটলাও তৈরি। সেখানে মাটি মাখানো ভাতের হাঁড়ি উপুড় করে বসানো। ভালো করে তাকালে গোড়ালি জলে আরো দু' একখানা জিনিস ভেজানো অবস্থায় দেখতে পেত সন্তোষ টাকি। কিন্তু সে তখন অনেক জিনিস একসঙ্গে দেখছিল। জাব মাটি চড়িয়ে চড়িয়ে দেওয়াল তোলা, লাউচারা, মেয়েছেলেটির মাটি বয়ে আনা, বিকেলবেলার কোমপানি বাঁধ।

জায়গাটি ভালো বেছেছো।

ভবেন কোন জবাব দিল না। শুধু একবার মেয়েছেলেটির দিকে চেঁচিয়ে বলল, এই দাক্ষী! ঢেলা ভেঙে গুঁড়ো মাটি আনবি বলে দিলাম।

সন্তোষের এই প্রথম একটি নতুন কথা জানা হোল। মেয়েছেলেটির নাম—দাক্ষী। পুরুষটার নাম তো জানা গেল না এখনো। ঢেলা মাটি মাড়িয়ে জাব বানাতে পায়ে তো লাগবেই। পুরুষ লোকটা, সন্তোষ টাকি ভালো করে দেখে বুঝলো, হাফ-ভিখারী, হাফ-গুণ্ডা। তেড়েমেড়ে ঝাঁপিয়েও পড়তে পারে। এক একবার খরচোখে তার দিকে তাকিয়ে ঠেকে রাখছে। এখানে তালপাতার ঘরে থেকে ঘর বানাচ্ছে যখন—সাহস আছে নিশ্চয়। সন্তোষ নিজে এদিকটায় রাতবিরেতে চলাফেরা করেছে। কিন্তু রাতে থাকেনি কখনো।

লোকটা জাব মাটি চড়াচ্ছিল দেওয়ালে। এইভাবেই খানিক গেঁথে জিরেন দিয়ে দিয়ে রোদে শুকিয়ে নিয়ে আবার গেঁথে তুলতে হয়।

সন্তোষ হা হা করে ছুটে গেল। কী হচ্ছে? মাটির ভেতর চুন দিলে না? বর্ষায় তো দ্যাল গলে যাবে—

একটা বর্ষা তো।

বাঃ! বছরে দুটো বর্ষা আসে নাকি। কী ধারার লোক বাপু তুমি?

ঝোড়া ফেলে দাক্ষীও কাছে এগিয়ে এল। আমিও তাই বললাম। তা কানে নেবে নাকি। শুধু বলে একটা বর্ষা তো মোটে!

নদীর নোনা বাতাস খেয়ে খেয়ে লোকটার সারা গা তামাটে। ক্ষয়া দাঁতে বুজ-বুজ করে হাসি কেঁপে উঠতে লাগলো। এক বর্ষার বেশি কুথাও তো থাকিনি। সন্তোষ টাকি দেখল, লোকটার হাসিমুখ, মাথার পেছনে বিকেলের বাড়তি রোদ মাখানো ঝাঁকড়া খিরিশ গাছটা খালের ওপারেই দাঁড়িয়ে। তার ওপাশে দ্বারিকপোতা পড়ে আছে। ওরা তিনজন এখন আকাশে উঠে যাওয়া কোমপানি বাঁধের ওপর।

একটা হেঁসো দাও তো দেখি। ছন ঘাস কেটে এনে দিচ্ছি। কুটি কুটি করে জাব মাটিতে মিশিয়ে নেবে। তারপর গাঁথো। ছ' বর্ষাতেও দ্যাল কাবু হবার নয়।

বেশ খেলা খেলা লাগছিল সন্তোষের। কোমপানি বাঁধে হাফ-ভিখারী হাফ-গুণ্ডা একটা লোক হাফ-প্যাণ্ট পরে দ্যাল গাঁথছে। দাক্ষী তার হয়ে ঝোড়ায় মাটি বয়। বিকেলের রোদ্দুরে মায়া ছিল। বাঁধের ঢাল বেয়ে সন্তোষ টাকি হেঁসো হাতে ঘাস কাটতে নেমে গেল। বেশ মজা তো। সন্তোষ টাকির এমন আরাম আগে কোনদিন হয়নি।

তারপর কিছু দিনের ভেতর জুতো পায়ে দেওয়া ভদ্দরলোকক্লাশের লোকজনদের বৌ-ঝিরা বিকেল বিকেল বেড়াবার অছিলায় কোমপানি বাঁধে পায়চারি করতে আসতে লাগল। স্টেশনমাস্টারের বউ পোস্টমাস্টারের বৌকে বলল, চলুন না দিদি—দু'জন পুরুষ একজন মেয়েছেলের দখল নিচ্ছে কি করে, দেখে আসি একবারটি—

এইভাবে কোমপানি বাঁধে ক্রমে ক্রমে লোক সমাগম হয়। বেশির ভাগই মেয়েলোক। তারা এদিক-ওদিক নিরামিষ চোখে তাকিয়ে বিশেষ কিছুই দেখতে পায় না। মাটির দেওয়ালে বাঁশের দরজা। ওপরে খড় চাপানো। একজন আরেকজনের কাঁধে ধাক্কা দিয়ে আঁচল ঢেকে হাসে। এ মাগো! একখানা ঘর! দু'জন পুরুষ। ঘেন্না! ঘেন্না!

দাক্ষী হয়ত তখন উবু হয়ে ন্যাকড়ার ওপর বড়ি শুকোতে দিচ্ছিল। কিংবা কোমপানি বাঁধের যে জায়গাটা একেবারে আকাশে উঠে গেছে— সেখানে দাক্ষী বিকেলের মোলায়েম রোদে চুল মেলে দিয়ে শুকোবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। তখনই দ্বারিকপোতার আকাশে একখানা মেঘ ঝুলে পড়ে। এ সব দেখার মত চোখ ভবেনের নেই। এ সব দেখার মত চোখ সন্তোষ টাকি কোত্থেকে যেন ফিরে পাচ্ছিল। বাবুদের বৌ-ঝিরা এ সব দেখে

শুনে আঙুল মটকে মুখে বলেছে, ঢঙ! আমরা কিছু আর বুঝি না? হেড-মাস্টারের সূতিকায় পারা বউ মনে মনে তিনবার বলেছে; গতর! গতর!! গতর!!! যেদিন থাকবে না?

পুরুষদের সময় কম। তারা যাওয়া আসার পথে যেটুকু দেখতে পেল, তা হল: হাফ-প্যান্ট ভবেন সাড়ে পাঁচ টাকা রোজে জয়াধানের বীজ ভাঙছে। রোয়া কেমন এখনো জানা যায়নি। কিছু ন্যালা ক্ষ্যাপা আছে। লোকে এইটুকু যা বলল।

ভদ্রেশ্বর পরামানিক বাবুদের গাল কামাতে কামাতে হেসে বলে, সন্তোষ টাকি এখন কোমপানি বাঁধে ঘর সারে। সারাদিন ঠুক্‌ঠাক। এখানে খড় চাপাচ্ছে। ওখানে মাটি লাগাচ্ছে। দিনি একবার মোটে বাজারে হাজিরে দেয়। বিড়ি, দেশালই, আলুটা, মুলোটা! এই আর কি।

বাবুরা আর ভদ্রাকে ঘাঁটায় না। কি বলতে কি বলে বসবে। মুখের তো কোন লাগাম নেই। সবাই জানে, ডাকাতির হুলুক-সন্ধান ভদ্রা গিয়েই সন্তোষকে দিত। দিয়ে ভাগা পেত।

তোর না গুরু?

সে ছিল এককালে। এখন কী আর পুরুষমানুষ আছে? তারপর ক্ষুরখানা চেটোয় মুছে গুনগুন করে তান দিল আর দাড়ির দানা দেখে দেখে ক্ষুর বোলাতে লাগল। কোমপানি বাঁধের বাইরে আর বেরোচ্ছে কোথায়!

ভবেন মানুষ না পাথর বোঝার উপায় নেই। জনখাটুনির মাঝে হন হন করে হেঁটে গিয়ে বেলা বারোটা নাগাদ পাউরুটি আর আলুর দম খায়। সঙ্গে ছেলেছোকরাদের টিটকিরি থাকে। আজ গিন্নি রাঁধেনি। না! বড় জামাই নে আছে!

ভবেন সোজা আকাশের দিকে তাকিয়ে পাউরুটি চিবোয়। কাজের সময় কথা বলে না। হাফ-প্যান্টটা কোমরে নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা। কাঁচাপাকা দাড়ি। মাথার চারদিকে কাঁচাপাকা চুলের রেলিং। নাকের পাটা বাঁকানো বাঁকানো। লম্বাপানা লোক। রাস্তায় হাঁটবে ঠিক সোজা তাকিয়ে। গুঁতো খেলে ব্যথায় কাতরায় না। চোখ কুঁচকে একবার মোটে পায়ের দিকে তাকায়। আবার লম্বা পা ফেলে ফেলে হাঁটে। রিলিফের আটা বিলির সময় লাইনেও অমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ধাক্কা খেয়ে এগোয় পিছোয়। কিন্তু কোনো কথা বলে না। পা মাড়ালে গালমন্দ দেয় না।

কালচে মুখের ওপর শাদাটে গোঁফ চকচক করে। সবসময় ভাবছে। ভাবছে। বাঁশী দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন গেলেও চমকায় না।

সন্ধ্যেবেলা বিড়ি দেশলাই যোগার করতে এসে সন্তোষ টাকি তুলসীর দোকান থেকে একখানা সাবান সরালো। তারপর সরকার অয়েল মিলে গেল খানিকটা সরষের তেল চাইতে। ওদের টিনের তলানি ঝরিয়ে নিতে দিলেই একটা শিশি ভরে যাবে। বেরোবার সময় দাক্ষী বলেছে, খালের মাছ তো সবাই ধরতে পারে। তেল কোথায়?

কেরোসিনটা, ভুট্টা, আটাটা ভবেন কষ্টেসৃষ্টে জুটিয়ে আনে। মাছ, আনাজপাতি—সে যেরকমই—সন্তোষ টাকি যোগার করে ফেলে। কাঠকুটো দাক্ষী সবসময়েই কুড়িয়ে এনে রাখে। কিন্তু সরষের তেলটা আর হয়ে ওঠে না। সন্তোষ টাকি দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সরকার অয়েল মিলের বড়জন বলল, তুই কেন পলা পেতে নিবি। ইদিক আয়। পাত্র এনেছিস—

শিশি দেখাতে সন্তোষকে বড় ট্যাংকের ওপাশে নিয়ে গেল। এ হল গিয়ে আটভাগ লাল সর্ষে। বাকিটা শ্বেত সর্ষে। এমন তেল বড়বাজারেও পাবিনে—

বড়বাবু। আমার হাতে কিন্তু পয়সা নেই।

তাতে কি! তুই এট্টা দেশের লোক। তাতে কি। তারপর বাড়তি তেলটা হাতের পাতায় মুছে খুব অন্তরঙ্গ গলায় বড়বাবু বলল, হ্যাঁরে, তোদের ওই মেয়েছেলেটার নাম যেন কি?

দাক্ষী। নাম দিয়ে কী হবে আপনার?

নাম না হলেও হোত বটে। তবে কিনা, শুনেছি ডাকিনী মন্ত্র জানে। তুকতাক করে। কি বলিস। হ্যাঁ—

তা করে! মজা পেয়ে সন্তোষ বলতে লাগল। বেশ করে—

কিরকম? গান-টান গায়।

শুধু গান! পূর্ণিমে রাতে কোমপানি বাঁধে একা একা নাচে। চুল অ্যালায়ে দে—

সন্তোষ জানতো, এই লোকটির দু'টি সরকারী বউ। তাছাড়া শেয়ালদায় পৃথক বাসায় একটি মেয়েমানুষও আছে। তার জন্তে শনিবার শনিবার বৈঠকখানা বাজার থেকে পৃথক বাজার করে। বড় বড় টমেটো। বড় বড়

কই। এখানকার অনেকেই দেখেছে।

এট্টু দেখাবি?

তেল তো নেওয়া হয়ে গেছে। সন্তোষ দোকান থেকে রাস্তায় নেমে বলল, বাঁধে উঠলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।

তা দিস বাপু। এ ঠ্যাং আর রেখে লাভ কি। একবারটি দেখাস। কাছ থেকে। কথা বলব না। দেখব একটু। গান শুনবো। নাচ হয় তো নাচ দেখাস খানিক। কি বলিস। হ্যাঁরে বাপু।

এ যে একদম গুড়ের মাছি। বলতে বলতে সন্তোষ সটকে এল।

ভবেনকে কেউ বিশেষ ঘাঁটায় না। দেখেছে ঘাঁটিয়ে। কোন লাভ নেই। কথা কয় না। চুপচাপ শূন্যে তাকিয়ে থাকে।

সন্ধ্যে সন্ধ্যে সেদিন তিনজনই খেয়ে নিল। দাক্ষীর রান্না। অনেকদিন পরে ভাত। রিলিফের চালের গরম গরম ভাত। সঙ্গে খালের মাছ। খাওয়া হতেই দাক্ষী এক ফুঁয়ে কুপিটা নিবিয়ে দিল। নয়ত এতক্ষণ খেতে বসে একজনের মুখে কাঁকড় পড়লেই আরেকজন কুপিটা এগিয়ে দিচ্ছিল। মুখে কোন কথা নেই। ভবেন দেয় সন্তোষকে। সন্তোষ ভবেনকে। দাক্ষী খেতে বসেছিল একটা কলাই বাটি নিয়ে। আর সবই এখানে মাটির। নয়ত পাতা। কাণ্ড দেখে বাটির উঁচু কানাৎ দিয়ে মুখ ঢেকে ভাতের গ্রাসের ফাঁকে ফাঁকে দাক্ষী মিটির মিটির হাসছিল। তারই জন্যে দু'টো জ্যান্ত মানুষের কথাবার্তা কমে গেছে। একি কম মজার!

সেদিন আকাশের গায়ে ফোস্কা পড়েছিল। থেকে থেকেই কালচে মেঘে বিদ্যুৎ ঝলকে যাচ্ছিল। ভবেন খালের তেমাথানির চালের দিকে বসে বিড়ি ধরাচ্ছিল আর নিবে যাচ্ছিল। সন্তোষ ঘরের সামনের উঁচু ঢিবিটায়। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেই দাক্ষী যে জায়গায়টায় বসলো—সন্তোষ টাকি জানে, অনেকদিনই জানে, ওখানে তেনারা থাকেন। মাঝে মাঝে ছানাপোনা হয়। বংশ বাড়ে। তবু বুড়ো বুড়ি জায়গা পালটায় না। মাঝে মধ্যে বুড়োটা বেরোয়। কখনো বুড়িও বেরোয়। বয়স হয়েছে। মাথা হাতের চেটোর চেয়েও চওড়া। ঠেলে দাঁড়ালে চিক চিক করে।

সরে বোস জায়গা ভাল না।

কাটে কাটুক বলেই অন্য কথায় চলে গেল দাক্ষী। তোমাদের এখানে নদী নাই কেন?

সব জায়গায় কি নদ হয়!

আমাদের দেশে—সব জায়গায়। বলতে বলতে দাক্ষী একটা বুনো সুর তুলে নিল গলায়। সেই গানের ভেতরেই চাঁদ উঠে এল আকাশে। ভবেন দু'বার কাশলো। দু'বারই বিড়ি ধরানোর শুকনো কাশি। দাক্ষী বলল, আমাদের আবাদে ভাঁটায় জল সরে যায়। তখন নদীগুলো মাঠ। সেখানে জোলোঘাস খেতে গরু নেমে আসে। আবার জোয়ারের তাড়ায় গরুগুলো পাড়ে ফিরে আসে। এ নিত্যিকার কাণ্ড—

ভবেন হন হন করে ঘরে ঢুকে গেল।

কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

আমি ঘুমোবো না?

তা ঘুমোও এখন। তবে ঘুম পেলে জায়গা ছেড়ে দিও।

ভবেন ভেতরে যেতে যেতে বলল, তুমি তো দিনি দিনি ঘুমোও। সারাদিন মাঠে খাটুনি। এখন একটু শোব না?

দাক্ষীর এসব ভালই লাগছিল। কে তার সঙ্গে শোবে তাই নিয়ে রোজ এরকম কাণ্ড।

কাছাকাছি থাকে সুধন্য। জিপিও-তে সর্টার। ভোরে বেরিয়ে সন্ধ্যো রাতে ফেরে। সে তামাক খেতে বসে সন্তোষের চড়া গলা পরিষ্কার শুনতে পেল। তা সন্ধ্যো রাতে শুয়ে নাও। পরে উঠে গেলেই হোলো।

দিনি খেটে ভাত যোগাবো! আর রাতে রাতে বাইরে বসে পাহারা দেব?

তা গরমের রাতে না হয় বাইরে শুলে—

রাতভোর শিশির পড়ে। ঘুম হয় নাকি? এবারে ভবেন দাক্ষীর দিকে ফিরে তাকালো। অন্ধকার সন্ধ্যা। কেউ কারও চোখ দেখতে পায় না। সুতরাং মনও দেখা যায় না। গলার স্বর শুনে যে যেটুকু পারে ভেবে নিতে পারে। তুই কিছু বলবি না দাক্ষী? রোজ চুপ করে থাকবি?

দাক্ষী এবার সত্যিই ডাকিনীর মত খ্যা খ্যা করে হাসলো। অনেকক্ষণ ধরে বিদ্যুৎ চমকে মাঝে মাঝেই দাক্ষীকে একটা আটোসাটো বড় সাইজের শুয়োর লাগছিল। হাসি থামিয়ে বলল, আমি বাপু কারও দিকে নাই। যে পারো জিতে লও! আপত্তি নাই। কেউ তো দুধের খোকাটি নও। দাঁতের পরিচয় আমি পাই নাই?

কথাটা খুবই সত্যি। ভবেনের সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষও মিইয়ে যায়। আস্তে আস্তে বলে, ভবেনদা তুমি একটা ভাত ঘুম দিয়ে নাও। এখন তো আমাদের ঘুম নাই চোখে—

তা থাকবে কোত্থেকে। সারা দুপুর ঘুমাইলে—বলতে বলতে ভবেন ঘরে ঢুকে গেল। মাটির নিকানো মেঝে। কোণে মেঝে খুঁড়ে চুলো। এক দেওয়ালের গায়ে লম্বালম্বি বাঁশের চৌকি। সন্তোষ টাকির রাতে রাতে কেটে আনা বাঁশে তৈরি। ভবেন শুতেই ক্যাঁচকোচ শুরু হল। খালি আড়মোড়া ভেঙে ভবেন ডাক ছেড়ে চেঁচাতে লাগলো। দাক্ষী—দাক্ষী—

উত্তর দিল সন্তোষ টাকি। এখন দাক্ষী ঘুমোবে না। তোমার ঘুম পেয়েছে—তুমি ঘুমিয়ে নাও।

বাঁশের চৌকিতে উঠে বসল ভবেন। ঘুমোবোই তো। সারাদিন তো আঁচল ধরে থাকি না। জন খাটি।

ক'দিন ধরেই চারদিকের মাঠগুলো সদ্য রোয়া ধান চারায় জুড়ে যাচ্ছিল। আর ফাঁক নেই কোথাও। যেটুকু আছে—তাও থাকবে না। দিনের আলোয় এ-ছবি আর ভবেনের দেখতে ভাল লাগে না। অথচ একটা চিন্তা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। তার থেকে কোন মুক্তি নাই। রোয়া শেষ হলে দেশ-গাঁয়ে কাজ খতম। তখন কোথায় জন খাটবে? কি খাবে? সন্তোষটা আজকাল ডাকাতি দূরে থাক—চুরিটা পর্যন্ত করে না। তিনটে প্রাণীর আহার জোটাবে কোত্থেকে? সারাদিন যদি ঘরেই থাকে। এই দাক্ষী—

দাক্ষী ছুটতে ছুটতে ঘরে গেল। কেন?

দুয়ারটায় হুড়কো দে—

দরকার নাই। এখন আঁধার—

দে হুড়কো। বলছি দে। একটা হায়া নাই। কীরকমের মেয়েমানুষ তুই!

মুখের ওপর দরজা বন্ধ হওয়াতে সন্তোষ গজরাতে লাগল। এইমাত্র দেখতে পেল, দ্বারিকপোতার আকাশে একজোড়া তারা খসে পড়ছে।

ভবেন তখন দাক্ষীকে জানবার চেষ্টা করছিল। সন্তোষ কেমন রে? আমার মত?

দাক্ষী বলতে যাচ্ছিল, খারাপ কি! কিন্তু মুখে এসে গেল, তোর চেয়ে অনেক ভাল।

ভবেন ঢোক গিলে বলল, তাতো হবেই। ওর তুলনায় আমার যে বয়সটা অনেক বেশি। আমি কি করে ওর মত—

নাও কথা বাড়িয়ো না। যা করছ কর।

খানিক পরেই ভবেন নিজের হাতে হুড়কো খুলে ধাই ধাই হাঁটতে লাগল কোমপানি বাঁধে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তহশীলদারের খাতায় খাড়ুপাতাল মৌজায় এই বাঁধের জমির পরিমাণ একাশো একাশি বিঘে। এতটা জায়গা এখন ওই তিনজনের বৈঠকখানা।

দাক্ষী বেরিয়ে এসেও সন্তোষকে খুঁজে পেল না। তখন সেই সুরটা তুলে নিল গলায়। কিছু বুনো। বেশিদূর যেতে হল না। খালের জলে সন্তোষ আটল বসিয়েছিল। সেখানে খুঁটিয়ে দেখছিল, কোন মাছ পড়েছে কি না। কোমপানি বাঁধে দাক্ষী এসে দাঁড়াতেই সন্তোষ টাকি হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল। তুই কে দাক্ষী? তুই আসলে কে?

দাক্ষী হাসলো না। কাঁদলো না। আমরা নদীর ওপারের লোক। আয় ঘুমোবি চল—

গলার বুনো সুরটার ফাঁস পরিয়ে সন্তোষকে ওপরে তুলে নিয়ে এল দাক্ষী। আমি কি একটুও ঘুমবো না? সারাদিন লোকে দেখতে আসে। আমি ঘট হয়ে বসে থাকি। এখন আমার ঘুম চাই।

তুই আসলে কে দাক্ষী?

কাল বলব।

দুয়ারে হুড়কো দেওয়া হল না। ওরা ঘুমোলো। ভীষণ ঘুমোলো। অর্দ্ধেক রাতে বাইরে এসে সন্তোষ ভবেনকে পেল। সন্ধ্যেরাতে দাক্ষী যেখানটায় বসেছিল—সেখানটায় বসে ভবেন অন্ধকারের ভেতর মাটিটাকে দু'ভাগ করার তাল খুঁজছে। সন্তোষকে দেখে বলল, ঠিক এখানটায়—পরিষ্কার বোঝা যায়—মাটির নিচি কারা চলাফেরা করে—

তেনারা করেন। সরে বোস।

ভবেন জায়গা না পালটে বলল, কাটে কাটুক।

এরপর বারান্দায় বসে কাশতে কাশতে সুধন্য শুনলো, ফাঁকা কোমপানি বাঁধে দু'দুটো পুরুষলোক যাচ্ছেতাই খিস্তি করে একজন আরেকজনকে তাড়া করছে। জানে, একজন ভবেন। অন্যজন সন্তোষ টাকি। কিন্তু অন্ধকারে ছুটন্ত ছায়া থেকে কাউকেই আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল না। সেই সঙ্গে

রোয়া তোলা হলো! বেড়ালের ঝগড়া।

এর ভেতর দাক্ষী একবার উঠেছিল। বেশিরাতের কাঁচা জ্যোৎস্নায় একমেটে দু'টো অসুর তখনো ছুটোপাটি করে কোমপানি বাঁধটাকে জাগিয়ে রেখেছে। চোখে ভীষণ ঘুম ছিল দাক্ষীর। তাই দুয়ারের হুড়কো তুলে আবার বাঁশের চৌকিতে গিয়ে টান টান হয়।

ভোর ভোর তিনজনেরই যে ঘুম ভাঙালো—তাকে চেনে শুধু সন্তোষ টাকি। সে নিজে ছাড়া আর যে কোমপানি বাঁধের আগানেবাগানে ঘোরাঘুরি করে—সে হল আশু বৈদ্য। বাড়ি কেশপুর। ফি বছর এ সময়টায় এদিকে এসে হানা দেয়। তার শিকার—বিষধর সাপ। পুষে পুষে বিষ বেচে। মরে গেলে ছাড়িয়ে চামড়াটা বেচে দেয়। ধড়টা এক ঝটকায় পগার পার। ধরা অভ্যেস গড়বেতার ওদিককার শাল-জঙ্গলের কেউটে। এ সময়টায় শুধু এদিকে আসে। ভিজে মাটির সাপদের স্বভাব চরিত্র তখন ওর অনেকখানি জানা।

দ্বারিকপোতার শেষে আকাশ জুড়ে আলতা। সেখান থেকে সূর্য উঠবে। সেদিকে তাকিয়ে আশু বলল, ঘর বানালে কবে?

এমন সময় দাক্ষী এসে দুয়ার খুলে দাঁড়াল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে আড়মোড়া ভাঙলো দাক্ষী! তখনই আশু খলবল করে বলল, বে করলে কবে! বলবে তো—

দাক্ষী কটমট করে তাকালো। সেখান থেকে চোখ সরাতেই ভবেনের ওপর চোখ পড়ল। ছেঁড়া হাফপ্যান্ট। এই লোকটাইতো কোমপানি বাঁধে উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছিল। তার পাশে তেরছা হয়ে চোখ বুজে পড়ে ছিল সন্তোষ টাকি।

সন্তোষদা। এই তোমার শউরো?

আঃ সক্কালবেলাতেই কি মুশকিল। শ্বশুর কেন হবে। ও তো আমাদের ভবেনদা। আগে দ্যাখোনি তো। নতুন এসেছে। ওই তো তার বউকে দেখলে। এখানে সন্তোষ টাকির মুখ-ফসকে বেরিয়ে এল ভাগানো বউ।

ভবেন একটা চড় তুললো। তার আর সন্তোষের মাঝে আশু বৈদ্যের মাথাটা পড়েছে। হাত নামিয়ে নিতে হল। আশু তাই দেখে বলল, এখন তো চড় তুলেছিলে। কিন্তু সারারাত কোথায় শুয়ে কাটালে ঠিক আছে?

কোথায়?

ওদের পুরো ফেমিলির ওপর শুয়েছিলে—! নড়াচড়া টের পাওনি? কি ঘুমরে বাবা!

টের পেছিলাম একবার। কিন্তুক কোথায় খোস্তা। কোথায় শাবল।

না খুঁড়ে ভাল করেছো। খুঁড়লে আর রক্ষা পেতে না। বুড়োবুড়ি একসঙ্গে ছুবলে দিত। তারপর সকালবেলার বাতাসে রূপকথার মত পাতলা পাতলা গল্প ছড়িয়ে দিতে লাগল আশু। এখন ছানাপোনায় ওনাদের ডেরা বোঝাই। বুড়োবুড়ি ওদের এখন বড়ো করে যাবে। আরেকটু বড়ো হলে ওদের দিয়েই জল খাবার করবে—

দাক্ষী তো অবাক। নিজের ছেলেমেয়ে! নাতিপুতি?

হ্যাঁ গো। এখন বড়ো করে যাবে। খাবার মত হলে খেতে শুরু করবে।

তাও ওদের বাঁচানো যায় না?

সাপ কেউ বাঁচায়? হাসালে।

ধাড়ি দু'টোকে ধরতে পারলে—

সেজন্যিই তো আসা আমার—

তা তুমি ছোটগুলোকে নিয়ে গিয়ে পুষে বড়ো করতে পার।

অতগুলো সামলাবো কি করে! তুমি তো দু'টোর মোকাবিলায় আছ। কেমন লাগে?

তারপর ওদের চারজনের এক নতুন কাজ হল। সারা কোমপানি বাঁধ জুড়ে বুড়োবুড়ির সন্ধান। এক-একটা গর্ত এত নির্দোষ দেখতে। তাতে খোঁচাতেই একদিন বুড়ি তার লেজগুটিয়ে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। আর একদিন দুপুরে মাথা ভাঙা ঘাসের ডগা দেখে আশু বলল, বুড়োর তো বয়স হল। এখন ওজনও বেশ। এই পথে খালে নেমে ওপারে খাবারের সন্ধানে গেছে। যাবার বেলায় ঘাসের ডগাগুলো ভেঙে দিয়ে গেছে। এপথে ফিরলে নির্ঘাৎ ধরে ফেলবো।

বুড়ো সেদিন ওপথে ফিরলো না। ফিরলো বুড়ি। কিন্তু বড় চালাক। আশুবৈদ্যের কলকাঠি বানচাল করে দিয়ে দিব্যি বাসায় ঢুকে গেল। ঢোকা কি মনোহর। মাথাটা ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে দিব্যি ভেতরে চলে গেল।

আশু আজ গোসাপ ধরে। কাল ঘুঘু মারে। পরশু খালের জল থেকে দু'কেজির শোল মাছ তোলে। বুড়োবুড়ি এই দঙ্গলে যোগ দিতে না পারলেও পরিষ্কার বোঝা যায়—ওরা কাছাকাছি থেকে এই চারজনের ওপর নজর

রেখেছে। এর ভেতর আবার দাক্ষীর সঙ্গে কে কখন শোবে—তাই নিয়ে রীতিমত লড়াই বাঁধে এক এক রাতে। তখন সুধন্যর কাশিটাও বাড়ে।

এর ভেতরেও আশুর বাণিজ্য খারাপ হচ্ছে না। ফুল বেচা পয়সার আড়াই টাকা দিয়ে দাক্ষী আশুর কাছ থেকে একটা ছ-কোণা ফল কিনেছে। ফলটার নাম শিবলিঙ্গ। হাতে থাকলে সাপ মাথা নত করে।

ভবেন কিনেছে একখানা শঙ্খলাগা বস্ত্র। জনখাটুনির এগারো টাকা দিয়ে। বিক্রি করবার সময় আশু ফিস ফিস করে বলেছে, একবার দাক্ষী ঠাকুরুণকে এই বস্ত্রের ওপর বসিয়ে দেখো—কী ধারার বশ হয়ে যাবে ভাবতে পারবে না—

সে বস্ত্রে দাক্ষীকে বসাবার তাল খুঁজে বেড়াচ্ছে ভবেন। সন্তোষ টাকি আছে নতুন আমোদে। একটা কোমপানি বাঁধ। চারটে মানুষ। ফেমিলিসুদ্ধ দুটো বুড়োবুড়ি। দ্বারিকপোতার আকাশ। সব নিয়ে একটা বড় সাইজের ছবি। যেদিকে ইচ্ছে ছুটে চলে যায়। জেলখানায় অত লোকের সঙ্গে থেকেও এ-জিনিস সে পায়নি।

আশুরও মন্দ লাগে না জায়গাটা। আগে এখানে দিনে দিনে ধরতে এসেছে। এখন এখানে রাতেও থাকার আস্তানা আছে। প্রথম দিককার তালপাতার ঘরখানা এখন লাউডগায় ঢেকে ফেলেছে। কটকটে দুপুরে এক একদিন আশু তার ভেতর চিৎ হয়ে পড়ে থাকে। তখন গর্ত খোঁড়ার খোস্তা দিয়ে নাড়াচাড়া করে দাক্ষী।

সকাল সকাল বেরোতে গিয়ে বুড়োবুড়ি একদিন আশুর চোখে পড়ে গেল। কিন্তু ধরা অত সহজ নয়। অনেকদিনের জিনিস। খেলাধুলোও জানে নানারকমের। ওরা তিনজনে মিলে এই ওদের দু'জনকে পায় পায়—আবার হারায়।

বেলাবেলি কোমপানি বাঁধে উঠে দাক্ষী দেখলো ভবেন, সন্তোষ আর আশুকে এই এতটুকুন দেখাচ্ছে। ওরা তিনজনে মাটির ওপর পড়ে কি যেন করছে। তখন দাক্ষী আশুর খোস্তাখানা নিয়ে তেনাদের জায়গাটা খুঁড়তে বসল।

বেশিক্ষণ লাগল না। একদম কিলবিল করছিল। অনেকগুলো। সবে মাথা তুলতে শিখছে। কী তেজ এক একটার। ধামা পেতে সব ক'টাকেই তুলে নিল দাক্ষী। তার ওপর কুলো চাপা দিয়ে ঘরের কোণে ধামাটা রাখল।

শেষে মাটি চাপা দিয়ে গর্তটা বুজিয়ে দিল।

গর্তের আসল চেহারা আজ দেখতে পেয়েছে দাক্ষী। দেখে তার বুক কেঁপে উঠেছে। মাটির নিচে বুড়োবুড়ির কত সুড়ঙ্গ। তেলতেলে সরু পথ। এরকম একটা পথ দাক্ষীর ঘরেও চলে গেছে।

বুড়োবুড়ি ওদের তিনটেকে এলোপাথাড়ি দৌড় করিয়ে সন্ধ্যে সন্ধ্যে ফেরৎ আনলো। তখন অন্ধকারে আশুর চোখেও পড়ল না—ফেমিলিসুদ্ধ জায়গাটার মাটি আগাগোড়া খোবলানো। আশু কোমপানি বাঁধে কাঠকুটোর উনুন ধরিয়ে দিয়ে বলে, ঠাকমা আমাদের খুব রসিক। এই ধরা দেয়। আবার পালায়। কী দৌড়টা করালো সারাদিন। কি দাক্ষী ঠাকরুণ। একবার বাইরে আসবে নাকি!

ভেতর থেকেই জবাব দিল দাক্ষী। নাগো নাতি। শরীরটে বড় খারাপ।

সে-খবর শুনে ভবেন অন্ধকার ঘরে আরেকটু হলে পা দিয়েছিল আর কি। শঙ্খলাগা বস্ত্রখানা তো তার কোমরেই আছে। একবার তার ওপর দাক্ষী বসলেই হোল।

বাঁশের চৌকির ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো দাক্ষী। একদম ঝা ঝা করে।

ভবেন পেছিয়ে এল। তখন আশু গল্প জুড়েছিল। নৈহাটির শ্মশানে অমাবস্যার রাতে এক কোপে মড়ার মুণ্ডু কেটে নিয়ে বস্তাবন্দী করতে হবে। তখন চারদিক থেকে কত লীলা এসে ঘিরে ধরবে। তাতে ভুলেছো কি মৃত্যু। পাখনা লাগানো অজগর উড়ে যাবে। যে-পুকুরের ওপর দিয়ে উড়বে— নিমেষে তার জল শুকিয়ে যাবে। চোখের সামনে গাছপালাসুদ্ধ আকাশ-খানাকে শতরঞ্চি করে গুটিয়ে দেবে। পাহাড়ের চোখে জল।

শুয়ে শুয়ে বেশ শুনতে লাগছিল দাক্ষীর। এর ভেতর সন্তোষের গলা পেল। সন্তোষ বলছে, রান্না করে কী হবে! তার চেয়ে ভাল মাছ এনে পুড়িয়ে খাই—

ভবেন বলল, সেই ভালো।

সন্তোষ টাকি দোরগোড়ায় এসে বলল, মশলাপাতিগুলো একটু এগিয়ে দেবে—

দাক্ষী তখন টের পেয়েছে। পরিষ্কার টের পেয়েছে। তাই বাঁশের

চৌকিতে ক্যাচকোচ তুলে চেঁচিয়েই সন্তোষকে জাগালো।

সন্তোষ পিছিয়ে আসার সময় বাঁশের দুয়ারটা টানতে টানতে বলল, তুই কে দাক্ষী? তুই কে আসলে?

দাক্ষী কোন জবাব দিল না। ঘরের ভেতর টানা অন্ধকার। তার ভেতরে বুড়োবুড়ি ফেমিলির লোকজন খুঁজতে বেরিয়েছে। খুঁজতে? কে জানে! যারা আজ সারাদিন ওদের দুজনকে দৌড় করিয়েছে—তারা এখন বাইরে একটা বড় বান মাছ লম্বালম্বি আগুনে ধরে পোড়াচ্ছে। একটু পরে নুন লঙ্কা মাখিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

ঘরের ভেতর দাক্ষী একটা মিঠেন গন্ধও পাচ্ছিল। ঢাকা দেওয়া ধামার ভেতরটা নড়ে চড়ে গেল। সাবধানে শিবলিঙ্গ ফলটা মুঠোয় নিল। কোথায় কি! বুড়োবুড়ি দিব্যি তাদের পথ দিয়ে ঘরে চলে এসেছে। এখন দাক্ষী পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, ধামার চারদিকে ওরা দু'জন পাক দিয়ে ফিরছে। দাক্ষী বুঝলো, ওদেরও তো খিদে পায়। পা ঝোলানো ছিল। এখন বাঁশের মাচায় তা তুলে বসল দাক্ষী।

তখন বাইরে থেকে আশুর গলা আসছিল। এক এক মন্ত্রের এক এক জোর। তুমি যারে ইচ্ছে চাও—তারে পাও। কাঠকুটোর আগুনে ওদের তিনখানা মুখ এখন তিনটে বাঘ।

বর্ষা চলে গেছে অনেকদিন। যাবার সময় একটা বড় বান মাছকে পাঁক মত মাটিতে রেখে গিয়েছিল। সেটা সামনের বর্ষার জন্য এতদিন ধুকপুক করে বেঁচে ছিল। আজ সন্তোষের হাতে ধরা পড়ে এক রাত্তিরের খাবার হয়ে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর আর আশুর দম ছিল না। সে নিজেই চলে পড়ল।

তখন শুরু হল নিত্তিকারের মত। এই সময়টাতেই সুধন্যর কাশি বাড়ে। একখানা চৌকো জ্যোৎস্না নেমে এসে জায়গাটাকে সুন্দর করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কিসে কি হবে। সন্তোষ টাকি চেঁচিয়ে উঠলো, আজ আমি আগে ঘুমাবো। চোখ ভেঙে যাচ্ছে —

ভেতর থেকে দাক্ষীর গলা এল, যে যার মত আকাশের নিচি ঘুমোও। আজ রাত্তিরটে অন্তত। বলছিল, আর দাক্ষী দেখতে পাচ্ছিল, ফেমিলিসুদ্ধ ঢাকা ধামাটাকে দু'জনে কীভাবে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। আর পিছলে

পিছলে মেঝেতে ধমাস করে পড়ছে। ওদেরও তো খিদে পায়।

সন্তোষ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, তুই কে দাক্ষী? তুই কে?

ভবেন ফোড়ন দিল। ডাকাতি দূরে থাক—একদিন চুরি পর্যন্ত করে না। নে সর। এট্টু ঘুমোবো আর উঠে আসব। দরজায় চাপ পড়তেই অন্ধকার বাঁশের চৌকির ওপর থেকে দাক্ষী ফেটে পড়ল। আজগের রাত্তিরটা আকাশের নিচি শো—

আশু জেগে থাকলে দেখতে পেতে—একবার ভবেন সন্তোষকে, আরেকবার সন্তোষ ভবেনকে তেড়ে তেড়ে যাচ্ছে। সুতো পরানো দুটো পুতুল তেরছা চৌকো জ্যোৎস্নায় এরই ভেতর এক একবার বন্ধ দরজার কাছে যায় আর ছিটকে পিছিয়ে আসে।

ওরা দু'জন জানেও না—তখন দাক্ষী পা গুটিয়ে অন্ধকার মেঝের ওপরকার ধামাটা দু চোখে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর ধামা থেকে পিছলে পড়ার একটা জোড়া শব্দ প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছিল।

বোকাডাক্তারের দুই রুগী

ডাকাতির জন্যে তিন বছর জেল খেটে সন্তোষ টাকি বেলা দশটা দশের ট্রেন ধরল। জেলে এতদিন সে ওয়ার্ডারদের ভাষায় এই ভাবেই মনে রেখেছে—তার খালাস পাওয়ার বাকি আর পাঁচোয়া মাহিনা—তিরিশটা দিন কাটতেই আর চার মাহিনা বাকি। খালাস পেয়ে জেল গেটের বাইরে এসে দেখল কলকাতায় দিব্যি ট্রাম বাস চলছে। তারই একটা ধরে শেয়ালদা। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে ঘণ্টাখানেকের ভেতর নিজের দেশের স্টেশনে এসে নামলো।

ফাগুন মাসের দুপুর বেলা। মেঘ ইয়ার্কি মারতে আকাশে আসেনি। কখনো ছায়া দিচ্ছিল—কখনো কিছুটা সরে গিয়ে রোদ্দুর। তার ভেতর দিয়ে সন্তোষ টাকি স্টেশন-বাজারে ভদ্রেশ্বর নাপিতের কাছে গিয়ে ইট পেতে বসল।

প্রথমটায় চিনতে পারেনি ভদ্রেশ্বর। কুমড়োর ফালি, কুচো চিংড়ি গামছায় বেঁধে বাড়ি যাচ্ছিল। দাড়িঅলা লোকটা নিজে থেকে সামনে এসে বসতে ভেবেছিল—আরও একখানা সিকি তার কাছে হেঁটে এল।

ক্ষুর খুলেছিল। গলার স্বর, চোখ সন্তোষ টাকিকে চিনিয়ে দিতেই ভদ্রেশ্বর ক্ষুর ভাঁজ করে বলল, ওই যাঃ! সাবান নেই যে—

জলে ভিজিয়ে কামিয়ে দে।

না বাপু। এ জেলখানার দাড়ি। মুখখানা একদম মৌচাক করে নে এসেছো। জলে এ দাড়ি রসে না।

সন্তোষের টাকে সামান্য রোদ এসে পড়ল। পাশেই মনোহারী দোকান থেকে তাড়িওয়ালারা নিশাদল আর মিষ্ট পাউডারের পুরিয়া কিনে মেশাচ্ছে। কলকাতার বাবুদের ঘোলাটে ভাব দেখাতে পারলে ভালো বিকোয়। সামনে

পঞ্চানন তলার আটচালায় পঞ্চানন অপেরার পালা মহলা দিচ্ছে কজনায়। দীনু ডাক্তারের ঘর অবদি হোমোপ্যাথির রোগীদের লাইন। বড় মানকচু পাতায় কচি পাঁঠার ভাগা সাজিয়ে বসে আছে কেষ্টর বড় ব্যাটা। খদ্দের নেই। কুকুর ঘুরছে। কেষ্টই প্রথম এ লাইনে হাতে খড়ি দিয়েছিল সন্তোষের। তার টাক দেখে নাম রেখেছিল সন্তোষ টাকি। কেষ্ট আর নেই।

ভয় নেই। পয়সা দেব। এই নে—

তখন একে একে সাবান বেরোল। ফটকিরি বার করল ভদ্রেশ্বর। কচ কচ করে কামিয়ে মুখেভাতের মুখখানা বের করে আনল। 'কত বয়স এখন গো তোমার'—এই সব গো টো মিশিয়ে কথা বলতে পারে ভদ্রেশ্বর। তাতে গরম জিনিস ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

আয়নায় মুখখানা দেখে আপন মনেই সন্তোষ বলল, তা লঙ্গরখানার সময় বারো বছর বয়স ছিল। বাপের মুখে শুনিছি। নেঃ।

সিকিটা কুড়িয়ে নিয়ে ভদ্রেশ্বর বুঝলো—সন্তোষ এখন চল্লিশ ছাড়িয়েছে। মনে মনে হিসেব করে দেখলো—তা সন্তোষ টাকি চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই করে আসছে প্রায় বিশ বছরের ওপর। ডাকাতিটা অবশ্য মাত্র এই পাঁচ ছ' বছর। প্রথম দিকে ভদ্রেশ্বরও সঙ্গে থাকতো। বড় দরের ব্যাপারের আগেই সে মানে মানে সরে এসেছে। এখন সে শুধু খবরাখবর দিয়ে ভাগা পায়। সেবারে সন্তোষের সঙ্গে ননীবাবুর বাড়িতে হামলা দিল মাঝ রাতে। মুখে গামছা বেঁধে শুধু চোখ বের করে রেখেছিল। পুরো হাতার শার্ট গায়ে। পায়ে চোরাই জুতো। ছাপ দেখে কেউ ধরতেও পারবে না। জমি কিনবে বলে ননীবাবু তোষকের নীচে টাকা রেখেছিল। পেটাতেই বের করে দিল। ননীর গিন্নি গলার হার দিল। কানের দুলজোড়া সন্তোষ টাকি ছিঁড়ে নিল। আর দেরি করার উপায় ছিল না। পাড়া জেগে উঠেছে। কুকুরগুলো চেঁচাচ্ছে। পঞ্চানন তলায় সংকীর্তনের হরিবোল শোনা যাচ্ছিল। এখন কেউ বন্দুক বের করলেই চিত্তির।

ওরা মাঠ ভেঙে দৌড়তে শুরু করল। যাবার সময় ভদ্রেশ্বর একটা আধমনি চালের বস্তা পিঠে তুলে নিয়েছিল। ডাকাতির বড় কথা—বর্ষাকালে লোভ করতে নেই। বর্ষাকালে সব দেখে শুনে টেকে রাখতে হয়। ফাল্গুন

হল গিয়ে ডাকাতির স্বর্ণ সময়। ধান কাটা সারা। যেদিক দিয়ে ইচ্ছে দৌড়োও। বর্ষাকালের মত পা পাঁকে গেঁথে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ার বিপদ নেই তখন।

পুলিশ চৌকির হেড জমাদার তারাপদ মালাকারের বউ হোমোপ্যাথির লাইন থেকে ওদের দুজনকে দেখছিল। সন্ধ্যে রাতে এই সন্তোষ টাকি একবার তাদের ঘরে পাঁচ পালি নতুন চাল দিয়ে এসেছিল। সেদিন ঘরে কিছু ছিল না। তারাপদর দাড়ি কামিয়ে দেয় ভদ্রেশ্বর। দীনু ডাক্তারের ঘর অবধি লাইন। আর কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে বোঝা যাচ্ছে না।

দীনুকে এখানকার পুরোনোরা বোকা বলে ডাকে। ওরা তিন পুরুষের খ্রীষ্টান। ঘরের দেওয়ালে যীশুর ছবি। মাথার পেছনে নিজের মায়ের ছবি। রোগী পিছু এক টাকা নেয়। খাতায় নাম ঠিকানা—রোগের বিবরণ লেখা থাকে। রোগীরা নম্বর পায়। সেই নম্বর বললে—দীনু খাতা মিলিয়ে সব মনে করে ফেলে।

এক-এক রোগীকে সাতবার আসতে হয়। সাতবারে সাত টাকা। প্রতিবার রোগীর হাতে পুরিয়া তুলে দিতে দিতে দীনু ডাক্তার মাথায় ঠেকিয়ে তিনবার মা মা মা বলে। ওর আসল নাম বোকা। জি পি ও-তে সর্টার ছিল। সেখানে থাকতেই হোমোপ্যাথির বই পড়তে শুরু করে। তারপর আস্তে আস্তে ডাক্তার। এখন বাড়িতেই সস্তার সময় আঙুর কিনে পচিয়ে ঘরোয়া ভাটিতে সুরা বানায়। রাতে একটি আস্ত দেশী মুরগীর রোস্ট খায়। পোলট্রির মুরগীর ফাইবার সেদ্ধ হতে চায় না। সমাজে ডাক্তারবাবু বলে পরিচিত। বড দিনে ডাকঘরের পিওনরা ওর কাছে দশ টাকা করে বকশিস পায়।

মালাকারের বউয়ের বয়সটা কম। বোকা ডাক্তার তার হাতখানা নিজের হাতে অনেকক্ষণ চেপে ধরে বলল, রক্তচাপ প্রবল। ডুমুর খাও। থোড় খাও।

ঘরে তখন আর কেউ নেই। বাকি রোগীরা ওষুধ নিয়ে একটা পনেরোর ট্রেনে কেটে গেছে। মালাকারের বউ উমা হাত ছাড়িয়ে নিল না। আস্তে বলল, একটা ব্যবস্থা কর ডাক্তার। পেটে যে এখন ছেলে এসে গেল।

বোকা ডাক্তার মাথা না তুলেই বলল, তার আমি কি করব?

বাঃ! তোমার ছেলে না?

তারাপদ জানে ?

সে জানে তার জিনিস। আনন্দে লাফাচ্ছে।

তা হলে তো মিটেই গেল।

না। মিটবে নি। ছেলে করে গন্ধ করে দিলে। এখন দায় চাপাচ্ছ জমাদারের ঘাড়ে ? সে বেচারা দাইয়ের খরচ যোগাবে। আর মজা লুটবে তুমি। সে হতি দিচ্ছিনে—

এবার বইয়ের ভাষায় বোকা ডাক্তার প্রমাদ গুনলো। চেঁচাচ্ছিস কেন ? আমি কি বলিছি পয়সা দেবো না। কথা বলতে বলতে দেখলো—জানলার ওপাশেই টানা বারান্দায় বসে কে একটা লোক শিকে মাথা রেখে সদ্য কামানো গাল চুলকোচ্ছে।

এই সময়টায় ডাক্তারখানায় কেউ থাকে না। কম্পাউণ্ডারও সওয়া একটার ট্রেন ধরে পরের স্টেশনে বাড়ি ফিরে যায়। কে ভেবেছিল, এখন এখানে কেউ বসে থাকবে !

লোকটা উঠে দাঁড়াতেই বোকা ডাক্তার চিনতে পারল, তুই ? কবে ফিরলি ?

সন্তোষ টাকি সোজা দাঁড়িয়ে উঠেই বলল, তারাপদ জমাদারকে সব বলে দেব—

জমাদার-বউ তক্ষুনি চড়াৎ করে কম্পাউণ্ডারের গলিপথ দিয়ে সটকে গেল।

কি বলে দিবি ?

এই আর কি ! তেমন কিছু না।

তবু ?

জমাদারের নামে পেটে বাচ্চা করে যাচ্ছ—

সব শুনেছিস ?

সব। নাও। এক্ষুনি দশটা টাকা ছাড়ো তো।

নেই। দু' টাকা নিয়ে যা—

ভাল করে খুঁজে দ্যাখো। অনেক তো ভিজিট পেলে। দাও না দশটা টাকা।

নিয়ে যা। কিন্তু একটা কথা শোন—

সন্ধ্যের দিকে শুনতে আসবো ডাক্তারবাবু।

পাটের গোছা মাথায় করে বদ্যিনাথের গোলায় যাচ্ছিল তিনজন। এখন একটু দাম উঠেছে। সন্তোষ একগোছা পাট নামিয়ে রাখল। নামিয়ে মনে পড়ল—কি কাজে আর লাগবে। ঘর নেই যে খুঁটির সঙ্গে পাকিয়ে দড়ি করে নেবে। বরং তুলসীর দোকানে গোছাটা ফেলে দিলে বিড়ি দেশলাই হয়ে যাবে। আজ রাতটা প্ল্যাটফর্মে কাটিয়ে দিয়ে কাল ভোর ভোর গাঁয়ে ঢুকবে। এর ভেতর এক সময় গিয়ে চৌকিতে জমাদার সাহেবের ওখানে দেখা দিয়ে আসতে হবে। থানা থেকে তাই ব্যবস্থা। রোজ একবার—

তারাপদ জমাদার তিনটে আধুলি পেয়েছিল, বউকে বলল, ছ'খানা টেংরি এনেছি। গুঁড়ো কয়লার আঁচে বসিয়ে দে। এই নে--এক আধুলির ঘি দিস। এখন তোর ভাল ভাল জিনিস খাওয়া দরকার। কি বলিস—

উমা বলল, গুঁড়ো মশলায় সোয়াদ দেয় না—

আমি থাকতে তোর কি অভাব। এখুনি আনাচ্ছি।

বোকা ডাক্তারের বাক্যালাপ আরেকজনও শুনেছিল। সে হল গিয়ে ভদ্রেশ্বর। বারান্দার ওপরে ছিল সন্তোষ টাকি। বারান্দার নীচে ছিল ভদ্রেশ্বর। সে তখন বাজার গোছাচ্ছিল। কুচো চিংড়ি, পচাধচা আলু, বাজার কুড়োনো ভূতি সুদ্ধ কুমড়ো। গোছাতে গোছাতে বোকা ডাক্তারের সব কথা কানে আসছিল।

নিচু হয়ে সব কথা শুনেই ভদ্রেশ্বর হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় উঠে এসেছে। তারপর তড়িঘড়ি খালপাড়ের বাঁশবাগানে চলে যায়। সেখানে উবু হয়ে বসে নিজেকে বাগে আনার চেষ্টা করেছে খানিকক্ষণ। নিজেই একবার চেঁচিয়ে উঠেছিল: ওরে বাবা গো! কি জানলাম গো! বলেই নিজের মুখ নিজের হাতে চেপে ধরেছিল। তারপর দৌড়। দৌড়। সোজা ঘরে গিয়ে রান্না চাপাতে তাড়া দিল। তারপর কোনক্রমে নাকে মুখে গুঁজে নিয়ে একদম স্টেশনবাজারে। রেলগেট খোলা, এখন কোন ট্রেন নেই। গম-কলগুলো ভুট্টা ভাঙছে গোঁ গোঁ করে। ইটখোলার মেয়েরা কিনতে আসবে সন্ধ্যে সন্ধ্যে।

ভদ্রেশ্বর ঠিক করে উঠতে পারছিল না। কাকে চাপ দেবে? বোকা ডাক্তারকে? কিন্তু তার তো এখন ভাতঘুমের সময়। জাগিয়ে তুলে টাকা চাইলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তারাপদ জমাদারকে বলবে? বলে

ক' পয়সা পাবে? চাই কি পেটাতেও পারে। সে কি আর পয়সা দেবে! তাও এবার এই প্রথম পোয়াতি। হয়ত বিশ্বাসই যাবে না। চাই কি বউটা উল্টো কথা বলে বেদম ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

কোনদিকে যাবে? ঠিক করতে পারছিল না ভদ্রেশ্বর। এমন সময় বদ্যিনাথের গোলার ছেঁচতলা থেকে সন্তোষ টাকি ডাকলো।

তুমি এখানে এত বেলায়?

আমিও তো তাই ভাবছি। এই বাড়ি গেলি। এই ফিরে এলি। কারবার জোর চলছে। তাই না! বিকেলেও কামাচ্ছে সবাই!

সন্তোষের মুখের ওপর ভদ্রেশ্বর কখনোই কথা বলতে পারে না। হাজার হোক সন্তোষ ডাকাতি করে। সে নিজে থেকে মোটে একবার ওর সঙ্গী হয়েছিল। সেই ননীর বাড়ি ডাকাতিতে। জীবনে সে বেশির ভাগই চুরি করেছে।

দু' জনেরই একসঙ্গে মনে পড়ল—বোকা ডাক্তার তো এখন উঠবে না। সরকারী বউয়ের সঙ্গে খুব ভালো করে দরজা জানলা আটকে ঘুমোচ্ছে। উঠবে সেই চারটেয়। আবার ওষুধের লাইন। চলবে রাত আটটা অব্দি। মাথা পিছু এক টাকা ভিজিট।

তখন দু'জনই উসখুস করতে লাগল। ভদ্রেশ্বর জানে—সন্তোষ টাকি সব জানে। সন্তোষ জানে না—ভদ্রেশ্বর সব জানে।

আজই বিকেল বিকেল পুলিস চৌকিতে গিয়ে সন্তোষকে হাজিরা দিতে হবে। জমাদারের রিপোর্ট থানায় যাবে। এসব সময় নিয়ম—সোজা গিয়ে চৌকির বারান্দায় বসতে হয়। জমাদার সাহেবকে একটু খাতির দেখাতে হয়।

ভদ্রেশ্বর কথা বলতে বলতে হাঁটা ধরতেই সন্তোষ বলল, কোথায় চলেছিস। জিরিয়ে যা একটু।

নাঃ। তার উপায় নেই। জমাদার খবর পাঠিয়েছে সকালে—

আমিও তো ওদিকে যাব। চল ঘুরে আসি।

ভদ্রেশ্বর মনে মনে বলল, তুমি আবার কেন? হাজিরা মারবে। সুলুক খুঁজবে। খবরটা ফাঁস করে কার ট্যাক ফাঁক করবে? জমাদার? না, তার গিন্নির?

সন্তোষ মনে মনে একটা ছবি দেখছিল। একজোড়া মুলো নিয়ে তারাপদ

জমাদারের দাওয়ায় গিয়ে হাজির হয়েছে। জমাদার তাকে একটা আদরের লাঠির বাড়ি মারল। গায়ে লাগল। তবু সন্তোষ হি হি করে হাসতে লাগল। এই-ই নিয়ম।

হাঁটতে হাঁটতে সন্তোষ বলল, খবর-টবর আন। কোথায় কি আছে দেখি।

খবর মানে—কোথায় কোন জিনিস সরাবার মত আছে। কে অসাবধানে সাইকেল বাইরে রেখে বাজার করতে ঢোকে। তার সাইকেলখানা রাতারাতি তিরিশ মাইল উজিয়ে গিয়ে বেচে দিয়ে আসতে হবে। আউট লাইনে দাঁড়ানো ওয়াগনে চিনির বস্তা থাকলে তো কথা নেই। মিষ্টির দোকানগুলো হাঁ করে আছে। একবার এনে ফেলতে পারলে নগদ নোট। একখানা পুরো গজ—বড় পাতির। তখন চাইকি সে-পয়সায় টাণ্টু হবে—সঙ্গে মুরগী মেরে মাংস।

খবরাখবর দিয়ে ভদ্রেশ্বরের দু' পয়সা উপরি হয়। খবর সে দিয়েও থাকে। নানান জায়গায় কামাতে গিয়ে সে নানান রকমের খবর পায়। খবরগুলো শুধু কুড়িয়ে আনা। ডাক্তারবাবুর দাড়ি কামাতে বসে সেদিন স্বর্ণকারদের পুকুরের মাছের খবর পেল। সে-রাতেই স্বয়ম্বর কাওরা টানা জালে পুকুর সাফ করে ভোর ভোর তার বাড়ি নগদ পঞ্চাশ টাকা পৌঁছে দিয়েছিল।

স্টেশন বাজার এলাকা দু' জনেরই খুব সুন্দর লাগছিল। বাতাসে অল্প শীত। সারি সারি গুড়ের নাগরিতে মাছির ছররা। সন্তোষ পরিষ্কার বুঝলো—বোকা ডাক্তারকে এবার ভালমত দোয়া যাবে। হাত ফুবোলেই হাজির হওয়া যাবে। উঃ কি আনন্দ! যাও আর টাকা চাও। কোন খাটাখাটুনি নেই। না দিলে বলে দেব। মোচড়ালেই গাছ থেকে ফল পড়বে। টুপ টুপ করে।

বারোখানা গাল কামালে তবে তিনটে টাকা। ভদ্রেশ্বর মনে মনে ঠিক করে নিল—এবার থেকে কামানোর ঝামেলায় না গিয়ে একবেলার বাজার হাটের টাকা বোকা ডাক্তারের কাছ থেকে নিতে হবে। আর ঘরবাড়ির ওষুধ-বিষুধ—সে তো আছেই।

তখন দু' জনেরই একসঙ্গে মনে হল—রিকশা সাইকেলের প্যাক প্যাক কী সুন্দর আওয়াজ।

উমা দরজার আড়ালে বসে টেংরি চুষছিল। বাইরে দাওয়ায় বসে তারাপদ জমাদার গরম জুসে সবে চুমুক দিয়েছে, এমন সময় দুজনে হাজির। চুমুক দিতে দিতেই ভদ্রেশ্বরের দিকে বাঁ পাখানা মেলে দিল তারাপদ।

ভদ্রেশ্বর পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ গোল করে কাটতে লাগল।

কাটতে কাটতেই বলতে লাগল, ঘরের মাগ থাকবে আড়ালে আবডালে; মাথায় তুলেছো কি –

কেন? তোর বউ কোথায় গেল?

ভেতরে উমার দাঁতে হাড়ের কুচি আটকে যাচ্ছিল। সে অবস্থাতেই বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, হাতের নখগুলো কেটে দাও তো। সারা পাড়া কামিয়ে বেড়ালে বউ থাকে ঘরে।

ও কথা বোলো না গো। অভাবের সংসার। তবু যত্নে রাখি।

ভদ্রেশ্বর ততক্ষণে তারাপদর পা ছেড়ে উমার হাত ধরেছে। বেশ নরম-সরম। এমন মেয়ে বেপথে গেল কি করে! বোকা ডাক্তারই বা অত ভিড়ভাট্টায় আড়াল আবডাল পায় কোত্থেকে? বোঝা মুশকিল। দাঁড়াও; পাই তোমায় একা। তখন গুমোর থাকে কোথায় দেখব। মুখে বলল, প্রথম পোয়াতি। সাবধানে থাকতে হয়।

মুখ ঝামটা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল উমা। ঘুরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে দুপুরের দিকের সেই টেকোটা তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। দুই ভ্রূর মাঝে কাটা দাগ। দাড়ি গোঁফ একদম নিকিয়ে কামানো। একেবারে ছোবড়া ছাড়ানো নারকোল। এই লোকটাই তো—

কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকেই উমা দেখল, তারাপদ জমাদার বলছে, রোজ একজোড়া ডাব দরকার যে!

লোকটা ঝুঁকে গিয়ে বলল, কর্কচি ডাব তো। এ সময় ও ডাবে শরীরে কাজ দেয়।

উমা আরও কেঁপে গেল। দেশসুদ্ধ লোক জানে তাহলে—সে ছেলের মা হতে যাচ্ছে! এতটা চাউর হল কি করে। তারাপদর উপর তার খুব ভরসা। হাফপ্যাণ্টের বাইরে মানুষটার পায়ের থোড়া পাথর হয়ে থাকে সব সময়। বসে থাকা অবস্থাতেই আচমকা লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভিড় ভেঙে দেয়। এর আগে তারাপদ জমাদারের সঙ্গে সে তিন থানা ঘুরে তবে

এখানে এসেছে। তারাপদর উপর তার খুব ভরসা। লোকটা করিৎকর্মা। স্বামী জিনিসটা তো এ-জন্যেই।

সন্তোষ টাকি তারাপদ জমাদারের হাতের একখানা আদরের থাপ্পড় খেল। সব দিক নজর আছে তো তোর।

তা রাখি স্যার। আপনি এবারে বাবা হবেন--বলে মনে মনে সন্তোষ অঙ্ক কষে দেখল, হারামজাদা তার চেয়ে কম করেও আট ন' বছরের ছোট। পহলা বারের বাবা--তাও ধোকা। জেলে থাকতে শেখা--স্যার স্যার ভাবটা মুখে চোখে বজায় রাখতে রাখতে সন্তোষ দেখল, মেয়েছেলেটার হাতে সোনার মোটা বালা। ভাল করে মোচড়ালে চাই কি একখানাও যদি হাতে আসে--তাহলে না হোক এক ভরির আন্দাজ সোনা তো হবে।

দু' জনের কেউই সুবিধে করতে পারল না। তারাপদর হাতের থাপ্পড় বেশ ভারি। ভদ্রেশ্বর ভেবে দেখলো--তারাপদকে বলে দিলে খানিক মারধোর জুটবে শুধু কপালে। বরং মেয়েছেলেটাকে একা পেলে সুবিধে করা যেতে পারে।

সন্তোষ টাকির বাড়লো শুধু অস্বস্তি। সে ডাকাতি পারে। ছিনতাই পারে। জিনিসপত্র মোটামুটি সরাতে পারে। এর বেশী আর কিছু না।

ওরা দু'জন হাঁটতে হাঁটতে রেল স্টেশনে এল। সন্তোষ বলল, এক কাঁদি কচি ডাব জোগাড় কর তো--

সে এখন কোথায় পাব ?

কর না জোগাড়। কারও গাছ থেকে। তোকে একটা বড় খবর দেব।

সে খবর আমার জানা--

কেমন ?

বোকা ডাক্তার পেটে ছেলে করে গন্ধ করে দিলো তো--

সন্তোষ দাঁড়িয়ে গেল। উরি বজ্জাত। তুমিও কান পেতে ছিলে ?

তারপর দু' জনই একসঙ্গে হাসতে হাসতে চোখ বন্ধ করে ফেলল। চারটে বত্রিশের লোকাল আওয়াজ করে এসে সে হাসি চাপা দিয়ে দিল। ওঠাউঠির ভিড়ে এক ডাবওয়ালার কচি এক কাঁদি ভদ্রেশ্বর নিমেষে হাবিশ করে দিল।

বদ্যিনাথ, দেবেন--দু' জনেরই ধানের গোলায় একটু একটু করে ধানের

দর চড়ছে। জবেদ আলির মাছের খোটিতে ফাগুনের বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে চিংড়ি আসতে শুরু হয়েছে। চন্দনেশ্বরের গোহাটায় এবার হেলে বলদও আসছে ভাল ভাল।

বোকা ডাক্তারের চেম্বারে ধূপধুনোর ভেতর দেয়ালে দেয়ালে হ্যানিমান, যীশু, নেতাজী, নিজের মায়ের ছবি।

বোকা কাকে বোঝাচ্ছিল, প্রথমে হল গিয়ে মহাভারত। তারপর হোমোপ্যাথি। রামায়ণ। শেষমেস ওই হল গিয়ে অ্যালোপ্যাথি। তা যার যা ভাল আমি তা নিয়ে থাকি। ফোঁড়াফুড়ির ইঞ্জেকশনও দিয়ে থাকি। গরুর অ্যানিমিয়ার চিকিৎসাও কি বেলারমেল ইঞ্জেকশন দিয়ে করিনি?

লো ভোল্টেজের নিভু নিভু ইলেকট্রিকের আলো। তাতে ধূপের ধোঁয়া। দেওয়ালে ওনারা। তার ভেতর বসে বোকা ডাক্তার। নিজের মহিমার কথা বলছিল। অবসর পেলেই বোকা কিছুকাল ধরে এরকম নিজের কথা বলছে। বলে আর থামে। আবার বলে।

এরকম মহিমা কীর্তনের মাঝে ওরা দু'জনে এসে ঘরে ঢুকলো। বোকা সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন বন্ধ করে বলল, কি ব্যাপার?

সন্তোষ টাকি কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, ডাক্তারবাবু, ভদ্রার পেটটা দ্যাখো তো। ফেঁপে আছে সারাদিন।

ভদ্রেশ্বর হাফ শার্ট তুলে ধরে বলল, সত্যি দ্যাখো তো।

ঘর ভর্তি লোকজন। কম্পাউণ্ডার দাঁড়ানো। হাত কাঁপছিল। তবু সেই হাত বোকা ডাক্তার ভদ্রেশ্বরের নাইকুণ্ডুলিতে রাখল। হুঁ। খুব গরম দেখছি। কি খেয়েছিলি দুপুরে? গুরুপাক জিনিস—

সন্তোষ হাসতে হাসতে বলল, একদম হজম হয়নি। হাঁসফাঁস করছে ডাক্তার—

সন্তোষ টাকি আর ভদ্রেশ্বরের চোখ চকচক করছে দেখে বোকা ডাক্তার ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলো। এবার যেন কম্প দিয়ে জ্বর আসবে। এমন কাঁপুনি।

সন্তোষ তখনো বলে যাচ্ছিল, ও কি হজম হওয়ার জিনিস! ও কি চাপা থাকে?

বোকা ডাক্তার সাত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। চল চল পাশের ঘরে শুয়ে পড়। পেটটা বুকটা ভাল করে দেখবো। গাদ মেশানো তাড়ি গিলবি!

তা অমন হবে না?

ভদ্রেশ্বর, সন্তোষ টাকি—কেউই নড়ে না। ভদ্রেশ্বর বলল, এখানেই দ্যাখো না কেন। সবাই আছেন। পেটটা ফাঁপলো কেন শুধু শুধু। কি এমন গুরুতর জিনিস খেয়ে এ অবস্থা।

চল না শুয়ে পড়বি। তারপর তো দেখবো।

সন্তোষ টাকি হাসতে হাসতে বলল, ও ডাক্তার। আমারও যে পেট ফেঁপে আছে দুপুর থে—

বোকার চেম্বারের পাশেই কম্পাউণ্ডারের কাঠের ফোকর কাটা খুপরি। তার লাগোয়া ফিমেল কেস দেখার ঘর। সেখানে চাটাই পাতা চৌকি। দেওয়ালে থার্মোমিটার ঝুলছিল। পেছন দিকে একটা খিড়কিড় দরজা। এর পাশেই বোকা ডাক্তারের পুকুর। হাঁস রাখার ঘর। হাঁসেরা সেখান থেকে প্যাঁক প্যাঁক জুড়ে দিল।

তাই শুনে বোকার শীত আরও বেড়ে গেল। ঘরে ঢুকে খুট করে আলো জ্বেলে দরজা বন্ধ করতেই—দু' দুটো আস্ত রুগী সোজা দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে দু'জনেরই চোখ বুজে এল। কোণাকুনি দেওয়ালে দু'জনেরই উল্টো ছায়া কুঁজো হয়ে পাশে মোটা হয়ে গেল। কারণ, তখন দুজনই প্রায় একসঙ্গে পেটে হাত দিয়ে ভাঁজ হয়ে ঝুঁকে আরও খ্যা খ্যা করছিল। সন্তোষ টাকির তো হাসি থামেই না। বুঁজে আসা ডান চোখের কোণে এক ফোঁটা জল এসে দাঁড়াল তার।

দু'জনের মাঝখানে বোকা ডাক্তার দাঁড়িয়ে। পায়ে পাম্পসু। গায়ে ফুল হাতার শার্ট। ওপরে খয়েরি কোট। দু' কানের ভাঁজে কালো রঙের কিছু লম্বা লম্বা চুল। ভারি চিবুক। ধুতির কোঁচা মাটি থেকে অনেকটা ওপরে ঝুলে আছে। গালে গলায় আরামের মাংস। নিজের পাতনে চোলাই হওয়া পাকা আঙুরের সুরা পানে ডাক্তারের দুই গালে দু'টি লাল ছোপ। স্বাস্থ্যের সেই লক্ষণ এখন লজ্জা, ভয়ে, শীতে বন্ধ ঘরের ভেতর বোকার গলা অব্দি ছড়িয়ে পড়েছে। বোকা এখন ভালো বাংলায় একদম 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়'।

রুগীর পেট ফেঁপেছে। কিন্তু রুগী শোয় না। অথচ পেটটা টিপে দেখা দরকার। লিভার কোন স্টেশনে এখন না জানলে কি করবে?

নে শুয়ে পড়।

শুচ্ছি শুচ্ছি ডাক্তার। উরিঃ! বাস্! এই শিয়রের একটা বালিশ পর্যন্ত নেই। বলতে বলতে ভদ্রেশ্বরের চোখ আবার বুঁজে এল। এখন আনন্দে, হাসিতে তারও চোখে জল। কতকাল পরে একটা ভাল ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। বাইরের স্টেশন বাজার থেকে একদম আলাদা—চাদ্দিক থেকে বন্ধ এ ঘর এখন শুধু আনন্দের। ভদ্রা হঠাৎ তিড়িং দিয়ে লাফিয়ে উঠলো—আর খেউরি করতে হবে না গো। আর হবে না গো। বলতে বলতে তার ডান হাতখানা নিজেরই বাঁ বগল বাজাতে লাগল। আর কোন চিন্তে নাইগো!

সেই তিড়িং যত বাড়ে সন্তোষ টাকির খ্যা খ্যাও তত বাড়ে। আর ভাঁজ হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেওয়ালে নিজের ছায়াকে কুঁজো—পাশে মোটা করে ফেলে। বোকা ডাক্তারের ছায়াটাই শুধু সিধে। কোন নড়ন চড়ন নেই।

বাইরে অন্য রুগীরা বসে। কিরীটি বাউরির বউয়ের একটা ডেলিভারি কেস আসার কথা। সবাই তাকিয়ে আছে এ-ঘরের দিকে। মাঝখানে একটা শুধু বন্ধ দরজা।

সন্তোষ ঢিমে তালে গেয়ে উঠল। বোকার এবার খোকা হবে। হবে—এ—এ—

চৌদিক বন্ধ বলে ঢিমে গানটুকু ঘরের ভেতর গুমগুম করে উঠলো। স্টেথিসকোপ ফাঁস হয়ে গলা থেকে ঝুলছে সেই থেকে। বোকার নিজেকে গলায়-দড়ির কেস লাগতে লাগল। কি চাস তোরা?

হবে। হবে। বলতে বলতে সন্তোষ ঘরের চাদ্দিক নিচু হয়ে খুঁজতে লাগল। আসলে যে এ একটা খোঁজার ভান তা যে কেউ দেখেই বলতে পারত। আচমকা খিড়কির শেকলটা আরও জোর করে চেপে দিয়ে বলল, এ পথ দিয়েই আসতো। এ পথ দিয়েই পার করে দিতে? বাঃ! বাঃ! কী বুদ্ধি! হাজার হোক ডাক্তার তো। কি বলিস ভদ্রা?

একশো বার। উরিঃ। সন্তোষদারে—আমার যে পেট ফেঁপে উঠলো। আর হাসাস নে। না ওগরালে তো পেট ফেটে যাবে। মরে যাব সন্তোষদা। এবারে ঠিক মরে যাব।

শীত এখনো যায় নি। কণ্ঠমণি থেকে ঘামের ফোঁটাগুলো কাচিয়ে মুছে নিল বোকা ডাক্তার। কি হলে হবে তোদের—

হবে নে। দাঁড়াও ডাক্তার।

তোদের পায়ে পড়ি। আর দাঁড়াতে পারছিনে আমি। বলতে বলতে ডাক্তার চৌকি ধরে বসতে যাচ্ছিল।

সন্তোষ বোকার কোমর ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, উঁহু। এখন কি? আগে বাইরে গিয়ে সুখবরটা দি। তোমার গিন্নি চাই কি খুশী হয়ে—

বসতে গিয়ে বোকার ধুতির কোঁচায় মেঝের ধুলো লেগে গিয়েছিল। নিভু ডুমের আলোয় মাথা নিচু করে ছোট খোকাটির পারা বোকা ধুলো ঝাড়ছিল। এ কথায় কোঁচা ছেড়ে দিয়ে বোকা চোখ বড় বড় করে তাকাল। কোঁচা বোধহয় খানিকটা খুলে গিয়ে থাকবে। তাই লোটানো ধুতির খুঁট আবার ধুলোয় মাখামাখি।

ওরে বাপ আমার। ওকাজ করিস নে। আমার বড় জামাই এখন এখানে।

তবে তো খুব ভাল সময়। ভদ্রেশ্বর হাসতে হাসতে কাছে এগিয়ে এল। নাকের কাছে নাক নিয়ে বোকার চোখের মণিতে দুই মণি দিয়ে তাকালো। তারপর সেখান থেকে মাথা দুলিয়ে পিছিয়ে এসেই ভাঙা গলায় গেয়ে দিল, বোকার এবার খোকা হবে—

সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে তালি দিয়ে উঠলো সন্তোষ টাকি। একদম মহাষ্টমীর বলির বাজনার তাল। থামতেই চায় না।

সন্তোষ টাকির হাতের এক একটা তালি গদাম গদাম বুকে এসে পড়তে লাগল। এক একটা বুকে পড়ে আর বোকা ডাক্তারের মাথার পেছনে লিক করে বাতাস বেরোতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

নিভু আলোয় নিকোনো গালের সন্তোষ টাকি তখনো লাফাচ্ছিল। এক সময় ভোল্টেজ বেড়ে গিয়ে আলোটা দপ করে জেগে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বোকা ডাক্তার ধপ করে চৌকিতে বসে পড়ল। কি চাই তোদের খুলে বল। আমায় এবারকার মত বাঁচা। আর পারছিনে ভদ্রা—এই দ্যাখ আমার বুকটা শুধু লাফাচ্ছে।

সন্তোষ বলল, এখন তো নাফাবেই। পরে আরো নাফাবে দেখো।

বোকা পরিষ্কার দেখলো—তার সামনের দেওয়াল শুধু দুটি লোক দিয়ে তৈরী। সেই দেওয়ালের আধখানা সন্তোষ টাকি। বাকি আধখান ভদ্রেশ্বর। যে এতদিন তার পায়ের নখ গোল করে কেটে দিত। একবার

ওর বাপের চিকিৎসা করায় টানা তিনমাস দাড়ি কামিয়ে ভিজিট, ওষুধের পাওনাগণ্ডা শোধ করে। সে কি না এখন—

সন্তোষ টাকি খোঁচা দিল ভদ্রেশ্বরকে। দ্যাখ। দ্যাখ। এখন কেমন খোকা করে ফোঁপাচ্ছে। অ্যাই দ্যাখো। আবার কাঁদে। হচ্ছে কি?

আমায় ছেড়ে দে তোরা। এই বাহাত্তরটা টাকা আছে। নে তোরা। আমায় ছেড়ে দে। আমার একটা মান আছে। আমি ডাক্তার।

সে তো জানি। আমার বাপকে চিকিৎসে করলে। তার বদলি তিনমাস ভোর দাড়ি কামালাম। সারা বাড়ির নখ কাটলাম। বগল কামালাম। তুমি ডাক্তার। এ আর বড় কথা কি? কি বল সন্তোষদা!

সন্তোষ টাকি মজা করে বলল, তা একটা কথার মত কথা তো। মানী লোকের মান আছে না। বাহাত্তর টাকার গোছাটা ফতুয়ার ভেতর পকেটে রেখে দিয়ে বলল, হাতের আংটিগুলো দাও তো—

এ তো গ্রহশান্তির—

কথা শেষ হল না বোকা ডাক্তারের।

ওগো। দরজা খোলো গো। সঙ্গে দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা। না খুললে ভেঙে ফেলবো।

সন্তোষ গিয়ে একলাফে বোকা ডাক্তারের সামনে দাড়াল। ধাক্কাতে বারণ কর। আমার আবার ধাক্কাধাক্কি একদম পছন্দ হয় না।

ভদ্রেশ্বর এগিয়ে এসে বলল, বোকার সরকারী বউটা তো বড্ড চেঁচায়। থামতে বল—

ডাক্তারের কপাল, নাকের ডগা ঘামে ভিজে উঠেছে। কোঁচার ফুলকে ঝুল মেঝের ধুলোয় মাখামাখি। চৌকিতে নিজের শরীরটা যাতে একদম পড়ে না যায় সেজন্যে বসে পড়ে দুখানা হাত পেছনে ফেলে ভর রেখে হেলে আছে। সেই অবস্থায় বলল, কিছু মাথায় আসছে না। কি করব বল? তোর পায়ে ধরছি ভদ্রা। বলে দে ভদ্রা—

সন্তোষ টাকি দরজা ধাক্কানোর শব্দের ভেতরেই বোকা ডাক্তারের আঙুল থেকে টুক টুক করে আংটিগুলো খুলে নিচ্ছিল।

আঁতকে উঠে বোকা একবার শুধু বলতে পেল, ওটা নিসনে সন্তোষ। ওটা পুরো এক ভরির—

ধমকে উঠলো ভদ্রেশ্বর। দরজা খুলে মাকে গিয়ে বলব? বোকা

আবার বাবা হবে। কাঁথা সেলাই করেছো?

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের গেঞ্জির নীচের বুকখানায় ভিজে ন্যাকড়া কে মেলে দিল। সেই শীতের ছ্যাঁকায় চড়াৎ করে উঠে দাঁড়াল বোকা। কী বলব বলে দে না বাবা? তোরাই আমার সব। বলে দে লক্ষ্মীটি।

আবার দরজায় ধাক্কা।

তাড়াতাড়ি বল ভাই। আমি আর পারছি নে সন্তোষ। বলতে বলতে ধুলোভর্তি মেঝেতেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ডাক্তার। জোড়হাতে সন্তোষের দিকে তাকিয়ে। হাঁটু নীচে কাঁকর পড়ে বেদম চিনচিন করে উঠলো। সে অবস্থাতেই বোকা আবার বলল, আমায় একটা পথ দেখা ভদ্রা—আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনে—

ঘরের ডুম আবার নিভু হয়ে এল। দরজায় ধাকাটাও বেড়ে গেল। তারই ভেতরে সন্তোষ একই রকমের খ্যা খ্যা হাসিতে নিজে নিজে ঝুঁকে পড়ল। চোখ বুজে এল। সেই ভঙ্গিতেই বলে উঠল, উরিঃ। বাস্! ভদ্রারে! আর পারছিনে। অন্ধকে পথ দেখা মাইরি—

ভদ্রেশ্বর ধমকে উঠলো। এই আমি শুয়ে পড়লাম। যাও। দরজা খুলে বল—রুগী দেখছি।

সত্যি সত্যিই ভদ্রেশ্বর চৌকিতে শুয়ে পড়ল। শুতে শুতেই বলল—যাও না দরজা খোলো গে। ভয় নেই কোনো। সন্তোষদা—পকেটগুলো হাতড়ে দেখে নাও একবারটি—

সন্তোষ টাকি পকেট হাতড়ে একখানা দশ টাকার নোট পেলো আরও। পেয়েই লাফিয়ে উঠল, ঠিক বলেছিস তো ভদ্রা।

ভ্যাবাচ্যাকা বোকা ডাক্তার বলল, দরজা খুলে কি বলব? বলে দাও তোমরা। তোমাদের পায়ে পড়ি। বল—

বোকাকে সন্তোষ ঘুরিয়ে দরজামুখো করে দিল। বলবে, পেট কেঁপেছে। ডাক্তার না তুমি! যা ইচ্ছে বলে দাও না। তারপর সেই খ্যা খ্যা হাসি দিয়ে বলল, বলগে—গুরুতর জিনিস হজম হয়নি। ওগরাতে না পেরে ব্যথায় টাঁটাচ্ছে—

বোকা দরজার দিকে এগোতেই চৌকিতে চিৎপটাং ভদ্রেশ্বর সত্যিই চ্যাঁটাতে লাগল, ও মাগো—গেলাম গো—

চন্দনেশ্বরের মাচান তলায়

আমাদের এখান থেকে কলকাতার ট্রেন আরও বাইশ মিনিটের ছুট দিয়ে তবে একটা নদীর সামনে গিয়ে থামে। তার ওপারেই বাদা। অনেকে বলে লাট অঞ্চল। সেখান থেকে অভাবী মানুষ নদী পেরিয়ে ট্রেনে এসে ওঠে। কলকাতার রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষে করে। আশ্চর্য! সেখান থেকেই সস্তার চাল ইলেকট্রিক ট্রেনে স্মাগল্ হয়ে কলকাতায় ঢোকে। ট্রেন লাইনের দু'ধারে ছড়ানো সব গ্রাম, ধানক্ষেত—দূরে দূরে সাবেক জমিদারের পরিত্যক্ত চাষবাড়ি।

এসব দিক থেকেই আমাদের স্টেশনে অনেকে রিক্সা চালাতে আসে। অন্য অন্য জায়গায় দেখেছি—রিক্সার পেছনে রিক্সার নাম লেখা থাকে। এখানে লেখা থাকে মালিকের নাম। প্রোঃ অবিনাশ নস্কর কিংবা প্রোঃ দেবু ঘোষ ইত্যাদি লাল রঙে লেখা প্রায়ই এখানকার বাজারে চলন্ত রিক্সার পেছনে দেখা যাবে। সিটগুলো ছোট। দুজনে বসলে পেলভিসে লাগবে।

রিক্সাগুলো সাত-পুরনো। রাস্তা একটু খাড়াই হলেই চেন খুলে যাবে। প্রায়ই লিক নয়ত পাঙচার লেগেই আছে। এমন রিক্সাও বাদা থেকে আমদানী আনকোরা চালিয়ের হাতে পড়ে—বলা ভাল, পায়ে পড়ে প্রথম প্রথম দিব্যি চলে। ছুটন্ত রিক্সায় বসে ওদের পায়ের মাস্‌ল্ দেখে বুঝতে পারি, লাট অঞ্চলের মানুষটি কতদিন হল রিক্সাওয়ালা হয়েছে।

ট্রেন আচমকা বন্ধ হলে ওদের সুসময়। তখন সারাদিনে দশ-বারো টাকা কামানো কিছুই নয়। ফাঁকা রাস্তা ধরে জংশনে পৌঁছে দিতে পারলে প্যাসেঞ্জাররা অন্য লাইনের ট্রেন ধরে কলকাতায় যায়। দিনের বেলায় অনেক সময় মন্দা যায়। কিন্তু লাস্ট ট্রেনের প্যাসেঞ্জাররা রাত পৌনে বারোটা নাগাদ স্টেশনে নেমে যখন রিক্সা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে—তখন মনে হয়—

নাঃ! কাজ বটে একটা। সেই সময় যে সব এলাকায় ইলেকট্রিক যায় নি—সেখানকার প্যাসেঞ্জাররাই বেশি করে রিক্সা চায়। আসলে রিক্সায় চড়া যতটা না দরকার—তার চেয়ে বেশি দরকার অন্ধকার পথে একজন সঙ্গী। রিক্সাওয়ালারাও তা জানে। তাই রওনা দেবার আগে বাতিটা ধরিয়ে নেয়।

এইভাবেই আমার সঙ্গে তরুর আলাপ হয়েছিল। লাস্ট ট্রেনে ফিরলে তরু আমায় পৌঁছে দিত।

কোলে মারকেটে আমার সবজি যায়। উচ্ছে, ঝিঙে, পটল, আলু—যখনকার যা—পাইকারি দরে আমি কিনি। কোথাও কোথাও চাষের সময় আমি গাঁয়ে গিয়ে চাষীদের দাদন দিয়ে রাখি। ফসল উঠলে ফসলটা আমার গোলায় জমা দিয়ে চাষী হিসাবপত্র কাটান ছাঁটান করে।

ফলে আমাকে অনেক সময়েই এমন এমন জায়গায় যেতে হয় যেখানে বাস নেই। অনেক সময় আমি হেঁটেও যাই। আবার বাস পেলে বাস। রিক্সা পেলে রিক্সা। যখন যে রকম। এদিকটায় কোল্ড স্টোরেজ এখনো হয়নি বলে আমার মত লোকের ব্যবসা খারাপ চলে না। বিশেষত বরবটি আমাকে গত বোশেখে অপর্যাপ্ত পয়সা দিয়েছে।

এদিককার চাষীরা বেশ ভাল ফলায়। কেউ কেউ তো দশ বিঘে অবধি শুধু লঙ্কাই লাগায় এক এক মরসুমে। একদিন অন্তর একদিন দু'মণ তিন মণ শুধু লঙ্কাই আমাকে কিনতে হয়। ইদানীং দেখছি অসময়ের মুলো ভাল পয়সা দিচ্ছে। কলকাতার হোটেলের যে কি না লাগে!

তরু একদিন বলল, বাবু আমায় টায়ার কিনে দাও একজোড়া। রিক্সা চড়িয়ে শোধ করে দেব।

কত লাগবে?

আঠারো টাকা বিশ পয়সা।

দিলাম আমি। কিন্তু দিয়ে বিপদে পড়লাম। আমাকে স্টেশনে দেখলেই তরু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কারণ সিম্পল্। আমি চড়লেই তো পয়সা পাবে না ও। ধার কাটান যাবে। কাছে গেলে বলে, ভাড়া হয়ে গেছে বাবু। আমার মত লোক তো ওর গলায় গামছা দিয়ে পয়সা আদায় করতে পারে না। তাহলে একটা কথা হবে। তাছাড়া এই চন্দনেশ্বরে আমাকে সবাই চেনে। কেউ কেউ পাট উঠলে পাট রেখে টাকা নেয়। ডাল উঠলে

ডাল রেখেও টাকা নেয়। আমার গোলার গায়েই একটা বড় ঘর নিয়েছি। সেখানে আমার রাখী কারবার। জিনিস রেখে আমার টাকা নেয়। দর উঠলে বেচে দিয়ে আমার জায়গার ভাড়া—সুদসমেত টাকা ফেরৎ দেয়।

এ জায়গাটি আমার বড় ভাল লাগে। এখানে আমার দেশ নয়। কিন্তু এখন দেশ হয়ে গেছে। এখানে বোস ডাক্তার আমাকে ইঞ্জেকসন দেয়। দুর্গা ডাক্তারের মিকশ্চার আমাদের বর্ষাকালের সঙ্গী। কাছাকাছি ঘোষপুরের মর্তমান কলার মত অত বড়, অত ভাল কলা আমি কোথাও দেখিনি। এখানকার পঞ্চাননতলায় সারা বছর পুজো, নাম-গান লেগে থাকে। নিশে, পালান ওরা গাঁজা খায়। চোত মাস ভর হরির নাম করে। চরণ মাত্র একটি। হরে রাম হরে রাম—রাম রাম হরে হরে। একটি মাস ধরে গাইলেও পুরনো হয় না। কেউবা তখন সন্ন্যাস নেয়। পরণের বস্ত্র বাবার রঙে ছোপানো। বাবার নাম করে তারকেশ্বরের দিকে পাড়ি দেয়। ফিরে আসে ন্যাড়া হয়ে। হাতে একটি পাঁচ-ছ' কিলোর কুমড়ো। সেখানে নাকি সস্তা।

এখানে গমকল আছে। ধানকল আছে। তিনটে অপেরা পার্টি ছাড়াও অ্যালোপাথ, হোমোপাথ সমেত মোট সতের জন ডাক্তার আছে। ভোর রাতে ভেড়ির নোনা মাছ এখানেই নিলাম হয়। ট্রেন বোঝাই দিয়ে এখানকার তাড়ি কলকাতায় যায়। তাতে ব্যবসায়ীরা স্যাকারিন, মিল্ক পাউডার আর খালের জল ইত্যাদি মেশায়। এখানকার লোক ও তাড়ি খাবে না।

বরং কলকাতার বাসি সিনেমা এখানকার হলে লোক লাইন দিয়ে দেখে। গাদা গাদা আলুর চপ আর বিড়ি পাতার দোকান রাস্তার দু'ধারে। সম্প্রতি একটি ব্যাংক হয়েছে। ব্যাংকবাড়ির এক তলায় একটি সুন্দর কাপড়ের দোকানও হয়েছে। মিষ্টির দোকানে রসগোল্লা যত ছোট হচ্ছে—দামও তত বাড়ছে। রবিবার সকালে পিচ রাস্তার গায়ে মোটা তে-পলতের ডালে পাঁঠা-খাসির ছাল ছাড়িয়ে টাঙিয়ে দিয়ে বিক্রি হয়। কলকাতার চেয়ে কেজিতে পঞ্চাশ পয়সা কম।

নতুন নতুন লেদ মেসিন বসেছে। কাছাকাছি সারের দোকান। বিষের দোকান। কেরোসিন মাঝে মাঝে হাওয়া হয়। সরষের ঘানি আছে। খাঁটি কলম্বোর নারকেল তেল বারো টাকা কেজি। একখানা হাল বর্ষায় পাঁচ

ছ' টাকা। বোরোতে সাত টাকা অবধি ওঠে। সরষের খোল ষাট পয়সা—গরুর ভুষির কেজি এক টাকা। চিনি নেই। একজন ডেকরেটর আছে। বিয়ে শ্রাদ্ধ সে একাই সামলায়। একটা ছাপাখানা ছিল। কোশ্চেন আউট হয় বলে পুলিস এসে বন্ধ করে দিয়েছে।

তিনটে প্রাইমারি একটা উচ্চ মাধ্যমিক ছাড়াও দুটো টিউটোরিয়াল হোম আছে। একটির সাইনবোর্ডে পরিষ্কার লেখা আছে—টাকা অনুযায়ী গ্যারান্টি সহ ফার্স্ট ডিভিশনে, সেকেণ্ড ডিভিশনে এবং থার্ড ডিভিশনে পাশ করানো হয়। গ্যারান্টি সহ ফেল করানো হয়—একথা শুধু লেখা নেই।

নানান দোকানের বারান্দায় ঘুগনি বসে রাত আটটার পর। তার সঙ্গে চোলাই চলে। প্রকাশ্যে কোন বেশ্যালয় নেই। সৌণ্ডিকালয় একটিই। মালিক একজন মুখার্জী ব্রাহ্মণ। কু-লোকে বলে দেশিতে তিনি ভুরি পরিমাণ জল মেশান। শ্মশান এখান থেকে আট মাইল। টি বি হলে লোকে কলেজে যাওয়ার চেষ্টা করে। বেশির ভাগই সিট পায় না।

মুড়ি-মুড়কির যুবাবয়সী দোকানদার মোজা দিয়ে পাম্প-সু পরে বিয়ে করতে যায়। বউ নিয়ে ফেরার পথে রিক্সা সাইকেলের পেছন পেছন ব্যাণ্ডপার্টি যায় গাঁয়ের পথ দিয়ে। নতুন খড় উঠলে কাহন ষোল টাকা। একজোড়া ভাল বলদ আটশো টাকা। পুরনো ধানের বস্তা আশি টাকা অবধি ওঠে। জল দেবার পাম্প ভাড়া এক ঘণ্টা চার টাকা পর্যন্ত।

ফটো তোলার ফটো বাঁধাইয়ের দোকান একটিই। কংগ্রেস, সি পি আই, সি পি এম নিত্যপদশ্রী নামে একটি জুতোর দোকানে বসেই আড্ডা দেয়। খদ্দেরদের তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জুতো বাছাই করতে হয়। বালি, সিমেণ্ট কোনোটাই ন্যায্য দামে পাবার উপায় নেই। লোকাল তামাকের দোকানে গুড়ের ভাগই বেশি মেশায়।

দু'টি ইটখোলায় রাঁচি, পুরুলিয়ার মেয়ে-পুরুষ খাটতে আসে ফি'বছর। তারাই স্টেশনারি দোকানগুলোর সস্তার মালপত্র কিনে কিনে দোকানগুলো বাঁচিয়ে রেখেছে। ওরা মাস সাতেক থাকতে থাকতে ইটখোলাতেই মুরগি পোষে, ডিমে তা দিয়ে ছানা করায়—সে সব জিনিস বাজারেও আসে।

তাছাড়া শীতকালে ধানক্ষেতে, ভেড়িতে, কাদাখোঁচা, ডোখোল, বেলে-হাঁস ধরা পড়লে আজাহার মোল্লা সর্বাগ্রে আমার কাছেই নিয়ে আসে। ছ'সাত জন ওয়াগন ব্রেকার ছিল—তার বেশির ভাগই এখন ফেরার—দু-

একজন ধরা পরার পর মার খেয়ে পুলিস হাসপাতালে।

এই হল গিয়ে আমাদের চন্দনেশ্বর। একটু এলোমেলো করে বলা হল। তা হোক। এখানে সবাই সব সময় নিজের কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত। তা তো সব জায়গাতেই। কোথায় বা না? কেউ কেউ জমি কেনা বেচা করে দু'পয়সা করছে। বিধবা কিংবা নাবালক অনাথের সম্পত্তিও মাঝে মধ্যে বেহাত যে হয় না তা নয়। কেউ নারকেল গাছ সদরে জমা দিয়ে দেয়। কেউবা পুজো-আচ্চার দিন এক কাঁদি ডাব পেড়ে নিয়ে বাজারের মুখে এসে বসে। বেচে পয়সা দিয়ে বাজারহাট করে বাড়ি ফেরে।

তা তরু আমাকে ঠকিয়েছে তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। মানুষই তো মানুষকে ঠকায়। আমি তো বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে না-খেয়ে-পরে নেই। কিন্তু ও আমায় রিক্সায় তোলে না কেন? মুখ ঘুরিয়ে থাকে। আমি ওকে নতুন করেই আবার ভাড়া দিতাম। ব্যাপারটা আমার অপমান লাগে। কাজের মধ্যে থাকি। ভুলেও যাই আবার। টেঁড়সটা এবার সময় মত ধরতে পারলে পয়সা আছে।

রাত ন'টার ভেতর গোলায় চাবি দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। দেখি গিন্নি আমার আয়না ধরে পাউডার ঘষছে মুখে। বড়ছেলে বলল, যাত্রা দেখতে যাচ্ছি বাবা। কৃষ্ণ-শকুনি পালার টিকিট দিয়ে গেছে। আমার বউ বিয়ের আগে গড়িয়াহাটার মোড়ে ব্লাউজ কিনেছে। আলেয়ায় সিনেমা দেখেছে। এখানেও নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে বেশ। অনেকে ওকে দিদি ডাকে। বউদি ডাকে। পাশ থেকে দেখলে খুব সুন্দর দেখায়। আজও দেখাচ্ছিল।

আমিও গেলাম যাত্রা দেখতে। সামনের দিকে বসেছি। একেবারে প্রথম সারিতে বাজনদাররা বসেছে। দেখি তার ভেতর তরু মুখ লুকিয়ে ফ্লুট বাজাচ্ছে। সব বাজনা থামলেও তরুর ফ্লুট সুরেলা গানের দোলটুকু সবার মনে চারিয়ে দিচ্ছিল। ওর যে এত গুণ জানতাম না। যাত্রায় মেতেছে। তাই আজকাল আর রিক্সা চালাতে দেখি না।

যাত্রা ভাঙলো রাত চারটেয়। আগে বেরিয়ে একখানা রিক্সা ধরলাম। বললাম, আমার বাড়ি চেনো তো—

না বাবু।

অল্প আলো। মুখখানা দেখতে পেলাম না রিক্সাওয়ালার। ডিরেকশন দিয়ে দিলাম। মেয়েদের পৌছে দিয়ে রিক্সাটা ফিরতি পথে আমাকেও

পৌঁছে দিল। নির্জন পথ। শেষ রাতের চাঁদ সব জায়গায় আলো দিতে পারেনি। ঢোল-কলমির ঝোপ-ঝাড়ে জোনাকি—উঁচু-নিচু, উঁচু-নিচু। একটু বেশি ভাড়া দিতে গেলাম। রিক্সাওয়ালা রিফিউজ করল। যা লেয্য তাই দিন।

রিক্সাটা চলে যেতে পেছনে কারও নাম লেখা দেখলাম না। কার রিক্সা বোঝারও উপায় নেই। রিক্সাওয়ালার মুখও ভাল করে দেখিনি। লাট অঞ্চল থেকে লোকটা বোধ হয় নতুন এসেছে।

একদিন ঝড়ে দেবেনের গমকলের তিনখানা টিন উড়ে গেল। আরেকদিন পঞ্চাননতলায় পুজো দিতে গিয়ে চাকবেড়ের এক মেয়েছেলের ওপর ভর হল। আমাদের চন্দনেশ্বরে এই সবই হল খবর। মাঝে মধ্যে শেষ রাতে ডাকাতি হয়ে যাওয়ার খবরও আসে। দূর দূর গাঁয়ে।

লরি থেকে উচ্ছে উঠছিল গোলায়। সকালবেলা। পেমেণ্ট দিয়ে বসে আছি। লোক থাকলেও নজর রাখতে হচ্ছে লরির দিকে। বছর ছত্রিশ সাঁইত্রিশের একজন লোক সোজা আমার কাছে এসে বলল, বাজার ভেঙে গেছে বাবু। আড়াইশো ঢেঁড়স দরকার ছিল বড়—একজন কুটুম্ব এসে গেল।

আমার এখানে তো খুচরো চলে না বাবা। আর কিছু বললাম না। আমি তালগাছতলায় পাইকারী দরে বিলাতি আমড়া কিনে ব্যবসা শুরু করেছিলাম। খুচরো কিনতে লোক পাঠিয়ে বড় বড় ব্যাপারীরা দরের আন্দাজ নেয় আমি জানতাম।

লোকটি বলল, যাত্রা দেখে আপনি ফিরলেন। আমি পৌঁছে দিলাম বাবু।

ওঃ। তোমার রিক্সা ছিল। তাইতো। নিয়ে যাও—পয়সা দিতে হবে না।

বিনে পয়সায় নেব না।

অতএব ওজন করে পয়সা নিয়ে আড়াইশো ঢেঁড়স দিতে হল। চলে যাচ্ছিল। ডেকে বললাম, তোমার নাম কি গো?

অমৃত। অমৃত দাশ।

তুমি তো এখানকার লোক নও।

নারকেলবেড়ে আমাদের বাড়ি। আমি মাস তিনেক হল এদিকে রিক্সা চালাচ্ছি।

তোমার রিক্সাখানা ভাল কর। আমি টাকা দিচ্ছি। চড়িয়ে চড়িয়ে শোধ করে দেবে।

টাকার দরকার নেই। রিক্সা আমি বানাতে জানি।

তাহলে অনেক রিক্সা বানিয়ে ভাড়া খাটাও।

আমি আর বাড়াব না। আটখানা রিক্সা বানিয়েছিলাম একে একে—

সে সব রিক্সা কোথায়?

আজ এটা ভাঙে। কাল ওটা ভাঙে। অন্য যারা চালায় তাদের সব দিয়ে দিয়েছি। এই একখানা নিজের জন্য রেখেছি। যেমন পয়সা আসে তেমন দিন কাটে। রান্নাটা চড়িয়ে দিইগে। ঘরে লোক আছে। বিকেলে এসে কথা বলব বাবু।

তোমার বউ ছেলে-মেয়ে কোথায়?

সে-কাজটা করা হয়নি বাবু।

মনে মনে ভাবলাম, অমৃতর কোন রোগ বালাই থাকতে পারে। তাই হয়ত বিয়ে হয়নি। রিক্সা চালিয়ে চালিয়ে অনেকের কাশ রোগ হয়। লোকটা বিবেচক। অসুখ সুদ্ধ বিয়ে করে আরেকটা মেয়ের সর্বনাশ করেনি। চেহারাটা ক্ষয়াটে। চোখ জ্বল জ্বল করছে। হাফসার্টের নিচে লুঙি। কোমরে গামছা প্যাঁচানো। তোমার অসুখটা কিসের বাবা?

অসুখ? আমি নীরোগ বাবু। স্টেশনের কলের পরিষ্কার জল খাই। শিবুর দোকান থেকে আটার রুটি কিনি—সঙ্গে ডাল দেয়। চলে যায়।

তবে বিয়ে করনি কেন?

অমৃত মাথা নিচু করে যা বলল, তা আমার কাছে স্রেফ ন্যাকামি বলেই মনে হল। পরিষ্কার বলল, কত লোকের দুঃখ বাবু। কত অসুখ। কত শোকতাপ। এসব দেখে আর বিয়ে করা হয়নি। আমি তাই যতটা পারি লোকের দুঃখু কমাবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। যদি কোন শেকড়বাকড় জানতাম—তাহলে এই চন্দনেশ্বরের সব জ্বালা যন্ত্রণার আমি একাই উপশম করতাম। আমি যাই বাবু। রান্না চড়াতে হবে—

এ যে দেখি ভাল ভাল কথা বলছে! শাপভ্রষ্ট রিক্সাওয়ালা! এই যে বললে দোকান থেকে কিনে খাও—তবে রান্না চাপাচ্ছ যে!

আমার তো চলে যায় বাবু। গরমকালে রাতের বেলা প্লাটফর্মে শুয়ে থাকি। রেলপুকুরে চান করি। ঘর একখানা নেওয়া আছে। অবশ্য ঝড়-বৃষ্টির

জন্যে। কিন্তু মাঝে মধ্যে কলকাতা যাওয়ার পথে দেশ গাঁয়ের রুগীরা আমার ঘরে আশ্রয় পায়। এনার আবার পেটে ঘা। বিকেলের গাড়িতে কলেজে ভর্তি হতে যাবে। দোকানের রান্না সয় না বলে আমি রান্না করে দিচ্ছি। ত্নটো ভাত ফোটানো হয়ে গেছে।

অল্প বয়সে কোন গুরুতর পাপ করেছিলে?

খানিক ভেবে অমৃত বলল, মনে তো পড়ে না। তবে খুব ছোট বয়সে একটা বিড়ালকে এক হর্তুকি গাছের গোড়ায় বেঁধে রেখে সে গাছের গায়ে ইয়া লম্বা এক মৌচাকে ঢিল মেরেছিলাম। বিড়ালটা মারা যায়।

দেখতে দেখতে অমৃতের চোখের কোণে জল এসে গেল। তাকে যদি পাপ বলেন—তাহলে করেছি।

না। না। সে রকম না। জ্ঞান বয়সে খুব কোন পাপ করেছিলে? সেই অনুতাপে এখন—

মনে তো পড়ে না—

কাজে থাকি। কাজে ঘুরি। অমৃত আমার মন থেকে একদম মুছে গেল। গঞ্জ-গাঁয়ের মত এই চন্দনেশ্বরে আমি খুব কম লোককেই হাত তুলে করজোড়ে নমস্কার করি। কিন্তু কি হল ঠিক বলতে পারব না। পথে ঘাটে আচমকা অমৃতের মুখোমুখি হলেই আমি ত্ন' হাত তুলে নমস্কার করে ফেলি। অমৃতও লজ্জায় মাথা নোয়ায়। মুখের হাসিটা নির্মল। সেই লুঙি, সেই হাফসার্ট, কোমরে গামছা—মাঝে মধ্যে গালে দাড়ি। বলি, কেমন আছো?

খুব ভাল বাবু। খুব সুখে আছি। যেমন চালাচ্ছেন তিনি তেমন চলছি।

তোমার রিক্সা কেমন চলছে?

সামনের চাকাটা ফিরে ফিরে লিক হচ্ছে বাবু। তা আমি নিজেই সারিয়ে নিই। যন্ত্রপাতি সব আমার নিজের আছে।

গাঁজাখোর নিশি, পালান, যত্ন একদিন আধ মণ মুসুরির ডাল চাইতে এল। বাজার-সুদ্ধু সবার কাছে চায় ওরা। কাঙালি ভোজন করাবে।

বললাম, তোরা নিজেরাই তো কাঙালি।

ওরা হেসে মাথা নেড়ে বলল, না বাবু। আমরা খুব সুখে আছি। ভগবানের কৃপায় কোন অভাব নেই আমাদের।

অভাব বুঝবে কোত্থেকে? সারাদিন তো গাঁজার ওপর আছ। ভাল

দিতে পারব না। আধমণ আলু পটল দিয়ে দিচ্ছি। তাই নিয়ে যাও।

ওরা তাতেও রাজি। ছাতা পড়া পচা-ধচা কিছু আলু পটল বিদেয় হওয়ায় গোলায় জায়গা হল।

ওরা যাবার সময় বললাম, তোদের দলে অমৃতকে নিসনে কেন?

কে অমৃত?

রিক্সা চালায় অমৃত দাশ—

ক্ষ্যাপা অমৃত। ওর কথা বলবেন না বাবু। আমরা নাম-গানে ডেকেছিলাম। কিন্তু ওনার সময় নেই। এক একদিন খালি রিক্সা চালিয়ে এক একদিক যায়! নির্জন জায়গায় নাকি ভগবানের খোঁজ করে—বুঝুন ব্যাপার! প্যাসেঞ্জার ফিরিয়ে দেয় তখন।

গোলা বন্ধ করে বসে আছি। লাস্ট ট্রেনে বারো বোঝা মোচা যাবে কোলে মারকেটে। কিছু এঁচোড় আছে। পেঁপে আছে। থোড় আছে দু'বস্তা। ভেণ্ডার কামরায় মাল তুলে দিয়ে তবে বাড়ি ফিরব। খুব গুমোট যাচ্ছে ক'দিন। এমন সময় খালি রিক্সা নিয়ে অমৃত এসে হাজির। চলুন ঘুরে আসি বাবু।

কোথায়?

এই সুদের চর অব্দি যাব। জোছনায় ফিরে আসব।

আমার যে মাল ওঠেনি ট্রেনে।

তুলে দিয়ে চলুন।

ট্রেন যে আসেনি।

এলে যাবেন।

কৌতুহল ছিল। ট্রেন এল। বোঝাগুলো তুলে দিয়ে অমৃতের রিক্সায় উঠে বসলাম। আমি কিন্তু এক পিঠের বেশি ভাড়া দিতে পারব না। হাঁটতেও পারব না।

আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। এখন একটা বাতাস দেবেন ভগবান। রিক্সা ঠেলে তিনিই সুদের চরে নে যাবেন। আমার কিছু করার থাকবে না। একেবারে পাল টেনে নৌকোর মত টেনে নে যাবেন।

মনে মনে ভাবলাম, সুদের চরে ঝিঙে শশা—নানান সবজির বড় চাষ হয়। চোখে দেখে আসা যাবে। এখন রোদের তাত লাগার ভয় নেই। দিব্যি ফিকে জ্যোৎস্না উঠেছে।

সত্যি। রিক্সাখানা বাতাসেই ঠেলে নিয়ে চলল। অবশ্য অমৃতর প্যাডেল করতে হচ্ছিল। ছ'মাইল রাস্তা তো কম নয়। কিন্তু আধঘণ্টাও বোধ হয় লাগল না।

একদা বিদ্যাধরী এই বিরাট তল্লাটের ওপর দিয়ে বয়ে যেত। এখন নদী নেই। তার বিরাট চর জেগে আছে। জল শুকিয়ে গেছে শ' পঞ্চাশ বছর আগে। নির্জন চরের ওপর শশা, ঝিঙে—নানান সবজির মাচান। লতায় লতায় জায়গাটা জঙ্গল হয়ে আছে। আমি রিক্সায় বসে রইলাম। অমৃত দিব্যি দু'খানা মাচানের পাশ কাটিয়ে একটা টিবি মতন জায়গায় উঠে ডাকল আমায়, চলে আসুন—এখান থেকে ভগবানকে দেখার খুব সুবিধে—

আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে। চাষীরা সন্ধ্যেরাতে ঘুমোয়। এবার জেগে উঠে পাহারা দিতে এসে আমাদের এ-জায়গায় পেলে আচ্ছা ঠ্যাঙান ঠ্যাঙাবে। তবু অমৃতর ডাকাডাকিতে যেতে হল। চোরের উপদ্রব বলে সবজিচাষীরা কাঁটাসুদ্ধ বাবলা ডাল ছড়িয়ে রেখেছে। অনেক কষ্টে সে সব পার হয়ে টিবিতে উঠলাম। এখন ফিরে চল অমৃত। আর বলতে পারলাম না—আমার গিন্নি রাতে আমার সঙ্গে খেতে বসেন। ঢুলু ঢুলু চোখে আমরা দু'জনে লুচি দিয়ে ক্ষীর মুড়ি খাই। রাতে ঝোল ঝাল ইদানীং আর সয় না। তাই মাছভাজা থাকে। তিনি এতক্ষণ নিশ্চয় বসে আছেন।

এখানে আসুন না। দেখবেন একটা জিনিস।

কোথায় কি! দু'ধারে দু'সারি বড় বড় তালগাছ—তার ভেতর দিয়ে পাতলা মেঘ মাখানো একফালি অপুষ্ট চাঁদ উঠেছে।

দেখেছেন?

কি দেখব?

বুঝলেন না!

কি বুঝবো? পায়ে ততক্ষণে লাল পিঁপড়ে উঠে কামড়াতে শুরু করেছে। হাত দিয়ে পিঁপড়ে ডলে ডলে মারছি আর ভাবছি, কোথায় কি! ফাঁকা মাঠে চাঁদ দেখাচ্ছে শুধু। এ তো বাজারে বসেই দেখা যেত। কিন্তু ওর মুখ দেখে মনে হয়, ও সত্যিই কিছু দেখার জিনিস পেয়েছে। হবেও বা। আমার পাপ মন বলেই কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সারাদিন আলু পটল ঝিঙে উচ্ছে করে বেড়াই তো। যাক গিয়ে। ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে বুড়োবুড়ি কাশী যাব—এ তো ঠিক করাই আছে। তখন সকাল সন্ধ্যে গঙ্গা চান করে

সব পাপ ধুয়ে ফেলব। অমৃতর এখনকার সব পুণ্য আমি তখন এক একদিনে কিনব। মায়ের নামে নীলমণি কর বিদ্যালয়ে একটা বারান্দা করে দিয়েছি গত সনে। চুন-সুরকির গাঁথুনি। ভেতরে মাটি। ওপরে এক পটি ইঁট আজি মেরে দিয়েছি।

চাঁদের চারদিকে একটা নীল লাইন দেখছেন ?

জিনিসটা আমি জানতাম। আমার গিন্নি শিখিয়েছে আমায়। ওর নাম চন্দ্রসভা। লাইনটা চাঁদের যত কাছাকাছি হবে ততই বৃষ্টির দিন নাকি এগিয়ে আসে। বৃষ্টি হওয়া খুব দরকার। মাঠের পর মাঠ জ্বলে যাচ্ছে।

ওটা হল গিয়ে ভগবানের দুঃখ। সারা জগতের জন্যে তার গা দিয়ে কেমন মায়া মমতা জমা হয়েছে দেখুন।

কচু ! আর ক'দিন পরেই বৃষ্টি হবে ভাই। অমৃত এবার ফিরে চল বাবা। রাত বাড়ছে। ফিরতি পথে ছেনতাই হতে পারে। আমার হাতে ঘড়ি রয়েছে—

চাইলে দিয়ে দেবেন। আপনার তো আটকাবে না। আবার হবে।

মনে মনে বললাম, কি অলক্ষ্ণে লোক রে বাবা ! আমি একা একা রিক্সায় এসে বসলাম। ও আরও খানিকক্ষণ ভগবান দেখে তবে ফিরে এল।

হাঁরে তোর ভগবান দেখতে কেমন ?

খুব ফরসা। গায়ে খুব সোন্দর গন্ধ।

ফেরার পথে ভগবান বাতাস না দেওয়ায় বেশ বেগ পেতে হল অমৃতর। রাস্তা তো কম নয়। বাড়ির সামনে নেমে ওকে তিনটে টাকা দিতে গেলাম। জিভ কেটে রিক্সার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে নিল। আপনি সঙ্গে না থাকলে দেখাই হত না।

ক'দিনের ভেতর পটলের দর যে এত লাফাবে জানতাম না। কেজি আশি পয়সা থেকে এক লাফে তিন টাকা। সামান্য বৃষ্টিতে নিচু জমির পটল নষ্ট হয়ে গেল। ডাঙ্গা জমির পটল তখনো পুষ্ট হয়নি। ভাঙলে ভেতরটা খোকাখুকুর বার্লির রঙ এখনো কাটিয়ে ওঠে নি। তাই দূর দূর গাঁয়ে পুষ্ট পটলের খোঁজে ছুটে বেড়াচ্ছি। বড় একটা অর্ডার ছিল।

সেই সময় একদিন বিকেলে অমৃত এল। মুখখানা শুকনো। আকাশ জুড়ে গাঢ় মেঘ থাকায় ওর ক'দিন ভগবান দেখা হয়নি। বাস স্ট্রাইক বলে

আমারও আজ বেরোনো হয়নি। মন-মেজাজ ভাল ছিল না। এমন সময় গোলায় ঢুকে বেচারা প্রথমেই আমার ধমক খেল।

খাটের নিচে বসে হাজরা নস্করর থাবা দিয়ে দিয়ে আরশোলা ধরছিল তখন। আলুর বস্তা, পটলের ডাঁই, ঝিঙের ডালা—গোলার ভেতর অন্ধকারে যেখানে যত আরসোলা ছিল—সব তাড়িয়ে হাজরা খাটের নিচে এনেছে। থাবা দিয়ে ধরছে আর পলিথিনের ব্যাগে পুরছে। মাঝরাতে বঁড়শিতে এই আরশোলার টোপ গেঁথে ব্যাঙের গর্তের মুখে ধরবে। আর অমনি ব্যাঙ লাফিয়ে এসে টোপ গিলবে। তখন কপাৎ করে ব্যাঙটা ধরে কোমরে ঝোলানো মাটির কলসির ভেতর পুরবে। সকালে আড়তে সাপ্লাই দেবে চার টাকা কেজি। এই করে এখানকার অনেকে এখন সংসার চালাচ্ছে। ভাল কল বেরিয়েছে। বাজারে লোকে বলাবলি করে, ব্যাঙের কি ভাগ্য। চন্দনেশ্বরের ব্যাঙ এরোপ্লেনে উঠে বিলেত আমেরিকা যাচ্ছে। সাহেব-মেমেদের ভাতের পাতে ওদের বড় আদর।

অনেক ধানাই পানাই করে অমৃত বলল, এটা কি ঠিক হচ্ছে বাবু? এই যে ব্যাঙগুলো খুন হচ্ছে—আর আপনার গোলা থেকে টোপের আরশোলা যাচ্ছে—

খাটের নিচু থেকে ঝুলকালি মাখা হাজরা মারমুর্তি হয়ে বেরিয়ে এল। হাত-দাখানা উঁচিয়ে বলল, ভগবানের ব্যাটা, আরেকটা কথা বললে তোমায় কোপাবো। দেশসুদ্ধ অ্যাতগুলো পেট তুমি খাওয়াতে?

মাঝখানে পড়ে দু'জনকে আলাদা করে দিলাম। হাজরাকে বললাম, তোমার কাজ তুমি কর গিয়ে। মনে মনে আমি খুশি। ব্যাটাচ্ছেলের ভগবানবাজি কিছু থামবে এখন। আর হাজরাও নি-খরচায় আমার গোলা আরশোলা-শূন্য করে দিচ্ছে। লোক দিয়ে করাতে গেলে নিদেন দু'টো লোকের মজুরি যেত।

হাজরা খাটের নিচে ঢুকে যেতেই অমৃতর মুখ আবার প্রসন্ন হয়ে উঠল।

আপনি সেদিনকার আগে কখনো ভগবান দেখেছেন?

কি আর বলব! সেদিনও আমি ভগবান দেখিনি। তার আগেও কোনদিন দেখিনি।

ভগবানের কথা কখনো ভেবেছেন মন দিয়ে?

এরও জবাব দেওয়া যায় না। ভগবানের কথা ছোট বয়স থেকে মাঝে মাঝে অবশ্য ভেবে এসেছি। মনে আছে স্কুলে যাবার পথে আচমকা পেট ধরে বেগ এলে ভগবানের নাম করেছি। বললাম, কিন্তু অমৃত তুমি সে রাতে ওখানে ভগবান দেখলে কোথায়?

কেন? সবটা জায়গা জুড়েই। গদগদ হয়ে বলল, অমন আলো। অমন ছায়া।

আমি আর থাকতে পারলাম না। প্রায় ভেঙিয়ে উঠলাম, অমন তাল-গাছের সারি—

ও ভাবল, আমি বুঝি ওর সাপোর্টার। তাই আদৌ সন্দেহ না করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলল, তার ভেতর দিয়ে—

এমন তদ্গত লোককে বেশিক্ষণ ভেঙানোও যায় না। আমিই মানে মানে মনের ভেতরে রণেভঙ্গ দিলাম। বিকেল বেলা। পথ দিয়ে খড়ের তড়পা বোঝাই গোগাড়ি যাচ্ছে। সত্যিই তো, আমি কি কোনদিন ভগবানের কথা ভেবেছি? ভগবান নিশ্চয় কোন উঁচু চেয়ারে বসেন। অসময়ে অজায়গায় বেগ এলে তাঁকে যেমন ডেকেছি, বেগ চলে গেলে বেমালুম ভুলে গেছি। এজন্যে তিনি কি রাগ করে আছেন? সে-জন্যেই কি পটলের ফড়েদের সঙ্গে আজ আমি গোলদার হয়েও হেরে যাচ্ছি?

স্কুলে থাকতে অঙ্ক পরীক্ষার দিন তাঁকে ডেকেছি। সিম্প্লিফিকেশন আর ইউনিটারি মেথডের অঙ্ক দুটো বাইরে থেকে সাপ্লাই আসার পর তাঁকে ভুলে গেছি। রেজাল্ট বেরোবার আগে কতবার ভেবেছি—আমি কি ম্যাথেমেটিকসে তিরিশ পাব না ভগবান? হাতে তিন টুকরো ইট নিয়ে সামনের লাইট পোস্টে ছুড়তে গিয়ে ভেবেছি—প্রথম টুকরোটা যদি পোস্টটার গায়ে লাগে তাহলে আমি পাস। যখন একটাও লাগল না—তখন মনে মনে বলেছি, নিশ্চয় পাস করব। ভগবান আছেন না!

এখান থেকে মাচানতলার রাস্তা তা আট মাইল হবে। উত্তরদিকে তেমন কোন বড় জায়গা নেই বলে সবাই বলে চন্দনেশ্বরের মাচানতলা। এ তল্লাটে সবচেয়ে ভাল পটলের জমি ওদিকটায়। আজ বাস স্ট্রাইক বলে কোন ফড়ে বা ব্যাপারী মাচানতলার মাঠে পৌঁছতে পারবে না। বললাম, এক জায়গায় যাবে অমৃত?

কোন্‌দিকে?

ভগবানের খোঁজ সবদিকেই করতে হয়—এ কথাটা মানো তো ?

নিশ্চয়ই। তিনি তো সব জায়গায়।

তাহলে তুমি পঞ্চাননতলায় গিয়ে নিশি, পালান ওদের সঙ্গে বসে ঠাকুরের থানে নাম-গান করনা কেন ?

আমার গানের গলা নেই বাবু। তাছাড়া অমন হাউ-মাউ করে পাড়া জাগিয়ে রেখে ভগবান ভগবান করা আমার ঠিক পোষায় না বাবু। আমি মেলাতে পারি না ওদের সঙ্গে। আপনি কোন্‌দিকির কথা বলছিলেন ?

যাবে ? উত্তুর। ফাঁকা চর জায়গা। ভুঁইয়ে ডাঙ্গা জমিতে অঢেল পটল। তার ওপর যতদূর তাকাবে মাচান তুলে দিয়ে দিয়ে চাষীরা শশা করছে, ঝিঙে করছে, লাউ করছে—এ রকম প্রায় সারা বছরই চলে। জায়গাটায় গেলে চোখ জুড়োয়।

খুব নির্জন ?

ভীষণ। দূরে দূরে চাষীরা খোন্তা দিয়ে নিড়েন দিচ্ছে। কোপ দিচ্ছে। ঘাস আগাছা তুলছে। অনেক পেছন দিয়ে কোমপানি আমলের উঁচু বাঁধ চলে গেছে।

এখন যাবেন ?

রাত হয়ে যাবে যেতে যেতে। কাল খুব ভোরে রিকশা নিয়ে আয়। রাত থাকতে বেরোবো।

বেশ।

কিন্তু—

আমি চুপ করে আছি দেখে বলল, কি বাবু ?

না তেমন কিছু না। কিন্তু অমৃত, তোর তো ব্যবসা নষ্ট হবে। সকালের প্যাসেঞ্জার সব হারাবি। আমিও যাতায়াত ষোল মাইল একটা পয়সা দিতে পারব না। ভগবান দেখিয়ে বেড়ানো তো আমার কারবার নয়।

আপনি দেবেন কেন। কাজের ক্ষেতি করে যাচ্ছেন এই তো যথেষ্ট। আমার পয়সার কথা ভাববেন না। ফিরে এসে বিকেলে গাড়ি বের করলেই পয়সা হয়ে বেশি হয়ে যাবে—

তোর টাকাকড়ি রাখিস কোথায় ?

সেই তো এক মুশকিল হয়ে গেছে। কিছু খুচরো আর নোট পাহারা দিতে গিয়ে মনটা খিচড়ে যায় বাবু। আমার তো বিশেষ কোন খরচা নেই।

তাই বেশ জমে গেছে এ ক' মাসে। দু'তিনশো টাকা তো হামেশা হাতে থাকে।

আমার কাছে রেখে যাবি। দরকার মত নিবি।

খুব ভাল হয় বাবু। তাহলে মনটা সরল রাখতে পারি।

আমারও একটা সুবিধা ছিল। গোলায় পয়সা বিশেষ রাখি না। কাজের লোকেদের হাতটান আছে। বাড়িতে নোটের তাড়া রেখে দেখেছি—গিন্নির খুব সুবিধে হয়। খরচ করে দিয়ে বলে, তুমি আমার কোন্ শখটা রেখেছো? এর পর কিছু বলা যায়! ব্যাংকবাড়িটা হয়ে আমাদের মত লোকের খুব সুবিধে হয়েছে। এলোমেলো খরচার ভয় নেই। আমার আসলে নিজের টাকা ভাঙাতে বড় গায়ে লাগে। অমৃত যদি রেখে যায়—তাহলে রোজকার কারবারে টাকাটা ঘুরবে।

তাহলে কাল সকালেই নিয়ে আসিস। মাচানতলা যাওয়ার আগে বাড়িতে রেখে যাব।

কলকাতার ফার্স্ট লোকাল তখনো আসেনি। আকাশে চাঁদ থাকতে থাকতে প্রায় শতিনেক টাকা গুণে গেঁথে ধুতিতে বেঁধে নিলাম। তারপর রিকশায় বসে বললাম, নে এখন চালা অমৃত। দেখি কত জোরে তোর গাড়ি যায়।

এখন বাবু, ভগবান বাতাস দেবেন। পাখির মত উড়ে যাব।

ভগবানের নিকুচি করেছে। কিন্তু এ সব কথা তো জোরে বলা যায় না। যাতায়াত ষোল মাইল বিনে ভাড়ায় ওরই রিকশায় যাব। ওরই টাকায় দরকার হলে চাষীদের পটল বাবদে আগাম দেব। ভোর রাতে ঠাণ্ডা বাতাস ভালই লাগছিল।

আকাশ ফরসা হওয়ার মুখে মুখে চন্দনেশ্বরের মাচানতলায় গিয়ে হাজির হলাম। এত ভোরে এদিকে কখনো আসি নি। রিকশা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

পিচ রাস্তা থেকে গাছপালার আড়াল দিয়ে বাঁক নিয়ে মাটির রাস্তায় পড়েই খানিক এগিয়ে এই মাচানতলা।

চর জায়গা। বেলে মাটি হবে। ছ'সাত মাইল জুড়ে ভুঁইয়ের ওপর পটল চাষ। পাতায় পটলে মিশে আছে। এক এক কিতা চাষ আর তার

পাশ দিয়ে শশা, ঝিঙের মাচান—সবুজ সবুজ—উঁচু নিচু—যত দূর চোখ যায়। পাশেই কাছাকাছি চাষীদের গাঁয়ের আভাস। ভোর হতেই ছাগল, গরু বেরিয়ে পড়েছে। অমৃত এক কোণে দাঁড়িয়ে ঘেমে যাওয়া শরীরে বাতাস লাগাচ্ছিল। এতটা পথ একটানা প্রায় না থেমেই চলে এসেছে। গা জুড়োচ্ছিল ও। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দু'জনের চোখ জুড়িয়ে আসছিল। দূরে কোমপানি বাঁধের মাটি পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠে গেছে।

এত পটল আমি গোলায় নিয়ে তুলব কি করে? চাষীরা এরই ভেতর সব দূরে দূরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে ক্ষেতে নেমেছে।

এখানেই ভগবান থাকেন?

হ্যাঁ। ওই মাচানে—

ক্যাবলাকার্তিক অমৃত তদ্দণ্ডে মাচানতলার দিকে এগিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একজন চাষী ধামা হাতে হা হা করে ছুটে এল। পটল তুলছিল। অমৃতকে আটকালো। হাত-পা ধোয়া? জল সরেছো?

পটল ক্ষেতে তো এমনি ঢোকা যায় না। চাষীরাও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ক্ষেতে নামে। বাধা পেয়ে অমৃতর বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। তবে কি এই মাঠটাই একটা আস্ত মন্দির? কোমপানি বাঁধের ঠিক ওপরে এক চাকা মেঘ গরুগম্ভীর হয়ে জমে আছে। মাচানের ওপর লতানো সুঁড়গুলো সামান্য বাতাসে লক লক করে উঠছিল। আমি হাত-পা ধুয়ে আসছি। অমৃত এক ছুটে পাশের ডোবায় নেমে গেল।

এখানকার চাষীরা সাধারণত কিছু গম্ভীর। এ আমি আগেই জানতাম। ওদের কোন তাড়াহুড়ো নেই। বললাম, মণ কত করে?

চল্লিশ টাকা করে দেবেন।

আমার সারা শরীর নেচে উঠল। এরা কি বাজারের খবর জানে না? না, এদিকে এখনো ফড়ে এসে পৌঁছয় নি? তা কি করে সম্ভব? চন্দনেশ্বরের পাইকারি দরই তো এখন এর দ্বিগুণ। কোলে মারকেটে না জানি কি অবস্থা। যতদূর চোখ যায়—শুধু পটল। নিজের গোলায় এত পটলের জায়গা হওয়া সম্ভব নয়। একটা উপায় আছে। আগাম দিয়ে দিয়ে সব পটল দরবন্দী করে আটকাও। তারপর এখান থেকেই লরি বোঝাই দিয়ে শেয়ালদা বাজারে। কিন্তু তাতে অনেক লোকজন চাই। অনেক টাকা চাই।

তাহলে কিছু কিছু আগাম রাখ সবাই।

চাষী ঘুরে দাঁড়াল। মাচানতলায় আমরা কেউ আগাম রাখি না বাবু। যেমন যেমন মাল নেবেন—তেমন তেমন দাম দেবেন। জানতাম। বড় শক্ত জায়গা। এরা ধীরে সুস্থে কথা বলে। এদের গরু-ছাগলের চেহারা অব্দি ধীর স্থির—পরিপূর্ণ। অবশ্য কারণ একটাই। এখানকার মাটি বাছাই সবজি—পটলে ছয়লাপ করে দিচ্ছে বছরের পর বছর।

এখানকার মাটি, বাবু, আমাদের কোনবার ফেরায় নি। তিনি নিঝি এখানে থাকেন—

অর্থাৎ লক্ষ্মী থাকেন। আমার পাশে যে অমৃত কখন হাত-পা ধুয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝি নি।

কোনদিকি ?

চাষী অমৃতকে হাত ঘুবিয়ে সবটা দেখালো। কোনদিকি নয় ? সবটা তুমি নিঝি ঘুরে ঘুরে দেখ। হলুদ ফুল। সবুজ লতা। শশার মাচানে সাদায় সবুজে লাইন টানা জালি পড়েছে। তার ভেতর দিয়ে এক এক কিতা পটল চাষের দীর্ঘ টানা লাইন—সেই একেবারে কোমপানি বাঁধের গা অবধি চলে গেছে। সেখানে গিয়ে দৃষ্টি হারিয়ে যায়। তার ভেতর দিয়ে ভেতর দিয়ে অমৃত এগোচ্ছিল। এক-এক মাচানের সামনে দাঁড়ায় আর সম্ভ্রমে চোখ নেমে আসে ওর। কী সবুজ। কী শান্ত। ফুলে ফুলে রেণু কুড়োচ্ছে কিছু অক্লান্ত ফড়িং। সঙ্গে আছে একপাল নাম না-জানা পোকা। কচি ডগাগুলো ফিনফিনে বাতাসে হিল হিল করে কাঁপছে।

এদিকে রিকশাখানা মাটির রাস্তায় দাঁড়ানো। পেছনে কোন মালিকের নাম লেখা নেই। আমি কোমরে টাকা গুঁজে দাঁড়িয়ে। ওদিকে অমৃত দাশ এক এক কিতা পটল ক্ষেত পার হয়—আর একজন দু'জন করে চাষী তার সঙ্গ নেয়। মাচানতলার শিশির তখনো শুকোয় নি। অমৃতের দলটা আস্তে আস্তে ভারি হচ্ছে। তাতে কচি মাথা, কাঁচা মাথা, পাকা মাথা—সব এসে ভিড়ছে। সারা মাঠের মানুষজন কুড়িয়ে নিয়ে ও এগোচ্ছিল। আর ভোরবেলাতেই মাচানতলায় নেমে আসা কুচো পাখির ঝাঁক ওরা কাছাকাছি যেতেই ছররার ধারায় আকাশে ছড়িয়ে পড়ছিল। খানিক উড়েই আবার এক জোটে মাচান বদলে বদলে নেমে পড়ছিল ঝাঁক ধরে।

অমৃত দেখল এখানে ভগবানের কোন শেষ নেই। যতই এগোয় ততই

বেড়ে যায়। মনটা কিসে ভরে যাচ্ছে। মাচানে মাচানে কোমপানি বাঁধ অবধি ছেয়ে আছে। বাতাসে কিসের সুবাস। চাষীরাও এমন সমঝদার পায় নি কোনদিন। ফলন, গাছের বাড়, পুষ্ট ফল—যা কিনা ওদের কাছে আগাগোড়াই ঈশ্বরের আশীর্বাদ—অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান—তাই খুব মন দিয়ে অমৃতকে ওরা দেখাচ্ছিল। চষা মাটির ওপর দিয়ে ভারি দলটা নিয়ে এগোতে এগোতে অনেকগুলো মাথার ওপর দিয়ে অমৃত একবার ফিরে তাকাল। পেছনেও সেই একই ছবি। হলুদ ফুল। গুঁড়ো গুঁড়ো পরাগ মাখানো কেশরগুলি ফুলের লাল জন্মভূমি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভোরের বাতাসে দুলছে। মাচানের পর মাচান ফেলে এসেছে অমৃত। তার শেষে রিকশাখানা কত ছোট দেখাচ্ছে। সিটে সাদাপানা একটা মানুষ বসে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছে। এখান থেকে কুচো পাখির চেয়েও ছোট দেখাচ্ছে শ্যামলবাবুকে। মানুষটা বড় ভাল। তার জন্যেই ওর আজ এখানে আসা হল।

পরী

ওঁ

৪০০১ টাকা পুরস্কার

বাংলার মধ্যে কিম্বা যে-কোন স্থানে বেয়ালা বাজনায়, স্বরগ্রাম সহ গান ও লহরি যথা: ১। বেহাগ, ২। কারপা, ৩। আসাবরি, ৪। দরবারি, কালেংড়া, ৫। কারপা, ৬। পূরবি, ৭। জয়স্তি, ৮। ভান কীর্তন, ৯। ভৈরবী ও ১০। ভৈরব।

১নং দাঁড়ায়ে বাজান
২নং বসে বাজান
৩নং শুয়ে বাজান
৪নং চক্ষু ২টি বেঁধে বাজান
৫নং লহরি ১০ মিনিট
৬নং

Vill & P.O. Dadarat
Dt. 24 Pargs. W.B.
2/4/67

যিনি এই কয়েকটি রাগিণী তানে ও মানে সমভাবে বাজাতে পারবেন তাহাকে ৪০০১ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পরাজিত হলে আমাকে উক্ত টাকা দিতে হবে।

ঠিকানা—
শ্রীবিপিনবিহারী বিশ্বাস
(রায়বাহাদুর)
M.A. Honours in English
Calcutta University.

ওই তারিখে বারুইপুর স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে বসে আছি। লক্ষ্মীকান্তপুরের ট্রেন ধরব। খয়েরি পাঞ্জাবী গায়ে এক বুড়ো ঘরে ঢুকলো। বগলে বেহালার বাক্স। পায়ে তাপ্পিমারা পাম্প-সু, পরনে খেটে ধুতি। গালে পাকা দাড়ি, সাদা ভ্রূ। লোকটা বসেই বেহালায় ছড় ঘষতে লাগল।

ফাঁকা দুপুরে বাইরের খোলা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দু'জন চাষী অনাসৃষ্টি খরার কথাবার্তা বলছিল। বাজনা শুনে তারাও এগিয়ে এল। খুব সম্ভব কনসার্ট পার্টির কোন খুব পরিচিত গৎ। শুনতে ভালই লাগছিল।

বাজিয়ে বাক্স বন্ধ করে লোকটি আমার কাছে একটি টাকা চাইল। দিলাম। তখন খুশি হয়ে পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে আমার হাতে দিল। খুলে দেখলাম তাতে ওসব লেখা রয়েছে।

কাগজখানার উল্টো দিকে লেখা রয়েছে—To the Hon'ble First Munseef of Baruipur, Sir, I wish to interview 2 minutes only kindly allow me, your valuable time west me. Excuse me for your trouble.

Your most Obedient Servant truly, polite, believe sympathy. Sree Bepin Behary Biswas. (Rai Bahadur) M. A. Honours in English, Calcutta University. Vill. P.O. Dadarat. Biswaspara, D/24 Pargs. West Bengal.

পড়ে এই ক'টি জিনিস মনে হল :—

লোকটি ইংরিজিতে অনার্সকে খুব সমীহ করে মনে মনে। উপরন্তু রায়বাহাদুর হওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। তাছাড়া, সে চ্যালেঞ্জ ভালবাসে। এদিককার এমন কোন পাড়ায় থাকে—যেখানকার নাম বিপিনবাবুটির পূর্বপুরুষদের পরিচয়ে হয়ত পরিচিত। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তার স্বপ্নে একছত্র।

কিন্তু লোকটি এখন নিশ্চয় রিটায়ার্ড ও সংসারে বাতিল।

লোকটিকে পরের রবিবার আমার বাড়িতে অন্নগ্রহণ করতে বললাম। আরও বললাম, আপনার বাজনার হাতটি খুব ভাল।

খুব খুশি।

আমি একটি খালের পাড়ে থাকি। উপস্থিত অনেকে কম সময়ে বেশি ধানের লোভে খালধারে আই-আর-এইট ধান চাষ করেছে। তাই খাল শুখো। দুপুরের রোদে রবিবার পুড়ে যাচ্ছিল। সেই খালধার ধরে ধরে বিপিনবাবু এলেন। সঙ্গে বেহালার বাক্স।

আমি প্রায়ই এরকম লোক ধরে ধরে আনি বলে আমার স্ত্রী বিপিনবাবুকে খেতে দিতে রাজি হচ্ছিল না প্রথমে। কিন্তু খেতে বসবার পর দেখলাম,

বেশ এটা ওটা এগিয়ে দিল। খেয়ে উঠে বিপিন বিশ্বাস লম্বা একটা ঘুম দিল বসবার ঘরে। বিকেলে উঠে চায়ের কথা মনে করিয়ে দিল। তারপর বাক্স খুলে ছড় হাতে নিয়ে বেহালাটা জুৎ করে কাঁধে বসালো।

জানতাম না। সেদিন পূর্ণিমা ছিল।

আর কিছু হাওয়া ছিল। খুব জোর। আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যে হতে না হতেই হ্যারিকেন ধরানো হয়। চাঁদও উঠলো। কালো বাছুরটা পুকুরঘাটে দাঁড়ানো ওর মাকে খুব ঢুসোচ্ছে।

কাঁধে বেহালা সেট হয়ে গেছে। ছড় ঠেলে ঠেলে অনেক সুর ভেঙে ওপরে উঠছে আবার নীচে নেমে পড়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য খাদে দাঁড়াচ্ছে। ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো ফেলে এদিকেই কান খাড়া করে আছে।

এসব আমাদের বারান্দায় হচ্ছিল। বেহালার ঘ্যাঁ ঘোঁ্যা কারও বুক ভুবড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। বিপিনবাবুর মুখে ভাঙা পাটালির ধারা এক চিলতে জ্যোৎস্না পড়ে শাদা দাড়িতে জ্বতে ঝক ঝক করছে। কাঁটা বোঝাই বাবলা গাছগুলো এখন কেমন নির্দোষ বৃক্ষ হয়ে দাঁড়ানো। খালধারের শেকুল কাঁটার ঝোপে হলদে ফুলগুলো জ্যোৎস্নায় হারিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ছড় থামিয়ে বিপিনবাবু বলল, 'এই রাগিণী মাঘী পূর্ণিমায় সারারাত দিঘির পাড়ে বসে বাজাতে পারলে পরী নামানো যায়। একবার মিত্তিরদের কাছারিবাড়ির পুকুরে নামিয়েছিলাম। ওঁরা একখানা কম্বল দেয় শেষে।'

আমার ছেলেপিলের মা এতক্ষণ অবিশ্বাস করতে করতে তন্ময় হয়ে পড়েছিল বাজনা শুনে। পরীর কথায় ঠোঁট ওলটালো। নাও নাও এখন বিদেয় কর—এই ভাব নিয়ে উঠে গেল।

আমি বললাম, 'কম্বল কেন ?'

'মাঘী পুর্ণিমের রাত। ঠাণ্ডা হবে না ? আমার অবিশ্যি তখন জোয়ান বয়স। শীতবোধ বিশেষ ছিল না। তবে কিনা—একে মেয়েছেলে, তায় পরী। শীত তো লাগবেই। ওঁদের তো বিশেষ জামা কাপড় পরতে নেই।'

আমার জন্যে তালশাঁস, ডাবের জল ঢাকা দেওয়া ছিল। ঘরের থেকে এনে নিজেই বিপিনবাবুকে দিলাম। ব্রেনওয়ারক হচ্ছে ওঁর।

'উত্তর আকাশ থেকে নেমেছিল। রাত দু'টো নাগাদ। ঘাটলায় এসে

পাখা গুটিয়ে বসে আমার বাজনা শুনছিল একমনে। সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলাম, পাছে উড়ে যায়।' তালশাঁস খেতে কিছু সময় গেল। 'মিত্তিরদের জেঠিমা যেমন হাসিখুশি তেমনি সাহসী ছিলেন। শরীরে দয়ামায়াও ছিল। তিনিই হৃষিকেশ থেকে আনানো পাহাড়ি ভেড়ার লোমের কম্বলটা শেষরাতে দোতলা থেকে ঘাটলায় ছুড়ে দিলেন।'

'পরী উড়ে গেল না?'

'বড় ভাল ছিল মেয়েটি। শীত লেগেছিল। দৈববাণীর মত আকাশ থেকে কম্বল পেয়েই গায়ে জড়িয়ে ফেলল। তারপর আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। আমার ভেতরটা সেই ক' সেকেণ্ডের জন্য—কি বলব গাঙ্গুলী মশাই, ধক করে উঠল। পরিষ্কার বাংলায় বলল—'আরেকখানা বাজাও।'

'বাংলায়?'

বিপিনবাবু একটু থমকে গেল, তারপর বেহালাটা কাঁধে তুলে নিল, খানিকক্ষণ ছড় ঘষাঘষি করে একটা খুব ভারি রাগের মধ্যে ছড়সুদ্ধ হাত মাথা ডুবিয়ে দিল, 'এই রাগটা বাজিয়ে ছিলাম।'

ছড়ের এক-এক টানে হাওয়াসুদ্ধ নদীর জল উঠে আসছিল এক একবার। আবার ভাঁটাও হচ্ছিল। খাল পাড়ের ওধারে দূর দিয়ে কলকাতার গাড়ি গেল আলো জ্বালিয়ে—লোকজন নিয়ে—আবার কয়েক গাড়ি লোক ফিরেও এল।

ছেলেমেয়েরা খেতে বসেছে। ওদের মা ভাত মেখে দিচ্ছে। হ্যারিকেনটা হাওয়ার জ্বালায় দেওয়ালের পাশে সরিয়ে দিল।

এক সময় বললাম, 'পরী নেমে আসবে না তো?'

বাজনা না থামিয়েই বিপিনবাবু বললেন, 'নামতেও পারে।'

আমার অবিশ্বাস এতই বেশি—প্রায় হো হো করে হেসে উঠছিলাম। পরী নামার অবস্থাই বটে। মডিফায়েড রেশনে আমাদের এই স্টেশনপাড়ায় চাল গম কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না ক'সপ্তাহ। ডিলার গরুর গাড়িতে মাল পাঠিয়েছিল। বাদার মধ্যে দিয়ে পিচ রাস্তা ধরে তিন গাড়ি গম আসছিল। লুট হয়ে গেছে।

বিয়ের বরযাত্রী থেকে স্টেশনমাস্টার, পোস্টমাস্টার, হেডমাস্টার—সবাই চাল নিয়ে আলোচনা করে। স্মাগলারদের দাপটে ট্রেন রোজ লেট হচ্ছে। রাত হলে অন্ধকারে বসে বসে কত পরিবারের কর্তা হাওয়া খায়—বড় বড়

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

আলাপ রীতিমত জমে উঠেছে। এমন সময় বড় ছেলেটা এঁটো হাতে উঠে এসে আমার সামনেই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। ইশারায় থামতে বলে এগিয়ে গেলাম।

ব্যাপার সামান্য। ও এবেলা ওবেলা দু'টো বেশি করে পাষ্টি ভাত খেয়ে থাকে। আরও খাওয়ার ইচ্ছে ছিল। ওর মা তুলে দিয়েছে মাঝখান থেকে। বলেছে, সবাই খাবে তো।

বিপিনবাবুর বেহালায় আলাপ জমে উঠেছিল।

চাষ উঠলে বছরকার ধান কেনা থাকে ফি'বার। এবারই হয় নি। ট্রেনে, বাজারে যত পুলিস বাড়ছে, ফ্রন্ট সরকারের ফতোয়া যত লম্বা হচ্ছে—চালের দামও তত চড়ছে। ফি'রাতে ডাকাতি হয়। থানা এখান থেকে পাঁচ মাইল। খবর দিয়েও কোন লাভ হয় না।

বিপিনবাবু পরী নামানোর জন্যে বেহালাটা খুব জোরে কাঁধে চেপে ধরেছে। আমাদের বাগানের বেলফুল গন্ধ ছড়াচ্ছিল বাতাসে। চাঁদ সারা পাড়া জুড়ে টর্চ ফেলেছে। এ-বাড়ি সে-বাড়ির রেডিওগুলো জুড়িয়ে এল। শুধু স্টেশনের ধারের একটা দোকান—সারা বছরই ওদের হালখাতা থাকে।—মাইক বাজিয়ে দানাদার খাওয়ায়। বেয়াড়া খদ্দেরদের বাকি টাকা তোলে। সেদিক থেকেই ভেসে আসছিল—'আলেয়া। আলেয়া!! জীবনে নারী পেয়েছি অনেক—'

পরী নামাতে না পেরে পরাজিত হলে বিপিন কি আমাকে ৪০০১ টাকা পুরস্কার দেবে? ছেলেটা বাইরের খাটে শুয়ে বাজনা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হয়তো খানিক বাদেই সবাই ঘুমিয়ে পড়লে পরী নেমে এসে আমাদের ওই বাগানে বেলফুলের সারির মাঝে পাখনা গুটিয়ে দাঁড়াবে। তারপর বলবে—

Hon'ble Mr. Biswas, Sir, I wish to interview 2 minutes only kindly allow me, your valuable time west me.

প্রথম আলাপের সেই চিরকুটখানা আমার টেবিলের ড্রয়ার খুললেই রোজ চোখে পড়ে।

কিন্তু সে সব কিছুই ঘটল না।

বিপিনবাবু বাজাতে বাজাতে শুয়ে পড়েছেন প্রায়। নারকেল পাতাগুলো জ্যোৎস্না ছিঁড়ে ছিঁড়ে দুলছে। পৃথিবীতে এখন কোনো অশান্তি নেই। অথচ জানি এই আধা শহর আধা গাঁয়ের প্রতিটি বাড়ির দেওয়ালে নানা অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায্য অন্যায্য দাবি লেখা পোস্টার মেরেছে ছেলেরা। সব বদলে যাচ্ছে। মাটি, গাছপালা, খাল, আকাশ —এরাই শুধু পাল্টায় নি। এর মাঝখানে আমরা পরী নামাচ্ছিলাম। আমার বয়স চল্লিশ। বিপিনবাবুর তা সত্তর হবে। লোকটা চিট হতে পাবে—ক্র্যাক্ হতে পারে। জেনুইন কিনা কে জানে!

খড়ি-ওড়া শুকনো চামড়ার বিপিনবাবু দিবানিদ্রার পব খুব জম্পেশ করে বাজাচ্ছিল। এ সব বাজনা কতকাল শুনি নি। তাল, লয়, রাগ—কিছুই জানি না। তবু বেশ লাগছিল। শুধু আমাকে শোনাতেই একজন বাজনদাব প্রাণপাত করে যাচ্ছে—অথচ আমি সভাসদ, পাত্রমিত্র, পাইক-ববকন্দাজ সাজিয়ে রাজা হয়ে বসে নেই। সামান্য শ্যামল গাঙ্গুলী।

বড ছেলেটা বাইরের রোয়াকেই ঘুমিয়ে গেল। নয় পেরিয়ে দশে পড়েছে। ভাতটা খেতে বড় ভালবাসে। সবচেয়ে সস্তাব জিনিস এমন আক্রা হয়ে যাবে একদিন কে জানত।

ছেলেমেয়েদের মা এখন সারা দিন পরে ফ্রি হয়েছে। মেয়েটাও এতক্ষণে ঘুমে হাল্‌'ট হয়ে গেল। অন্ধকার বারান্দায় আমি আর বিপিন বিশ্বাস। ভেতরের ঘবে আলোর সামনে গিন্নি দাঁড়ানো। তাই ওব মুখ-চোখ দেখা যাচ্ছে না। ঘোমটাব শাড়িব চারধারে আলোর আউটলাইন। একবার মনে হল আমায় ডাকছে। উঠতে যাব। বিপিনবাবু ছড় ঘষতে ঘষতে আমাকে খুঁচিয়ে দিল। ওঁর দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে বিপিন বিশ্বাস চোখ দিয়ে ইশারায় আকাশে তাকাতে বলল। এনি মোমেণ্টে পরী নেমে পড়তে পারে। সেই সময় কি আসন্ন? নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল আমার।

আলোর আউটলাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বউ যেন কি বলতে চাইল একবার। হাত নেড়েও যে থামিয়ে দেব সে সময় এখন নয়। এখন পরী নামে।

খট করে বিপিনের বাজনা থেমে গেল। আমি আর আকাশে তাকাতে পারছি না। যদি নামেই—আমি নির্ঘাৎ সেন্সলেস হয়ে পড়ে যাব। বিপিন বাগানের দিকে নেমে যেতে যেতে বলল, 'জল সরে আসছি। কখন থেকে

একঠায় বসে বাজাচ্ছি।' তাই বল! এমনভাবে আচমকা বাগানে নেমে গেল—যেন পরী নেমেছে। হাত ধরে বারান্দায় তুলে আনবে এক্ষুণি।

ছেলেমেয়েদের মা ঝড়ের বেগে ঢুকেই ঘুমন্ত ছেলেটাকে এক হ্যাচকায় কোলে তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে, কোন কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে! ক'পালি চাল আছে ঘরে শুনি? রোজ রোজ লোক ধরে আনা চাই—

ছেলে কোলেই শোয়াতে চলে গেল। যাবার সময় ওর পায়ের ধাক্কায় বেহালার বাক্সটা হাটকে খুলে গেল।

বিপিন বিশ্বাস ফিরে আসার আগে জায়গার জিনিস জায়গায় রাখা দরকার। বন্ধ করতে পারি না। কিসে আটকে গেছে। আলোতে নিয়ে দেখি, বাক্সটা নানান জিনিসে বোঝাই। তিনখানা নিমের দাঁতন। তেলচিটে গামছাও আছে একখানা। একেবারে বিপিনের সংসার। রঙচটা নীল লুঙিটাও কাগজে মুড়ে গুঁজে রেখেছে। তাড়াতাড়ি জায়গার জিনিস জায়গায় রেখে দিলাম।

বারান্দায় উঠেই এক সেকেণ্ডে বিপিন বাজনার ছেড়ে আসা জায়গায় ফিরে গেল, 'ঠিক এমনি চাঁদের আলো ছিল সে-রাতে—'

আর কথা নয়। আমার পরিচিত বউ এখনো প্রায় তরুণী। অল্প দিন হল ভ্রূ কুঁচকে কথা বলার সময় ওর নাকের পাশ দিয়ে দু-ধারে ভাঁজ পড়ে। যা দিনকাল। এ সব দেখার সময় পাই—দেখে ভাবার সময়ও পাই—কেননা ব্যাঙ্কে আমার পাকা চাকরি। এখনো অনেক কাল বেঁচে থাকলেই মাইনে পাব। শুধু অফিসে গিয়ে খানিকক্ষণ কলম নাড়তে হবে রোজ। খুব খারাপ লাগে। কোন মহৎ কাজ করি না। লোকে টাকা রাখে, তোলে, ধার নেয়, ফেরৎ দেয়—সুদ কষে সেসব তুলে রাখি লেজারে। এজন্যে আজকাল পরীক্ষা করে বাজিয়ে টাটকা ছেলে ভর্তি করা হয়।

খুব জমাটি বাজনায় বিপিন নিজেই চোখ বুঁজে ফেলেছে। কাছাকাছি কোন বাড়িতে সুন্দর করে মুসুরির ডাল রান্না হচ্ছে। সেই গন্ধে আমার বাজনা শোনার গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। জীবনের অর্ধেকের বেশি খরচ হয়ে গেল। আর বড় জোর বিশ পঁচিশ বছর বাঁচবো।

বাগানের শুকনো পাতা মাড়িয়ে কে আসছিল। এই বারান্দার দিকেই। বিপিন এখন নিজের বাজনায় মাতোয়ারা হয়ে আছে।

আমার বউ। খুব সাবধানে এগিয়ে আসছে। কলমের পেয়ারার ডাল

ধরে দাঁড়িয়ে গেল। সেই জায়গাতেই কিছু চাঁদের আলো ডাল-পাতার আড়াল খুঁড়ে ভেতরে নেমে পড়তে পেরেছে।

চোখাচুখি হল। সেখানে দাঁড়িয়েই ও হাতের ইশারায় বলতে চাইল, আর কেন? এবার বিপিন বিশ্বাসকে উঠতে বল।

হাত নেড়ে বিপিনকে তুলে দেওয়ার কথা বলল তিন বার। আড়াই সের চাল ন' টাকা চোদ্দ আনা। কলকাতায় আরও বেশি। দশ বছর আগে বসানো থিরিশ চারা ধা ধা করে বেড়ে গিয়ে মোড়ের মাথায় নানা লোকের সেন্টার। সেখান থেকে হরেক রকম কথাবার্তা ভেসে আসছে। আলাদা করে বোঝা যায় না।

আমিও সিগন্যাল দিলাম। খুব সাবধানে। বিপিন চোখ খুললেই ডেনজার। শেষে হাতজোড় করে অন্ধকারে নিজের মুখখানা যতটা কাচুমাচু করা যায়—তাই করে, যতটা মাথা নেড়ে বোঝানো যায়—তাতে বললাম, এবার তুমি দয়া করে গোয়ালের দিক থেকে ঘরে ফিরে এস।

মন বলছিল, সাপখোপ থাকতে পারে। উঠে এসো।

এত সুন্দর দেখাচ্ছিল। পারলে বরণ করে বারো চোদ্দ বছরের পুরনো বউকে বারান্দায় তুলে নিতাম। কতকাল আলতা পরে না।

বউ তবু নড়ে না। আমাকে বিপদে ফেলে ওর কি আনন্দ।

ও শুধু মাথা নাড়লো। মানে ওখান থেকে যাবে না।

বিপিন এমন কিছু বেশি খায় না। ভাতটা যা কিছু লাগে।

কতকাল আগে কিনে দেওয়া জরিপাড় কালো শাড়িখানা পরেছে আজ। অনেকটা আগের দিনের নীলাম্বরী প্যাটার্ন। কাউকে বিপদে ফেলতে এমন সেজে কেউ বাগানে নামে। গালে জ্যোৎস্না পড়লেও বোঝা যাচ্ছে না—পাউডার মেখেছে কি না।

উঠে দাঁড়িয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, হেট্ হেট্। যেন গরু তাড়াচ্ছি। যেন কারো কালো গাইটা হঠাৎ বাগানে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু ওঠা গেল না।

বিপিন উঠতে দিল না। বুকের ভেতরে কত রকমের পাহাড় পর্বত থাকতে পারে জানা ছিল না। ছড়ের এক এক টানে সে-সব ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে শুধু সুদূর সাইকেল রিক্সার প্যাক প্যাক আওয়াজ। তাতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না।

ঘস করে খোকার মা সরে গেল।

'ওই যে। নড়বেন না। এসেছে—,' ছড় থামে নি বিপিনের।

বললাম, 'কোথায় ?'

'বাগানে—'

বুড়ো মানুষ। কোন বেলাই পেট ভরে খাওয়া জোটে না বোধ হয়। বাজিয়ে নানারকমের ভুজুংভাজুং দিয়ে তবে অন্ন হয়। নিজের বানানো পরীর গল্পের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একেবারে জলজ্যান্ত পরী এসে বাগানে দাঁড়াবে এ ওর স্বপ্নেও ছিল না।

তাই বোধহয় হাত ফসকে টানের মাথায় ছড়খানা স্লিপ খেয়ে একেবারে বাগানে গিয়েই পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা বোঝাই সুর থেমে গেল।

'দেখলেন ?'

বললাম, 'একদম স্পষ্ট।'

দু-জনে চুপচাপ বসে রইলাম খানিক। এখন বাগান থেকে কে ছড় তুলে আনে। ব্যাপারটা অশরীরী। বুড়ো বিপিন আগে থেকেই ভয় পেয়ে বসে ছিল। আমার পাওয়া উচিত। তাই বেশ কিছুটা ভয় পেয়ে গেছি এইভাবে বললাম, 'থাক্‌গে কাল সকালে তুলে আনা যাবে। কি বলেন—'

'তাই ভাল।'

যেমন ছিলাম তেমন আছি।

ছেলেপিলের মা জল দিয়ে, থালা সাজিয়ে আমাদের ডাকতে এসেছে। পৃথিবী যেমন ছিল তেমন আছে। জ্যোৎস্নায় মেঘ কিংবা গাছপালার ছায়া লেগে কোথাও কোন ময়লা পড়ে নি।

গতজন্মের রাস্তা

আমার ছোটভাইয়ের তখন আড়াই বছর বয়স। আমি ভেতরের বারান্দায় বসে বোধহয় হাতের লেখা লিখছিলাম। সব মনে নেই। তখনকার যা কিছু অনেক কষ্টে ডুব দিয়ে উপরে তুলে আনি—তার বেশির ভাগই পাতলা কুয়াশায় মাখানো বলে মনে হবে এখন। বলা ভাল—অস্পষ্ট স্মৃতির ময়ামে ডোবানো সেই সব ঘটনার অনেকটাই আমি বেমালুম ভুলে গেছি। ভুলে যাচ্ছি।

মাদুরে ধারাপাত ছড়ানো। উডপেন্সিল শক্ত করে ধরে বাবার অফিসের কাগজ দিয়ে বানানো খাতায় হস্তলিপি প্র্যাকটিস করছিলাম। অজ, আম—লিখছিলাম বোধ হয়। উনিশশো আটত্রিশ সালের বাঙালী গেরস্থবাড়ির উঠোন। মা ছোট কোদালে কুপিয়ে এক ধারে ট্যাড়স লাগিয়েছে—তার পাশেই লাউমাচা। কুয়োতলায় লোহার চেন ডুবিয়ে আশু কামার হারানো বালতি জলের ভেতর থেকে টেনে তুলবার চেষ্টা করছে। মা হলুদ-মাখা হাতে রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে নবর মুখে আঙুল চালিয়ে দিল, 'কয়লা খাচ্ছে—দেখতে পারিস না—'

আমি ছুটে উঠে এলাম। আমার ছোট ভাই নবর মুখ থেকে মা ততক্ষণে তিন টুকরো কাঠ কয়লা টেনে বের করেছে। কুয়োতলা থেকে আশু চেঁচিয়ে উঠল, 'মা আপনার পেতলের বালতি তুলেছি—এই দেখুন। এখন কি বকশিশ দেবেন দিন—'

আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি—মা সোজা হয়ে দাঁড়ানো। কোলে নব। মুখ দিয়ে লাল গড়াচ্ছে। পাশে আমি। মা গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুলেছো ভাল। বালতিটা এই বারান্দায় রেখে যাও। শশাঙ্কর বাবা এলে তোমায় ডাকবেন 'খন—'

এই অবধি লিখে শশাঙ্কতিলক রায়চৌধুরী ডাইরি বন্ধ করল। স্ত্রী অমিতা অঘোরে ঘুমোচ্ছে পাশের ঘরে। ঘুমোলে ওকে বড় নির্বান্ধব লাগে। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে শশাঙ্ক জীবনের আরেকটি সত্য জানতে পেরে চোখের ঘুম হারালো। আমরা যতই এক সঙ্গে থাকি না কেন—সবাই আমরা আলাদা আলাদা করে ঘুমোই। এই জিনিসের ভাগ আমরা কেউ কাউকে দিতে পারি না। দেবার উপায় নেই কোন। আরও বুঝতে পারল, জীবনের ওপারেই একটা বড় ঘুমের সাগর নিঃশব্দ ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলে ফেঁপে ওৎ পেতে বসে আছে। সেখানে পা দিলেই সবার ঘুম একাকার হয়ে যাবে।

পরদিন ভোরবেলা অমিতা ঘুম ভাঙালো শশাঙ্কর। হাতে চায়ের কাপ। পাশে বাঘা। লেজ নেড়ে শশঙ্কাকে গুডমর্নিং দিল। চোখগুলো ঝকঝক করছে। সাদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে গোলাপি লম্বা জিভটা ঝুলিয়ে দিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। ঘাড়ে গলায় পুরু বুনোটের খয়েরি লোমের ভেলভেট। শশাঙ্ক টের পেল, এইমাত্র অসাড় করে দেওয়া ঘুমের ভেতর থেকে সকাল-বেলাকার এমন তাজা সব ছবি, অমিতার নিভুঁল ভ্রূ বাঘার আদর তাকে টেনে উপড়ে তুলে আনছে। উঠে বসে চায়ে চুমুক দিয়ে জানলায় তাকালো। ঝকঝকে রোদ্দুরের ভেতর সবুজ ঘাসের মাঠখানা নির্মুল হয়ে গেঁথে আছে। কলকাতা যাওয়ার থার্ড লোকাল ঝমঝম করে চলে গেল। এর পরেই যাবে ডিম বোঝাই ট্রেন। তখন ভিখারীরা কামরায় কামরায় বাউল গায়। কলকাতা আধঘণ্টা।

তুই মেয়ে তখনো ঘুমোচ্ছিল। অমিতা বাজারের ব্যাগটা এগিয়ে দিল। ভাল মাছ আনবে। দু'রকমের। নব, নবর মেয়ে চিংড়ি ভালবাসে।

বিমলার জন্যে ?

আমাদের মেয়েদের জন্যে ভাবতে হবে না। তুমি তো আজ আর অফিসে বেরোচ্ছো না।

তোমরা মাছ খেতে তো কম ভালবাস না।

অমিতা সে কথার কোন জবাব দিল না।

অনেকদিন পর দু' জায়ে বসে গল্প করব। তুমি কিন্তু রান্নার জন্যে তাগাদা দিতে পারবে না। আজ কোন তাড়াহুড়ো নেই তো।

বাজারের পথে জগদীশবাবুর সঙ্গে দেখা হল। রিটায়ার্ড সরকারী অফিসার। শশাঙ্কর মত বাইরে থেকে এসে এখানে ঘরবাড়ি করেন নি।

পৈতৃক দেশ। বাবার তৈরি একতলা এই সম্প্রতি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের জমা টাকা এক সঙ্গে হাতে পেয়ে দোতলা করেছেন। চাষবাস আছে। নাতি আছে। দুবার এম এল এ দাঁড়িয়ে হেরেছেন। অনেকে ভয় করে। অনেকে নিন্দা করে। সাইকেলে কোথায় যাচ্ছিলেন। এক পা মাটিতে রেখে দাঁড়ালেন জগদীশবাবু। একটা কথা আছে শশাঙ্কবাবু।

আপনি আমাকে বাবু বলেন কেন? আমি তো আপনার ছেলের বন্ধু।

আজকাল সবাইকেই বাবু বলতে হয়। বুঝলেন না!

কি বুঝবে বুঝতে পারল না শশাঙ্ক। ছোটবেলায় দেখেছে, বন্ধুর বাবাকে হয় কাকাবাবু কিংবা মেসোমশায় ডাকত সবাই। সেই মত শশাঙ্ক ডেকেছিল। মেসোমশাই বলেই রেফার করত ভদ্রলোককে। স্থানীয় ডাক্তার, মোক্তার, বেকার—যাঁরা তার বন্ধু হয়েছে এই গত ক'বছরে, তাঁরা সবাই বলতে শুরু করল—'আপনার মেসোমশাই!' যেন কত ঠাট্টার সম্পর্ক। অবশ্য জগদীশবাবুর ছেলের সঙ্গে আলাপের সুতো ধরেই শশাঙ্কর এখানে আসা। সেই রমেনও আজকাল তার সঙ্গে বিশেষ মেশে না। যাকে মেসোমশাই বলে অ্যাড্রেস করতে চায়—তিনিও বিশেষ আগ্রহী নন। সম্পর্কগুলো কি যে হয়ে যাচ্ছে।

যা বলছিলাম। আপনার বাঘাকে সামলান। অত বড় কুকুর অমন ছেড়ে রাখবেন না—

বেঁধে তো রাখতাম। ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠেছিল। ছাড়া পেলেই পথের লোকজন ধরে ধরে কামড়াতো। আর আমাকে সেই সব লোকের ইঞ্জেকসন—হ্যানো ত্যানো চিকিৎসা করাতে হত।

তা বললে তো চলবে না শশাঙ্কবাবু। কুকুরকে পুষবেন কুকুরের মত করেই—কি বলুন?

তা তো বটেই।

শুনলাম ওকে আপনি ফ্যান খাওয়াচ্ছেন! লাউশাকের ঘ্যাঁট খাওয়াচ্ছেন—

স্বভাবটা যদি নরম হয়। আর সবজি খাইয়ে দেখেছি—ওর কন্সটি-পেশনের ধাত—কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে যায়।

তা তো হল। কিন্তু এমন ছেড়ে রেখে কাল আমাদের বড় বিপদে ফেলেছিলেন।

কামড়িয়েছে ?

তা না। গতকাল বিকেলে আমাদের পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট প্রেসিডেণ্ট এসেছিলেন। সীতাকুণ্ডুতে মিটিং করে এখান থেকেই ট্রেনে উঠছিলেন। ট্রেন ছাড়বার মুখে বাঘা গিয়ে ঠিক তার পাশের সিটে বসে পড়েছে। যত ডাকি—ভয় দেখাই—সবাইকে কামড়াতে আসে। আর চুপ করে ট্রেনের কামরায় বসে জানলা দিয়ে জিভ ঝুলিয়ে বাতাস খায়। হ্যা হ্যা করে শব্দ করে। ভাবুন তো এটা আমাদের একটা প্রেষ্টিজের কোশ্চেন। অনাদিবাবু অবশ্য কিছু বলেন নি। কিন্তু যাই হোক তাঁর কাছে তো আমাদের অনেক কিছুই নির্ভর করে—

বাঘা কামড়ায়নি তো।

কামড়াতে পারত। কী কেলেঙ্কারিটাই হোতো বুঝুন। শেষে নিজে থেকেই নেক্সট্ স্টেশনে নেমে গেল।

আপনি সঙ্গে গিয়েছিলেন ?

বাঘার জন্যেই যেতে হল। প্রেসিডেণ্টকে গার্ড করে নিয়ে যাচ্ছিলাম। ক্যাডাররা কেউ বাঘার কাছাকাছি যেতে সাহস পাচ্ছিল না। যা চেহারা করেছে একখানা—। জগদীশবাবু থেমে বললেন, ও যে এমন করে বাতাস খায় জানতাম না। একেবারে হ্যা হ্যা করে। তখন যে কী ভয়ঙ্কর লাগে। আমি তবু ওর কিছু চেনা লোক বলে সামলে রাখতে পেরেছিলাম কুকুরটাকে। সামলে রাখবেন—বলেই সাইকেলে প্যাডেল করলেন জগদীশবাবু।

বাঘাকে কুকুর বলাতে শশাঙ্কর খুব গায়ে লাগল। অবশ্য বাঘা কুকুরই তো বটে। ভালো জাতের অ্যালসেসিয়ান। বছর তিনেক বয়স হবে। ক'দিন অন্তর ভোরবেলা কিছু ঘাস খেয়ে বমি করে। পেলে নারায়ণপুজোর বাতাসাও খায়। আবার বাড়িতে মাংস রান্না হলে খুব খুশিও হয়। বড় সাইজের অ্যালসেসিয়ান বলে খাওয়া দাওয়া নিয়ে বিশেষ কোন বায়না নেই কিন্তু। এসেছিল মাস তিনেকের। প্রথম দু'তিন রাত্তির খুব কান্নাকাটি করে। তারপর একদম ঘরের ছেলে হয়ে গেছে। আজকাল তো দুর্গাপুজোর সময় মণ্ডপের পাশে দাঁড়িয়ে আরতিনৃত্যের ঢাকের বাজনা শোনে মন দিয়ে। আরও ছোট থাকতে শশাঙ্কর দু' মেয়ের লেপের ভেতর যেন দু' বোনকে পাশে নিয়ে ছোটভাইটি চুপ করে শীতকালে লুকিয়ে থাকত। পাছে শশাঙ্ক ধরে ফেলে।

মলি ক্লাস সেভেন। ললি থ্রি। ওরাও স্কুল থেকে ফিরেই প্রথমে বাবার সঙ্গে দেখা করে। শশাঙ্কর অনেক দিনের ইচ্ছে—একদিন সারাদিন ধরে একটা সবুজ নির্জন মাঠের ভেতর দিয়ে ওরা খেলতে খেলতে ছুটবে। বসবে। ও নিজে। বাবা। আর মলি ললি। ঘাস খুব সবুজ হওয়া চাই। বাবার গায়ের রং খয়েরি। মলি ললি লাল ফ্রক পরবে। আর ওদের চল্লিশ বছরের বাবা—শশাঙ্কতিলক রায়চৌধুরী—ওজন একাত্তর কেজি—খুলনা জেলা স্কুলের ক্লাস থ্রির মত আবার খাকির হাফপ্যাণ্টের ভেতর সাদা হাফশার্ট গুঁজে—পায়ে বুট দিয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটবে। হাতে একটা নীল বড় বেলুন চাই। ঠিক বাবাও নয় আবার ভাইও নয়। অনেকটা বন্ধুর মত। যেন পাশের বাড়ির ক্লাস সিক্সের ছেলে। মলি ললির সঙ্গে ছুটতে ছুটতে বাতাসে ভাসানো বেলুন ধরতে যাবে। একটুর জন্যে পারবে না। পেছন পেছন বাবা ছুটবে। খিদে পেলে একটা গাছতলায় বসে কিছু খেয়ে নেবে। আবার খেলা। বিকেলের দিকে বাড়ি ফেরা শুরু হবে। বাড়ির কাছাকাছি এসে শশাঙ্ক আবার বাবা হয়ে যাবে। তখন ওদের মা অমিতা বাজারের নতুন পটল দিয়ে ডালনা চাপিয়েছে কাঠের আঁচে। বাতাসে রান্নার সুগন্ধ। আসলে আমি আর নব ছোট থাকতে খেলেধুলে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরে খুব খিদের মুখে মায়ের হাতে রান্না নতুন ওঠা কপি বা পটলের ডালনা খেয়েছি তারিয়ে তারিয়ে। নব পাখার বাতাস দিয়ে ঠাণ্ডা করে নিত গরম রান্না তরকারি।

রাস্তায় ভিড়। কলকাতা থেকে ট্রেন এখুনি আসবে। খড় বোঝাই গরুর গাড়ি বাসের পেছনে দাঁড়িয়ে রাস্তা বন্ধ করে ফেলেছে প্রায়। সাইকেল ভ্যান কয়লা নিয়ে যাচ্ছে আর কান বিঁধে ফেলা হর্ন দিচ্ছে। এর ভেতরেও শশাঙ্ক দু' হাতে দু' বোঝা বাজার নিয়ে ফিরতে ফিরতে বারবার মনে করতে চেষ্টা করছিল—আচ্ছা—তখনো তো যুদ্ধ থামে নি—বাবা বেঁচে—আমি আর নব একটা সিঁদুরে আম গাছ থেকে আম পাড়তে গিয়ে কেমন নালসে পিঁপড়ের কামড়ে কাবু হয়েছিলাম।

আসলে আজ অনেকদিন পরে নব আসছে। তাই আমার বারবার এসব মনে হচ্ছে। নবর বউ বিমলা, মেয়ে স্বপু আসছে। ছোটবেলার সঙ্গী ছোটভাই বড় হয়ে অনেকদিন পরে এলে এমনই হয় বোধহয়। টানা ফাঁকা রাস্তা অনেকখানি দূর থেকে শশাঙ্কর বাড়ি অবধি চলে গেছে। মোড় ঘুরে

সে-পথে পড়েই দেখল, একখানা রিক্সা যাচ্ছে তারই বাড়ির দিকে—আর উল্টো দিকে তার বাড়ি থেকে তিন প্রাণী বেরিয়ে রিক্সার দিকে ছুটে আসছে। মলি, ললি আর বাঘা। নব তাহলে এসে গেছে। দুই বোঝা নিয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছোনোও যায় না। ওদের পৌঁছে দিয়ে রিক্সাটা ফিরছিল। সেটা ধরে শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি ফিরল।

বাড়িতে পৌঁছে সব কিছু নতুন লাগল। অমিতার সঙ্গে বসে বিমলা গল্প করছে। ট্রেনের কাপড় ছাড়েনি তখনো। মুখে হাসি। স্বপু এক মাথা চুল নিয়ে মাথাটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ছক্কা ফেলার চেষ্টা করছে। নব, মলি, ললি তিনজনের গুটিই বেরিয়ে পড়েছে। স্বপুর তখনো বেরোয় নি।

কি স্বইফট্ ! এই তো এলি। লুডো কখন নামালি ?

মলি বলল, বাবা, লুডু ওদের সঙ্গে ব্যাগেই থাকে। স্বপু ভীষণ ভাল খেলে।

খেতে বসে শশাঙ্ক বলল, সাত বছর পরে এই এলি তোরা—

বিমলা চিংড়ি মাছের মাথা দিয়ে ভাত মাখছিল। আমরা এতদিন কানপুরে রইলাম। আপনি তো যাবেন যাবেন বলে আর সময় পেলেন না। আপনার ভাইও কলকাতায় বদলি হয়ে এল।

স্বপু মাছ খেতে খেতে নবকে বলল, বাবা, রাক্ষস মানুষ খায়। আমরা মাছ খাই। আমরা তাহলে মাছেদের রাক্ষস ?

সবাই হেসে উঠল। নব বলল, ও সারাদিন রাক্ষস খোক্কসের গল্প পড়ে—

খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকরকম কথা হল। অনেকদিন পরে বাড়িটা সরগরম হয়ে উঠেছে। খানিকটা শহরের মতই ইলেকট্রিক ট্রেন, বাস, ব্যাংক—আবার গাঁয়ের মত খাল, ধানক্ষেত এখানে আছে বলেই শশাঙ্কর এ-জায়গাটা ভাল লাগে। মলি তার কাকীমাকে পুকুর দেখাচ্ছিল। বাড়ি হওয়ার পর নবরা কোনদিন এখানে আসে নি। তাই ও ঘুরে ঘুরে সব ঘর দেখাচ্ছিল। দোতলার ছাদে চিলেকোঠার ঘরে দাঁড়িয়ে দূরের মাঠ দেখে বলল, ফাইন !

শশাঙ্ক মনে মনে ভেবেই রেখেছিল, বলবে, তুই এখানে থাক না। ট্রেনে অফিস যাবি কলকাতায়। ট্রেন কিছু বেড়েছে আগের চেয়ে। মনে মনে ভেবেছিল, সেই আগের মতই। সেই আগের মতই। এখন আর আমাদের আম

কুড়োবার বয়স নেই। বৃষ্টিতে ঝড়ের তোড়ে ঝুনো নারকেল খসে পড়লে ও আর নব ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে আনত। এখন আর তা হয় না। তা আমি জানি। সে বয়স আর নেই। স্যাণ্ডো গেঞ্জি উপচে নবর কাঁধ, সুঠাম দু'খানা হাত দোতলার উঁচুতে বাতাস মেখে নিচ্ছিল।

এত সুন্দর বাড়ি করলে। কিন্তু এত দূরে। অফিস কর কি করে?

শশাঙ্ক বলতে পারত, এখান থেকে যাতায়াত করে এখানকার ছেলেমেয়েরা ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে। রোজ বোধহয় লাখ দুই লোক এমন ট্রেনে করে কলকাতায় চাকরি, ব্যবসা করতে যায়। কিন্তু এটা তো ডিবেটিং ক্লাস নয়। ফর অ্যাণ্ড এগেনস্ট—যুক্তি সাজিয়ে লেকচার দেওয়া যায় অন্য জায়গায়। কিন্তু সাত বছর পরে—ছাদে—দোতলায় বাতাসের মধ্যে। অসম্ভব।

জায়গাটা সস্তা পেলাম। আমি তো কলকাতায় জায়গা কিনতে পারতাম না—সে তো তুই জানিস।

তবু যদি আরেকটু কাছাকাছি ছোট করেও বাড়িটা করতে—

বেলা তিনটে নাগাদ খাবার জল ফুরিয়ে গেল। কাজের লোক বাচ্চা ছেলেটা জগদীশবাবুর বাড়ির সামনের টিউবয়েল থেকে খাবার জল আনতে গেল।

সে কি দিদি! অত দূর থেকে জল আসে? বাড়ির টিউবয়েলে কি দোষ করল?

অমিতা বিমলাকে বুঝিয়ে বলল, বাড়ি করে তোমার দাদার হাত ফরসা। তাই বেশি টাকা দিয়ে অনেক গভীরে টিউবয়েল বসাতে পারেনি। পঞ্চাশ ফুটের টিউবয়েল করে রেখেছে। স্নানের জন্যে গরমকালে টিউবয়েলের জল ঠাণ্ডা হয়। ওই তখন ব্যবহার হয়। যারা সাঁতার জানে না—টিউবয়েলের জলে চান করে। কিন্তু এ জল খাওয়া যায় না।

শশাঙ্ক আর নব শুয়ে শুয়ে ঘুম আনতে চেষ্টা করছিল। খাটের নিচেই মাথার কাছে মাদুর পেতে বসেছে অমিতা। মলির ফ্রক ছ' মাস অন্তর ছোট হয়। সেলাই খুলে বড় করছিল। পাশে বিমলা।

নব বলল, তুমি মটর ফিট করে বাথরুমে জল আনোনি কেন?

শশাঙ্ক হাসল।

অমিতা দাঁতে একটা সেলাইয়ের ফোঁড় আলগা করে নিয়ে বলল, সেই

এক কারণ। কলি ফেরানোও বাকি। গ্রিলে রং দেওয়া দরকার। জং ধরছে।

বিমলা বলল, এখানকার হাওয়ায় বোধহয় নোনা আছে। জানলার গ্রিলে কেমন জং লেগেছে—

অমিতা বলল, তুমি এখন ওদের একটু ঘুমোতে দাও। ট্রেনে খুব গরম লেগেছে।

নব বলল, কী নোংরা ট্রেনগুলো। পাখা নেই। জানলা নেই। ছাদ নেই প্রায়। উইদাউট টিকিটের ভিখারিতে বোঝাই।

শশাঙ্ক নিবু গলায় বলল, রেল কি করবে? লোক বাড়ছে। জায়গা কম। খাবার নেই। ওরা ভোরের ফার্স্ট ট্রেনে কলকাতায় ভিক্ষে করতে যায়—উইদাউট টিকিট বলে ধরে নিয়ে গিয়ে ওদের জেলে রাখলেও তো সেই বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হবে।

তুমি যা খরচ করেছ তাতে কলকাতায় ওনারশিপ ফ্ল্যাট হয়ে যেত। প্রথমে একবারে কিছু দিতে হয়। তারপর বিশ বছর—কিংবা পনেরো বছর ধরে মাসে মাসে ভাড়ার মত করে বাকি টাকা শোধ করে দিতে পারতে।

বিমলাও বলল, হ্যাঁ দাদা—আপনি খুব সহজেই তা পারতেন। বালিগঞ্জ প্লেসে বেশ দক্ষিণ খোলা দোতলার ফ্ল্যাট—

শশাঙ্ক মনে মনে তখন অন্য হিসেব করছিল। ভেবেছিল, ওরা ক'দিন এখানে থাকবে। তাই দু'রকম মাছ বলতে চিংড়ি, কই এনেছিল সকালে। বিকেলে কই-তেল রান্না হবে ঠিক করেছিল। জ্যোৎস্না উঠলে পুকুরপাড়ের বারান্দা দিয়ে খুব ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়। সেখানে সবাই মিলে খেতে বসবে ভেবেছিল। শশাঙ্ক এমন প্রায়ই খাবার জায়গা পালটে পালটে বসে। তাতে নতুন লাগে। কিন্তু এখন সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে—ওরা আজ সন্ধ্যের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে যাবে। কিংবা বেশি রাতের ট্রেনে। কেননা, এখানকার সেই বিখ্যাত বিকেল পড়ে আসছিল। বাঘা সিঁড়িঘরে টান টান হয়ে শুয়ে আছে। সকাল থেকে স্বপু ওদের সঙ্গে খুব খেলেছে। এখন বিকেলের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে আসবে। বাঘা ঢোলকলমিতে ঢাকা উল্টো দিকের পুকুরপাড় ধরে একা একা নির্জন ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যাল কিংবা তারও ওধারে বেড়াতে চলে যাবে। তারপর হঠাৎ যখন সন্ধ্যের ঘোর ফিকে করে দিয়ে জ্যোৎস্না বেরোবে—তখন শশাঙ্ক টের

পাবে—বাঘা কাছাকাছিই চার পায়ের ওপর বিরাট শরীরটার ভার সামলে এক অদ্ভুত নিয়মে হাঁটছে, বাতাস খাচ্ছে, হ্যা হ্যা করছে, জিভ ঝুলিয়ে দিচ্ছে। তখন বাতাস ফেটে গিয়ে আলো বেরোয়।

ঘুম হল না। নবকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। বিকেলের প্রথম ঠাণ্ডা বাতাস এখন বয়ে যাবে।

এই পথটুকু তুমি বানিয়েছ?

শশাঙ্ক মাথা নাড়ল। তার অফিসের দু'একজন বেড়াতে এসেও একথা জানতে চেয়েছে। শশাঙ্কদের অফিসটা মোটামুটি মন্দ না। তারা যারা চল্লিশ পেরিয়ে টিফিনে কৌটো খুলে ছানা খায়, বেয়ারাকে দিয়ে নিজের কাচের গ্লাসে চা আনায়—যাদের অনেকেরই ব্লাড সুগার এখন একশো তের—তাদের ভেতর একমাত্র শশাঙ্কতিলকই গত সাত বছর ধরে চেষ্টা করে একটু একটু করে ইট, খোয়া জোগাড় করে বারো ফুট চওড়া—দু' ফারলং লম্বা এই রাস্তাটুকু বানাতে পেরেছে। অবশ্য পিচ দিতে পারে নি।

দু' ধারে এই গাছ বসিয়েছে কে? তুমি?

এই সাত বছর ধরে—

বকুল গাছটা তো বেশ বড় হয়েছে—

ছায়া পাবে লোকে। গন্ধ পাবে—

এত খেটে এসব করতে গেলে কেন! এর চেয়ে কত আরামে কম খরচে ফ্ল্যাট হয়ে যেত তোমার—

তখন বয়স কম ছিল। খেটেছি।

ঠিক জায়গায় খাটুনিটা লাগাওনি।

ওরা দু'জনে হাঁটছিল। স্যাণ্ডো গেঞ্জির ভেতর দিয়ে নবর সারা শরীরে ফিকে রোদ্দুর ঢুকে যাচ্ছিল। আজকের লাস্ট রোদ্দুর। শশাঙ্কতিলকের হাতে তৈরি রাস্তার দু' ধারে বনঝালের জঙ্গল মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। বড় বড় শ্বেত আকন্দের পাতায় কালো ডেয়ো পিঁপড়ে বাতাস সামলে উঠতে চাইছে। বকুল গাছটা একটু আধটু গন্ধও দিচ্ছিল।

ঠিক সেই সময় নব ফস্ করে বলে দিল, এ যে একেবারে গতজন্মের রাস্তা করে ফেলেছো।

থতমত খেয়ে গেল শশাঙ্ক। নব জানলো কি করে? তারও তো এক এক সময় তাই লাগে। এই সেদিনের রাস্তাটাকে তার প্রায়ই মনে হয়—

বড় চেনা। বড় চেনা। এখান দিয়ে সে আগেও যেন কতবার হেঁটে গেছে। এই এবড়ো-খেবড়ো খোয়া ওঠা পথটুকু তার নিজেরই ভুলে যাওয়া কোন রাস্তা থেকে মোড় নিয়ে এদিকে চলে এসেছে। প্রথম প্রথম তাকে টেরও পেতে দেয় নি। নব টের পেল কি করে?

এত খাটুনি দিয়ে তুমি কলকাতায় দিব্যি আরামে থাকতে পারতে। নিজের ফ্ল্যাটে—

সেখানে তো আরাম একদিন ফুরিয়ে যেত নব।

কেন?—একটা খয়েরি পাখি বকুল গাছ থেকে বেরিয়ে গেল।—সেখানে নতুন নতুন ফ্ল্যাট সিস্টেমের বাড়িতে কোনো ব্যবস্থার অভাব নেই।

আমি সেখানে কিছু বানাতে পারতাম না। মাসখানেক নিজের ফ্ল্যাটের ভেতর হাঁটাহাঁটি করে বাড়িটা পুরনো করে ফেলতাম। এখানে আমি ইচ্ছে করলে ঘাস ওপড়াতে পারি। পেঁপে চারা বসাতে পারি।

অ্যাট হোয়াট কস্ট? ইচ্ছে হলেই তুমি বন্ধুদের বাড়ি যেতে পারবে না। তারপর তো ট্রেনের ড্রাজারি আছেই—

তুই বলতো আমরা আর কতদিন অ্যাকটিভ, চটপটে থাকব! খুব বেশি আর দশ-বারো বছর। জীবনের টু থার্ড বাঁচা হয়ে গেল। আমার আর কিছু বাড়াবার ইচ্ছে নেই। ফ্ল্যাট নিয়েও তোর আগ্রহ একদিন ফুরোবে—তবু সেখানে তুই এমন রাস্তা পাবি না—যা এত চেনা লাগে—অথচ ধরা যায় না—তোর চোখের সামনে সব সময় আছে—অথচ কত আগেকার—

কি জানি!

ও কি? ফিরছিস কেন? এখুনি চলে যাবি—

সন্ধ্যের ট্রেন ঠিক ক'টায়?

ছ'টা ছত্রিশ আছে। সাতটা সাতচল্লিশে আছে। এতদিন পরে এলি। এত তাড়াতাড়ি যাবি—

কলকাতায় এতদিন পরে এলাম। অনেক কাজ পড়ে আছে। জয়েন করে তো ছুটি পাব—তখন এসে দু'দিন থাকব।

একটা কথা বলি তোকে। আমার সঙ্গে থাকবি? এখান থেকে আমার সঙ্গে অফিসে যাবি। ট্রেন আরও বাড়বে সামনের অক্টোবরে। নবর পিঠে হাত রাখতে ইচ্ছে করছিল শশাঙ্কর। বাতাসে একটা খেজুর গাছের সব পাতা পশ্চিম দিকে এক সঙ্গে উল্টে যাচ্ছিল।

আলো কমে আসছিল। ওরা কেউ কারও চোখ দেখতে পাচ্ছিল না।

এখন আর হয় না তা—

কেন? কেন হয় না?

তুমি বোঝ না একদম। আমারও প্রায় চল্লিশ হতে যাচ্ছে। আমরা এখন আলাদা আলাদা মানুষ।

•আমি আর তুই আলাদা?

বুঝছো না কেন! আমরা এখন দু'জন মানুষ।

শশাঙ্কতিলক কিছুতেই বলতে পারল না, একদিন সকালে আমি যখন হস্তলিপি প্র্যাকটিস করছিলাম—তুই বেমালুম তিন টুকরো কাঠকয়লা মুখে পুরে বসেছিলি। মা ছুটে এসে মুখে আঙুল চালিয়ে বের করেছিল। দু'জন মানুষ মানে কি? কিন্তু দেখল, এ সব কিছুই বলা যায় না। কিছুতেই বলা যায় না।

এক বাড়িতে গাদাগাদি করে থাকলে—

মাঝখানে থামিয়ে দিল শশাঙ্ক। গাদাগাদি কেন? অনেক ঘর তো এখানে। তুই সামনে দু'টো ঘর নিয়ে থাকবি। প্রায় সব কিছু সেপারেট। অ্যাটাচড্ বাথ্—

আর হয় না তা। এভাবে থাকলে পার্সোনালিটি বিকাশের পথ পায় না—

পার্সোনালিটি! সেটা কি জিনিস?

ও তুমি বুঝবে না। তোমার মাথাতেই ঢুকবে না। আমি তো তোমাকে জানি।

আমিও তো তোকে জানি।

কিচ্ছু জানো না।

তুই তো আমার ভাই। মা আমাদের এক থালায় ভাত মেখে খাইয়ে দিত।

সে তো অনেক আগে। বলতে পার গতজন্মে প্রায়।

তখন আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক ছিল না। মা ভূতের গল্প বলত খুব। বাতাসে হ্যারিকেনের শিখাটা থেঁতলে যেত। আর কিম্ভুত সব অন্ধকার এ-দেওয়াল থেকে লাফিয়ে ও-দেয়ালে পড়ত। তুই মায়ের কোল ঘেঁষড়ে আরও ভেতরে চলে যেতিস।

তখন নবর মনে পড়ল, ওদের খাবার ঘরের ঠিক পেছনেই বাঁশবাগান

ছিল—তার নিচে ডোবা। তাকাতে গিয়ে চোখ বুজে ফেলত। থোকা থোকা জোনাকি ছিটিয়ে দিয়ে রান্নঘরের পেছনে সেসব সময় রাত শুরু হত।

বাড়ি এসে গেল বলে আর কথা হল না।

লোডশেডিং যাচ্ছে বলে ইলেকট্রিক নেই। হ্যারিকেনের আলোতে বসে বিমলা হাত-আয়না সামনে রেখে অনেক কষ্টে পাফ বোলাচ্ছিল মুখে। পাফটা চারভাঁজ লুচির মত ছোট করে নিতে হয়েছে। শেকড় থেকে মাটি ছাড়ানো একখানা বড় মানকচু ঘরের কোনে দাঁড় করানো। বড় সাইজের কচু সর্বদাই দাড়িওয়ালা গম্ভীর মানুষের চিবুকের কথা মনে করিয়ে দেবে।

ওরা সাতটা সাতচল্লিশ ধরবে বলেই বেরিয়ে পড়ল। রিক্সা বলা ছিল। কিন্তু আসেনি। নব রীতিমত তিতিবিরক্ত হয়ে চেঁচাচ্ছিল একটু আগে। কই হল? এতখানি পথ যেতে হবে। ট্রেনের আর মোটে বারো মিনিট আছে কিন্তু—

স্বপু হাঁটবে না বলে বায়না ধরেছে। মেয়েটাকে কোলে নিয়ে ধুপধাপ করে হাঁটতে লাগল নব। অনেক কথা আজ বলতে পারে নি শশাঙ্কতিলক। এখন জ্যোৎস্না বেরোচ্ছে। তার বানানো রাস্তার দু'ধারে তারই হাতে বসানো ছ'সাত বছরের সব ছোকরা গাছগুলো এক-একটি আলাদা মহীরুহের পোজ দিয়ে দাঁড়ানো। ওদের সরল, বিচ্ছিন্ন ছায়ার ভেতর দিয়ে নব এগিয়ে যাচ্ছিল। মাথার পেছন দিকটা এই ফিকে জ্যোৎস্নায় চেনা যায় না। তারই পাশে আরেকটা ছোট মাথা। স্বপুর। চুলে বোঝাই। সারাদিন খেলে নবর কাঁধে ঢলে পড়েছে। পেছন পেছন বিমলা স্লিপার পায়ে জোরে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেও পারছে না। বোধহয় হোঁচট খেল। হাতে কাপড়জামা বোঝাই প্লাস্টিকের ব্যাগটা বেশ ভারি। তার পেছনে বাঘা, মলি ললি। অমিতা, শশাঙ্ক—দু'জনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অস্বস্তিতে ভুগছিল। আগাম বলে রাখা সত্ত্বেও রিক্সাটা যে কেন এল না—

ওদের এগিয়ে দিতে মোড়ের শিমুল গাছ অবধি গিয়ে মলি ললি ফিরে এল। ললির মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছিল এবার কাঁদবে। বাঘাকে ফেরানো গেল না—শশাঙ্কতিলক পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, দু'জন চেনা লোককে পৌঁছে দিতে একটি ধূসর রঙের পশু লেজ ঝুলিয়ে দিয়ে বিচক্ষণ ভঙ্গিতে মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলেছে। তার চার পায়ের হাড়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট

চলবার সঙ্গে সঙ্গে ছিপছিপে পিঠের ওপর জানান দিয়ে যায়। ওর চোখে এখন আলো পড়লে নীল কাঁচের টুকরো বোধ হবে। পুরো ছবিটাই একেবারে অন্য জন্মের। ওদের দু'ধারে বনঝালের ঝোপ। তাতে কিছু কিছু জোনাকি।

যাক গিয়ে—খানিক পরেই ফিরে আসবে।

রাত্তে শোয়ার আগে অমিতা বলল, আজ কিন্তু অনেক রান্না বেশি হল। বাঘা দেখলে খুশি হত।

ওর জন্যে রেখেছো তো—

বাইরের বারান্দায় বাঘার নিজের গামলায় ঢাকা দিয়ে রেখেছি। যত রাতেই ফিরুক—এসে মুখ দিয়ে ঢাকনাটা সরিয়ে নিয়ে খাবে।

ওর এই বাইরে বেরোনো অভ্যেসটা কমাতে হবে। আজ সকালে জগদীশবাবু বাঘার জন্যে দু' কথা শোনালেন—

উনি একজন বয়স্ক মানুষ। এই তিন বছরের বাচ্চাটার পেছনে লেগেছেন কেন বুঝি না। সেবারেও লক্ষ্মীপুজোর পরদিন কিছু কথা শোনালেন বাঘার জন্যে—

অনেক রাতে শশাঙ্কতিলক দেখতে পেল, তার বানানো রাস্তাটার দু' ধারে বসানো গাছগুলোতে ফুল এসেছে। ওদের ফল দেবার সময় এল। বকুল গাছে ফুল। ক্যাসিয়া গাছে হলুদ গুঁড়ো ফুল। নিম গাছে ফুল। নানা সুবাসে মেশানো রাস্তাটার গায়ের গাছগাছালির ভেতর দিয়ে হরেক পাখি বেরিয়ে আসছে— আবার তার ভেতরে মিশেও যাচ্ছে। লাল খোয়ার পথে ফুলগুলো ছড়ানো। তার ওপর দিয়ে বাঘা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ফিরে আসছে। চোখের জায়গায় দু'টো নীল কাঁচের টুকরো বসানো। নিশুতি রাতে মালগাড়ির সান্টিংয়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। অমিতা অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। জানলার ঠিক নিচেই নাগাড়ে মস মস আওয়াজ হচ্ছিল। গা ছমছম করে উঠলো শশাঙ্কতিলকের। তবু সাহস করে এগিয়ে গেল। গোয়ালাদের বড় মোষটা একা একা জানলার নিচের লম্বা গুড়নের ঘাসের জঙ্গলটা প্রায় সাফ করে ফেলেছে। আশে পাশে কেউ নেই। ভারি মাথাটা নামিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ খাচ্ছে—আবার মাথা তুলে নিয়ে জিরোচ্ছে। মাথার একটা ওজন তো আছেই। জ্যোৎস্নায় ওর পিঠ চিক চিক করে উঠলো। বাঘা দেখলে ভীষণ চেঁচাতো। তাহলে

ফেরেনি। দেখ অমিতা—আমরা দু'জন আলাদা আলাদা মানুষ কেমন একই বিছানায় শুয়ে আছি।

পরদিন শশাঙ্কতিলক অফিস যাবার মুখে স্টেশনমাস্টারকে বাঘার খবর জিজ্ঞাসা করল। তিনি গতকাল বিকেলে ছিলেন না। এ.এস.এম. অন-ডিউটি দত্ত ছিল। সেও বাঘাকে দেখেনি। অফিসে পৌঁছেই নবর ফোন পেল। বাঘা কাল রাতে ট্রেন ছাড়ার মুখে ওদের কামরায় লাফিয়ে উঠেছিল। উঠেই সোজা স্বপুর পায়ের কাছে গিয়ে বসেছে। শেয়ালদায় নেমে আর বাঘাকে ধরতে পারেনি। ভিড়ের ভেতর একদম সোঁ করে জি আর পি থানার ভেতর ছুটে যেতে দেখেছে নব। তারপর আর কিছু জানে না।

রাতে বাড়ি ফেরার পথে শশাঙ্কতিলক জি আর পি থানায় গেল। ও-সি বললেন, হ্যাঁ, এরকম একটা কুকুর প্লাটফর্মে ছুটোছুটি করছিল বটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধহয় ডায়মণ্ডহারবার লাস্ট ট্রেনে উঠে গেছে। আপনার কুকুর ?

শশাঙ্কতিলক মাথা নামালো। হ্যাঁ স্যার। কচি বয়স। এত বড় জায়গায় তো আসেনি কোনদিন। লোকজন দেখে ঘাবড়ে গেছে।

পরদিন থেকে—বিশেষ করে ললি স্কুল যাওয়ার মুখে বাঘার জন্যে ভাতের পাতে এত বেশি বেশি করে ভাত রেখে যেতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত শশাঙ্ককে অমিতা না বলে পারল না—শেষে মেয়েটার অসুখ-বিসুখ না হয়ে যায়—আজ ভোরে দেখি যে-কাতে শুয়েছে—বালিশের সেখানটা ভিজে। তুমি বাঘাকে আরও খোঁজো। আর তারই বা কেমন স্বভাব বলতো! সেই গেল আর এল না।

এখানকার ডাক্তাররা শীতকালে গম্ভীর হয়ে যায়। বর্ষায় আবার হাসি হাসি ভাব ফিরে আসে। শীতে গাঁয়ে-গঞ্জে রোগবালাই কম থাকে। বর্ষায় ধাঁ ধাঁ করে ছড়ায়। বিনোদ ডাক্তারের চেম্বারে শশাঙ্ক একদিন বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় বসে ছিল। বেশীর ভাগই আমাশার রোগী। চারদিকে বসে, দাঁড়িয়ে। বিনোদ ডাক্তার একখানা চামড়া বাঁধানো ওষুধ কোমপানির ডাইরি দিলেন। নিয়ে যান—হিসেবপত্র লিখে রাখবেন।

আমার কোন হিসেব নেই ডাক্তারবাবু। আন্দাজে সংসার করি।

নিয়ে যান। দিচ্ছি যখন নিয়ে যান। না হয় মনে ভাব এলে একটু-আধটু লিখে রাখবেন। আপনি তো মশাই কবি কবি দেখতে। পাঞ্জাবি

পরেন। মাথায় বেশ কোঁকড়া চুল। ভাব এলেই ডাইরি খুলে লিখে রাখবেন দু'চার কথা। অনেক পরে দেখবেন—সেসব কথা পড়তে কত ভাল লাগে।

অমিতাকে আর দেখায় নি ডাইরিখানা। পাতায় পাতায় নানান ওষুধের সচিত্র বিবরণ। শশাঙ্কতিলক এক জায়গায় লিখে রাখল: আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা মানুষ।

কতকাতার দিকে দু' স্টেশন উজিয়ে জংশন স্টেশন। সেখানকার কিছু ডেলি প্যাসেঞ্জার এই ক' বছরে ট্রেনে যাতায়াতের সময়টুকুর জন্যে তার সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে গেছে। তাদেরই একজন সব শুনে বলল, যাও না বউকে নিয়ে আমাদের বৈকুণ্ঠপুরে। জোড়ে গিয়ে বিজয় তান্ত্রিককে সব বল। একটা পোষা জীব বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরছে না ক'দিন। কোলের মেয়েটা সেই দুঃখে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে প্রায়। গিয়ে একবার দেখা কর না। বিজয় তান্ত্রিক ঠিক বলে দেবে কোথায় আছে বেটা—

তিন মাস কেটে গেল। বাঘার কোন খোঁজ নেই। নব লিনটন স্ট্রীটে ফ্ল্যাট নিয়েছে। সব কিছু সেপারেট। চব্বিশ ঘণ্টা জল। দক্ষিণে খোলা জানলা দু'টো। দোতলা বলে মশা নেই। পোকামাকড় নেই। কত সুবিধা। একবার সদর দরজা আটকালে কোন লোকের মুখও দেখতে হয় না। দু' মেয়েকে নিয়ে একদিন বেড়াতে গিয়ে বিমলার মুখে সব শুনে এসেছে। এত আনন্দের বিষয়। বলার সময় বিমলার খুব সুখ হচ্ছিল।

শনিবার বিকেল চারটেয় অমিতা আর শশাঙ্ক জংশনে গিয়ে নামল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে পাঁচ মিনিটের ভেতর এমন জায়গায় গিয়ে পড়ল—যেখানে পদ্মদামে ঢাকা দীঘির ভেতর ভাঙা ঘাটের শ্যাওলাপড়া ধাপ নেমে গেছে। তার গা দিয়ে সরু এক চিলতে পিচ-রাস্তার মাথায় স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের তার চলে গেছে। সরু ইটের পোড়োবাড়ির একখানা থিলান জানলা জঙ্গলের ভেতর দাঁড়ানো। তারই পাশে বাঁশের গোলপোস্ট লাগিয়ে ছেলেরা ফুটবল পেটাচ্ছে।

দোতলার সিঁড়িতে অনেক জুতো। ভেতরে মধ্যবয়সী বিজয় তান্ত্রিক বসে। ফতুয়া, ধুতি—কপালে সিঁদুর। তার সামনে মাদুরে বসে ভদ্রলোক ক্লাসের মেয়ে পুরুষ অনেকেই। বিজয়বাবু গেরস্থ তান্ত্রিক। তাঁর বউ, মেয়ে অনেককেই চায়ের কাপ এগিয়ে দিচ্ছিল। এই ভিড়ে অফিসার, মোক্তার,

ডাক্তার, মাস্টার—অনেকেই আছে বোঝা গেল।

বসতেই শশাঙ্ক, অমিতাও চা পেল। মৃদু চাপা কথাবার্তা। পুরনো ভাঙা বাড়ি। বাড়ির বাইরেই গাছপালার ভেতর দিয়ে চেপে অন্ধকার হয়ে আসছিল। বিজয় তান্ত্রিক নিজেই এক সময় উঠে গিয়ে সুইচ টিপে দিল। খানিক দূরেই পিচ-রাস্তা দিয়ে কলকাতার দিকে বাস, লরি, ইলেকট্রিক হর্ন বাজিয়ে ছুটে যাচ্ছে। বোঝা গেল, জমায়েতের অনেকেই এবার নিয়ে দ্বিতীয় তৃতীয় কিংবা ততোধিক বার এখানে আসছেন।

বিজয় তান্ত্রিক তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। শশাঙ্ক কিছু বলতে পারল না। শুধু চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল। স্রেফ একটা ভাবগম্ভীর দৃষ্টি বিনিময় হল মাত্র। কেননা তখন খুব মোটা কাঠির ধূপ পুড়ছিল ঘরে। মেয়েরা সুসজ্জিত। সুবাসিত। পুরুষদের কারও কারও চোখে চশমা—পরনে অফিস ফেরৎ পাতলুন, হাতে সাবধানে পাকানো ছাতা।

সামনে একজন ফিস ফিস করে বললেন, তিনটের বেশি প্রশ্ন করবেন না। পার কোশ্চেনের আন্সার দিতে গিয়ে বিজয়বাবুর জীবনের আয়ু খানিকটা করে ক্ষয় হয়। আন্সার খুঁজতে নিমেষের ভেতর ওঁকে দ্যুলোক, ভূলোক ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যেতে হয়—

শশাঙ্কও গলা নিচু করে বলল, ভগবানের কাছে?

লোকটা খুব সিরিয়াস, বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে। কোন মার্চেন্ট অফিসের বাবু। তেমন ফিস ফিস করেই বলল, কাছাকাছি হবে। দেবতাদের লোকালিটিতে। অনেকটা পথ তো। তাই আমাদের কনসিডারেট হওয়া দরকার। এভাবে আন্সার দিতে দিতে ওঁর আয়ু তো'কাবার হয়ে এল। লোকটা আরও বলল, অগ্নিস্নানের পর সমস্ত ক্যালোরি নষ্ট হয়ে যায়। ওঁর ওয়াইফও তাই বলছিলেন সেদিন। মহিলা খুবই কনসার্নড্—

একেবারে মিশে যাওয়ার জন্যে শশাঙ্কতিলক বলল, হবারই তো কথা। ওঁরই তো সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

তবু লোকহিতায়—

তক্ষুনি শশাঙ্ক বুঝতে পারল, এই পুরুষটাও সেন্ট মেখেছে। অমিতা কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। বুঝতেও পারছিল না। শশাঙ্কর দিকে আঙুল মটকে যা বোঝালো, তার মানে হয়, এবার বাঘার কথাটা তোলো।

কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে কথা ফুরোবার জন্যে শশাঙ্ক আগের কথার রেশ

ধরেই আন্দাজে বলল, সম্ভবামি যুগে যুগে।

লোকটি খুশি হল খুব। বলল, নিশ্চয়ই। কিন্তু ওঁর আয়ু তো ওয়ান এইটথ হয়ে গেল এইভাবে। আমরা তো আর ফুরিয়ে যেতে দিতে পারি না।

অমিতা অস্থির হয়ে উঠেছে। চোখ পাকিয়ে শশাঙ্কর দিকে তাকালো। শশাঙ্ক তখন লোকটির কাছ থেকে এখানকার নিয়মকানুন শুনছিল। এবার পাশের খোলা ছাদে আরতি ও হোম হবে। সেখানে মেয়েরা নিষিদ্ধ। তারপর বাবা ফলাহার করে জবাব দিতে বসবেন। কোশ্চেন করলে লিখে আন্সার দেবেন। তবে মোট তিনটি কোশ্চেন। তার বেশি নয়। তখন ওনার ভর হয় কিনা—

আমার কোশ্চেন একটিই। আমি, নব, মলি, ললি, স্বপু আর একটি নীল বেলুন। সঙ্গে বাঘা। একটু সবুজ ঘাসে ঢাকা ঢেউ তোলা প্রান্তরের ভেতর দিয়ে আমরা ভাসন্ত বেলুনটাকে ধরতে ছুটবো। আমি আর নব খুলনা জেলা স্কুলের ক্লাশ থ্রি্র খাকি হাফপ্যান্টের ভেতর সাদা হাফশার্ট গুঁজে নিয়েছি। পায়ে কালো বুট আর সাদা মোজা। মলি, ললি, স্বপু লাল ফ্রক পরেছে। নীল বেলুনটা ভাসছে। উড়ছে। একটুর জন্যে আমরা ধরতে পারছি না। হাত ফসকে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। খয়েরি রঙের বাঘাও পেছন পেছন লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে। আমি বা নব—কেউ ওদের বাবা নয়। ভাই নয়। যেন পাশের বাড়ির ক্লাস সিক্সের ছেলে। এক সময় হাঁফিয়ে পড়ে আমরা সবাই একটা নির্জন গাছতলায় খেতে বসলাম। বেলুনটা তখনো উড়ছে। পাশেই বাঘা লেজ গুটিয়ে বসেছে। এমনটি কি কোনদিন হবে বাবা? ঢেউতোলা মাঠের ভেতর দিয়ে দুর্বা ঢাকা রাস্তাটা তখন গতজন্মে চলে যাবে?

শশাঙ্কতিলক এসব কিছুই বলার চান্স পেল না। জায়গাটা বলবার মতও নয়। ভিড়ের মধ্যে বসে অমিতা যেভাবে ভক্তিমতী মহিলাদের হার, পেণ্ডেণ্ট, বালা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল—তাতে শশাঙ্ক ভেতরে ভেতরে কাঁটা হয়ে গেল। এখান থেকে বেরিয়ে নিশ্চয় হারের কথা তুলবে। ছাদ ঢালাইয়ের সময় বাহাত্তর ব্যাগ সিমেণ্টের জন্যে ওর ঝোলানো হারটা বেচে দিতে হয়েছিল। আর করা হয় নি।

ভাগ্যিস ঠিক এই সময় ঘণ্টা, শঙ্খধ্বনির, আরতির ভেতর দিয়ে হোম শুরু

হয়ে গেল। খোলা ছাদে কুশাসনে বসে অন্যদের সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্কও কাঁটাঅলা কিসের মরা ডাল সাবধানে ছোট ছোট করে ভাঙলো। তারপর তা দু'খানা ইটের ভেতর সাজানো আগুনে সবার দেখাদেখি দফায় দফায় দিতে লাগলো। বিজয় তান্ত্রিক মন্ত্র পড়ে আর পাশে রাখা বনস্পতির ব্র্যাণ্ড নিউ চার কেজি টিন থেকে কাঠের লম্বা চামচে দিয়ে দলা দলা ঘি ছোঁড়ে। আর টেম্পোরারি আগুনটুকু দাপিয়ে ওঠে।

হোমের পর বাবা মৌন হলেন। ভিজে গামছায় কান গলা মুছে রেকাবি থেকে পেঁপে, আমের টুকরো তুলে তুলে খেলেন।

এবার ভর। সবাই চুপ। ছাদের আগুনটুকু নিভে এসেছে।

এক-একজন কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে কি সব প্রশ্ন করে। আর বাবা ফাউন্টেন পেন খুলে সামনে রাখা চার নম্বরী একসারসাইজ খাতার পাতায় ঘসঘস করে কি লিখে চটাপট পাতাখানা ছিঁড়ে দিয়ে দেয়।

শশাঙ্কর পালা আসতেই ওরা দু'জনে জোড়ে এগিয়ে গেল সামনে।

বিজয় তান্ত্রিক চোখ তুলে তাকাল। এক ঘর লোক। যত আস্তেই বলুক কেউ না কেউ শুনতে পাবে। ধূপের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে গেছে। সময়োচিত প্রশ্ন মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। স্যার, আমাদের কি ছেলে হবে?

বাবা ঘসঘস করে কি লিখলেন। তারপর মুখ তুলে তাকালেন। কেন যে স্যার বলতে গেল শশাঙ্ক তা নিজেও জানে না। হয়ত হোম, শঙ্খধ্বনি, লিখিত জবাব দেওয়ার ভঙ্গীই তাকে নার্ভাস করে দিয়ে থাকবে। বাবা এইবার কুয়ো থেকে হারানো বালতি তোলার স্টাইলে দু' চোখ থেকে পাঁচ ব্যাটারির আলো ফেলে ফেলে শশাঙ্কর ভেতরটা দেখতে চাইল। শশাঙ্কও ভালো করে তাকাল। আমাদের ছেলেবেলার আশু কামার নয় তো? যাঃ! তাইবা হয় কি করে? সে কি আর এতদিন বেঁচে থাকতে পারে। না না সেই আশু কামারই তো। একেবারে অন্য জন্ম থেকে উঠে এল। হবেও বা—

ঠিক এই সময় কোমরে একটা রাম চিমটি খেল। বাঘার কথাটা তোল—

বাবার চোখ নরম হয়ে এল। অমিতার ঘোমটা খসে গিয়েছিল। মাথায় তুলে নিল।

আমরা আর কতদিন বাঁচব?

বাবা এবার একটু বেশি সময় নিয়ে লিখল। অমিতা একেবারে পরিষ্কার বলল, এইটে লাস্ট কোশ্চেন। বাঘার কথা আর কখন বলবে? আর কি

সব ছাইপাঁশ জানতে চাইছো!

বাবা, আমার কি নাম যশ টাকা পয়সা হবে?

বাবা লিখছিল। সেই সেণ্ট মাথানো পুরুষটি বলল, নেক্সট—

পরের পার্টি শতরঞ্চিতে হামা দিয়ে সামনে এগিয়ে এসেছে। অমিতাও উঠে দাঁড়াল। লোকটির দিকে তাকিয়ে শশাঙ্ক মিনতি করে বলল, আরেকটা—

লোকটি কিছু না বলে বাবার হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে এগিয়ে দিল।

পথে বেরিয়ে একটা কথাও বলল না অমিতা। পাশে পাশে শশাঙ্কতিলক হাঁটছিল। শোন তুমি। এক ঘর লোকের ভেতর আমার চটি হারিয়েছে। আমার কুকুর হারিয়েছে বাবা। ছাগল হারিয়েছে—বলা যায়?

বাঘা হারিয়েছে খুব বলা যেত। কি যে সব মাথামুণ্ডু বলছিলে—

দাঁড়াও। দাঁড়াও। পকেট থেকে চার ভাঁজ করা কাগজখানা বের করে একটা লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়াল। স্ট্রীট-লাইটের পাওয়ার এমনিতেই কম থাকে। তারপর ভোলটেজ ড্রপ করেছে। তাতেই দেখল। আশু কামারের হাতের লেখা তো খুব ভাল।

কি বললে?

বিজয় তান্ত্রিকের হাতের লেখা বেশ পরিষ্কার। বলে শশাঙ্ক সামলালো। চারদিকে অন্ধকার। গাছপালার ভেতর দিয়ে কয়েকটি বাড়িতে নিবু পাওয়ারের ডুম জ্বলছে দেখা যায়।

দ্বিতীয় জাতক পুত্রসন্তান।

বিজয়ের হাতের লেখা অমিতাও ঝুঁকে পড়ে দেখল। আমিও ভেবেছিলাম তাই। তখন যে কেন অ্যাবরশন করাতে গেলে আমায়—

তখন ক' টাকা মাইনে পেতাম মনে আছে? বলেও শশাঙ্কর নিজেরই অস্বস্তি লাগল। আসলে কম বয়সের একটা বড় ভুল। থাকলে এতদিনে খুব ভাল হত। দুই মেয়ে। মাঝখানে এক ছেলে। সরু রাস্তাটার মাথার উপর দু' ধারের গাছপালার ভেতর দিয়ে আকাশের যেটুকু দেখা যায়—সেটাও আরেকটা রাস্তা। সেখানে কয়েকটি তারা ছড়ানো। বোধ করি, লোকালয়ের বাইরে এই সব পথ দিয়েই তারারা যায়। যাওয়ার কোন চিহ্ন রাখে না। উল্কার বেগে কোন্ অজানা অন্ধকার মাঠে গিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়ে। সন্ধান পাওয়ার কোন পথ থাকে না। সহধর্মিণীর মৃত্যু পেটঃপীড়ায়। উনপঞ্চাশ বছর আট মাসে। ওয়াইফ লাইন নট সো গুড্। কনজুগাল

লাইফ হ্যাপি। বাট হার ফিউচার প্রসপেক্ট নট সো গুড্। ওয়ার্স্ট পিরিয়ড্ কামিং। প্রিকসন নিবেন।

ওঁর নিজের তো সব আয়ু কাবার হয়ে আর দু' আনা পড়ে আছে! কাগজটা তুলে ধর না। তোমার দেখি কোন বয়সে? শশাঙ্ক কাগজের ভাঁজের জায়গাটা তুলে ধরল।

উনষাট বছর তিন মাসে সাধারণ জ্বরে জাতকের ইহলীলা সাঙ্গ। শেষ দেড় বছর প্রবল রোগভোগ। ইওর লাইফ ম্যাক্সিমাম ফিফটিনাইন ইয়ার্স থ্রি মান্থস্।

তখন তো আমায় দেখবার কেউ থাকবে না। তখন তুমি অনেকদিন হল গত হয়েছ—

পেত্নী হয়ে ভয় দেখাব।

তাহলে প্রবল রোগভোগের হাত থেকে বেঁচে যাব।

কাগজটা তোলোই না দেখি।

ট্রেনে বসে দেখবে। তাড়াতাড়ি চল। আটটা চল্লিশ ফেল করলে সেই একেবারে দশটা দশ—

দেখি না। একটা কুকুর খুব গম্ভীর গলায় কাছাকাছি কোথায় ডাকছে। চারদিক অন্ধকার বলে ধরা যায় না—ঠিক কোন্ দিকে। শশাঙ্কতিলক বিমনা হয়ে পড়ছিল।

দেখাও না।

কাগজখানা মেলে ধরল শশাঙ্ক। তেতাল্লিশ হইতে আটান্ন—জাতকের যশোলাভ, প্রভূত অর্থাগম। রাহু ও বুধের মিলন। তবে বুধ ইনঅ্যাকটিভ্। ম্যাকসিমাম্ ট্রাবেল্—মিনিমাম্ এফেক্ট। শত্রুজড়িত। ব্যাক্ বাইটিং পলিসি প্রেজেন্ট।

মুখ তুলে অমিতা বলল, এখন তোমার কত?

একচল্লিশ রানিং।

তাহলে আরও দু' বছর। টাকা এলে আগে দোতলা কমপ্লিট করাব। কম্পাউণ্ড ওয়াল্ দিতে হবে।

এবার খুব গম্ভীর গলায় কুকুরের ঘেউ-উ দু' ধারের অন্ধকার ছিঁড়ে বেরিয়ে এল। শশাঙ্ক খুব তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা দশ পয়সা বের করে লোহার লাইট পোস্টের গায়ে এক জায়গায় বেশ করে ঘসে ঘসে রঙ

তুলে ফেলল।

কি পাগলামি করছ?

দেখবে কাল—

আমরা যে-জন্যে এলাম ওগো—সে কাজের কিন্তু কিছুই হল না।

শশাঙ্ক বলল, তিন-চার মাসে বাঘাকে আমরাও ভুলতে বসেছি। যেন এ-জন্মে বাঘা বলে কেউ ছিল না।

ললি কিন্তু ভোলে নি।

বেশি রাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসলে পরিষ্কার বুঝতে পারি, আমার এই বউ ঘুমিয়ে পড়লে একজন একদম আলাদা মানুষ হয়ে যায়।

পরদিন খুব ভোরে সেকেণ্ড ট্রেন ধরে শশাঙ্কতিলক জংশন স্টেশনে এসে নামল। কাউকে কিছু না বলে লাইটপোস্ট দেখতে দেখতে এগোতে লাগল। সকালের আলোয় রং চটানো লাইটপোস্টটাও খুঁজে পেল।

ওই তো উল্টোদিকে একজনের ভাঙা খোলা ঘর।

বৈকুণ্ঠপুরের রাস্তাঘাট বেশ ভাল। পুরনো পুরনো বাড়ি। সুপুরিগাছের সারি। একা একা হাঁটতে হাঁটতে বড় একটা দিঘির লাগোয়া বেশ বড় এক বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। পাড়ার ছেলেরা ক্যাম্বিসের বল পেটাচ্ছে। পাশেই বড় পরিবারের পেল্লাই রান্নাঘর। সামনে অনেকখানি ছায়া করে ছড়ানো বিরাট লাউমাচা। তার নিচে তাকাতেই শশাঙ্কতিলকের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল।

বাঘাও তাকে দেখতে পেয়েছে। গলায় চেন। সামনে একটা মাটির খোদলে অনেকখানি ফেন ঢেলে দিয়ে একজন মহিলা আবার রান্নাঘরে চলে গেল।

বাঘা যেমন শুয়ে ছিল তেমনই থাকল। সামনের পা দু'খানা এগিয়ে দিয়ে তারই ওপর মুখখানা রেখেছে। চোখ একেবারে শশাঙ্কর ওপর। একদম সরাচ্ছে না। শশাঙ্কও নড়তে পারছিল না। একেবারে নবর মত শান্ত, স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে। অথচ আমরা এই ক'মাস আলাদা আলাদা হয়ে আছি।

বাড়ির ভেতর কে একজন দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এল। কাকে চাই?

আমার একটা কুকুর হারিয়েছে—

বাড়ির কর্তাই হবে লোকটি। বেশ রাশভারি গলায় বলল, সবাই এসে

তাই বলে অবশ্য। আপনি খবর পেলেন কি করে আমার বাড়িতে একটা হারানো কুকুর এসে উঠেছে?

খবর পাই নি। গলা শুনে চিনেছি। কুকুরটা আমার।

ভদ্রলোক আমল দিলেন না। এ কথা সত্যি, মাস কয়েক আগে আমি স্টেশনের কাছে দোকান বন্ধ করে ফিরছি—লাস্ট ডায়মণ্ডহারবার পাস করল—আমার সাইকেলের পেছন পেছন দেখি একটা কুকুর। আমি দিঘিতে পা ধুতে নেমেছি। দেখি ও দিব্যি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে। কিন্তু আপনার যে তার প্রমাণ কি?

ততক্ষণে পাড়ার ছেলেরা এসে জমা হয়েছে। একজন বলল, সত্যিই তো আপনার যে তার প্রমাণ কি?

আমি নাম ধরে ডাকলেই জবাব দেয় কি না দেখুন।

ছেলেরা ঘিরে দাঁড়ালো। আপনি উল্টো দিকে তাকিয়ে ডাকুন।

অনেকদিন অন্ধকার রাতে বাঘা শেয়ালের পেছনে ছুটতে ছুটতে দূরে হারিয়ে গেলে শশাঙ্ক একটা বিশেষ গলায় ডাকত। বা—আ—ঘা। ঘা-এর ওপর জোর দিয়ে থেমে পড়ত। ঠিক সেই ভাবেই ডাকল।

সঙ্গে সঙ্গে শেকলের বাঁধুনি সুদ্ধ মাটিতে বসানো বাঁশের ছোট খুটো উপড়ে নিয়ে বাঘা ছেলেদের ভিড়টা ছটকে একেবারে শশাঙ্কর পায়ের ওপর এসে পড়ল। ক'মাস দেখা নেই। গায়ের গন্ধ অন্যরকম হয়ে গেছে। বাঘারও তাই মনে হচ্ছিল। এই লোকটার গায়ে সে সাদা লম্বা হাড়ের গন্ধ পেত। কিন্তু এত মায়া পড়ে গেল। তাই একদিনও কামড়াতে পারে নি। দু'পা বুকের কাছে তুলে দিয়ে লোকটার কোমরে, বুকে মাথা ঘষতে লাগল।

কারও কিছু বলার রইল না। বাড়ির কর্তাই হবে—শশাঙ্কর দিকে চুপ করে তাকিয়ে আছেন। বাড়ির মেয়েরাও দোতলার বারান্দায় রান্নাঘরের বাইরে জোট পাকিয়ে তাকিয়ে আছে। শশাঙ্ক বাঘার মাথায় থাবড়ে আদর করেও শান্ত করতে পারে না। কতদিন পরে—

আমার নাম সাধন দত্ত। স্টেশনে আমার রেশন-শপ আছে। টেলরিংয়ের দোকান আছে। আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করব?

শশাঙ্ক তাকিয়ে থাকল।

আমার এক ছেলে কথা বলতে পারে না। একখানা হাত বাড়েনি।

বাবলু আপনার এই কুকুরকে মানুষ করেছে এই কমাস। প্রথম এসে তো বাবলুর একখানা শাল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল। ওই দেখুন দোতলায়—

শশাঙ্ক চোখ তুলে তাকালো। দোতলার বারান্দায় বছর ষোল সতেরোর একটি ছেলে দাঁড়ানো। ধুতি পেঁচিয়ে পরেছে। খালি গা। হাতে একখানা কঞ্চি। বাঘাও থেমে গিয়ে সেদিকে মুখ তুলে তাকালো।

আপনি যদি আপনার বাঘাকে রেখে যেতেন। ও ঠিক আপনাকে ভুলে যাবে একদিন। বাবলু বক্স ক্যামেরায় ওর ছবি তুলেছে। দেখবেন?

শশাঙ্ক কোন জবাব দিল না। চোখের ইশারায় ছেলেটিকে নেমে আসতে বলল। দোতলা থেকেই বাবলু মাথা নেড়ে জানালো, সে এখন এই অবস্থায় নিচে যাবে না।

আপনি যদি কথাটা রাখেন—

আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনারা বাঘাকে খাইয়েছেন—দেখাশুনো করেছেন—আমি যে কি কৃতজ্ঞ!

পাড়ার ছেলেরা মুখিয়েই ছিল। লম্বা মত একজন বলল, এ ক'মাস তো আপনার খাওয়াতে হয় নি বাঘাকে। একটা খরচ তো বেঁচে গেল—

কথা কোন্‌দিকে যাবে শশাঙ্ক বুঝতে পারছিল না। আন্দাজে বলল, তা বটেই তো—

তবে টাকা ছাড়ুন। টাকাটা বাবলুকে দেবেন। ওই মানুষ করছিল—

দোতলায় তাকিয়ে বুঝলো, এ আলোচনায় বাবলু নেই। সে ওপর থেকে নিঃশব্দে বাঘার দিকে তাকানো। সেই দৃষ্টির নিচে পড়ে দ্বিধাগ্রস্ত বাঘা কান খাড়া করে দিঘির দিকে তাকাচ্ছে একবার—একবার লেজ তুলছে। বাড়ির কর্তা পেছন ফিরেছেন। ভেতরে যাবেন।

সেই ছেলেটাই বলল, জানেন ওর মা নেই। এখন যদি একটা শক খায় মনে—তার দায়ী হবেন আপনি?

কত টাকা লাগবে? বুঝতেই পারছিল, এ-টাকা বাবলুর হাতে পৌঁছবে না।

তোরা বলে দে না। একটু বুঝসমঝ করে বলিস্। এই নন্তু বল না—

একজন বেঁটে মত ছেলে বলল, পঞ্চাশ দেবেন—

আমার কাছে পঁচিশ আছে। ফেরার দু'টো টাকা রেখে বাকিটা আমি

দিয়ে যাচ্ছি—

সেই বেঁটে ছেলেটা বলল, না। হবে না।

কেন ওরকম করছিস ভাই। যা দিচ্ছেন নিয়ে নে। সেই লম্বা ছেলেটিই এগিয়ে এল। আপনার কুকুর আপনি যা খুশি ধরে দেবেন—

দিতেই টাকা কোমরে গুঁজে ছেলেটা বলল, একটা রিক্সা ডেকে দেব?

না না দরকার নেই কোন। আসলে শশাঙ্ক বা বাঘা কেউই বাবলুর নিঃশব্দ দৃষ্টির নিচে পড়ে টিঁকতে পারছিল না। এই তো এগোলেই বড় রাস্তা—

ছেলেগুলো তবু খানিকটা এগিয়ে দিল। ওদেরও এখন ফেরার মুড্। হাতে নগদ তেইশটি টাকা। ওরা ফিরেই যাচ্ছিল। ওদেরই একজনকে ডাকলো শশাঙ্ক। বাবলুকে বলবে—আমি মাঝে মাঝে এসে বাঘাকে দেখিয়ে নিয়ে যাব। বাবলুও যেতে পারে। দু'টো স্টেশন তো মোটে—নেমেই লেভেলক্রসিং পেরিয়ে দশ-বারো মিনিটের পথ। তোমরা বাবুলকে নিয়ে যেতে পারবে না?

হ্যাঁ হ্যাঁ খুব পারব। আপনি এখন এগোন।

ছেলেগুলো আর দাঁড়াল না। ভাগ্যিস গাছপালার আড়ালে বাবলুদের বাড়ি। বাবলু, আমি, বাঘা—তিনজন আলাদা প্রাণ।

আগে আগে বাঘা ছুটছে। কোমরটা আগের চেয়ে অনেক পাতলা হয়ে গেছে। ক্রিমি মারার ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় নি ক'মাস। কাল রাতের রং চটানো লাইটপোস্টটা এসে গেল। এখন সূর্য রাস্তার দু' ধারে গাছের আড়ালে পড়ে থাকায় ছায়া খুব ঠাণ্ডা। দু'ধারে বনঝালের ঝোপ। বাঘার হাড়ের অ্যারেঞ্জমেণ্ট এমনি যে, দুলকি চালে ছুটবার ফলে ছিপছিপে পিঠের ওপর দিয়ে বোঝাই যাচ্ছে—ওর শরীরটা কোন্ নিয়মে এগোচ্ছে। এ রাস্তা যে তাকে আসলে কোন্ জন্মে নিয়ে যাওয়ার, শশাঙ্কতিলক তা আদৌ ধরতে পারল না। বাঘার এখন আর কোন দ্বিধাই নেই।

যুদ্ধ

দ্বারিকপোতার জমি বড় আশ্চর্য। পৌষধান ওঠার পর সেখানটা খা খা করে। লঙ্কা, বরবটি, শিম কোনোটা লাগাবার উপায় নেই। কারণ, কাছাকাছি কোথাও জল নেই। উপরন্তু ছাড়া-গরুর উপদ্রব। বর্ষাকালে আরও কাহিল অবস্থা। কষ্টেসৃষ্টে ধান লাগাবার মাসখানেক পরে বৃষ্টি একটু জোর নামলেই আগাগোড়া ডুবে সমুদ্র হয়ে যাবে। জোর বাতাস উঠলে তখন ঢেউ খেলে বাদায়। হাজরা নস্কর তখন দ্বারিকপোতার লাগোয়া তাদের মিস্ত্রী-পাড়ার উঠোনে বসে ফি-বছরের মত একই ছবি দেখে। বহু খাটা খাটুনি করে লাগানো ধানচারাগুলো সবে বলকারী হয়ে উঠেছিল। নিড়েনের সময় আসতে না আসতেই জলে ডুবে গেল। যদি এক আঙুলও বেরিয়ে থাকত—তাহলেও ধানচারাগুলো জলের ওপরের আলো খেয়ে খেয়ে বেঁচে যেত। মাসখানেক পরেও জল নামলে বিঘে চারেকের এই ভাগচাষের একটা হিল্লে হয়ে যেত। রোজ রাতে শুয়ে শুয়ে পচা ধচা গোলপাতার ছাউনির ওপর বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ শুনতে শুনতে ভাবে—কাল সকাল থেকে আকাশ যদি জিরেন দেয়—তবে চাইকি ক'দিনের ভেতর জল নেমে গিয়ে চাষটা বাঁচে।

কিন্তু জল নামার কোন লক্ষণই নেই। দ্বারিকপোতা এদিকে সবচেয়ে নীচু জায়গা। চারদিককার জল এখানে এসেই নামে। তাই ডুবলে সবার আগে ডোবে। আশ্বিন মাসের শেষাশেষি বট অশ্বত্থের মরা ডালেও জল লেগে নতুন পাতা বেরোয়। তখন সারা মাঠে এমন এক আলো বেরোয় যাতে সবার মনেই আশা জাগে। কিন্তু দ্বারিকপোতায় তখনো বেশ জল থাকে।

নিকাশী খাল একটা কেটেছিল সরকার। কিন্তু ঠিকাদারগুলো জালিয়াত।

খাতায় দেখালো কয়েক লাখ মাটি। কিন্তু আসলে দু'চারলাখের বেশী মাটি কাটালো না। কলকাতায় অফিস কাছারিতে বসে দেনা পাওনা ঠিক হয়ে গেল। হাজরার মত মানুষ মারা পড়ল।

জঙ্গল হাসিল করে এই আবাদ। কে এক দ্বারিকবাবু হাজরার জ্ঞান বয়সের অনেক অনেক আগে এখানে চাষবাসের পত্তন করেন। তাঁর নামেই জায়গার নাম। তাঁদের বংশপরম্পরায় শরিক—তস্য শরিকে ভাগ হয়ে হয়ে হাত বদলের পর এই চার পাঁচশো বিঘের মালিকানা এখন নানান টুকরোয় ছড়ানো। হাজরা জানে, মালিকানা তো পালটাবেই, জমি শুধু তার জায়গাতেই থাকে।

পৌষমাসে অন্য মাঠের চাষীরা যখন ঝুমঝুম মলের আওয়াজ তুলে শুকনো পাকা ধানের বোঝা মাথায় করে আছড়াবে বলে খামারে ফেলে—ঝরে পড়া পুষ্ট ফলধান পরের বর্ষায় বীজ করবে বলে সযত্নে তুলে রাখে—তখন হাজরা নস্কর একবেলাতেই চারবিঘের ন্যাড়ান্যাড়া কয়েক আঁটি খড় কাটতে মাঠে নামে। পোকায় কাটা সামান্য কিছু ধান জোটে। জল নামার পর যে ক'টা গোছ বেঁচে ছিল--তারই সামান্য ফসল। তারও আবার ভাগ আছে।

মালিক জলিল গাজি। তিনি ভাগ দিতে গেলেও নেবেন না। কারণ, ভাগচাষী বোর্ডে প্রমাণ করাতে চান—চাষী হাজরা নস্কর একটি অপদার্থ। চাষে মন নেই। ধান ফলে না। যেটুকু ফলে তার ভাগ দেয় না। এই বলে তিনি হাজরাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চান, করে নিজে চাষ করবেন।

হাজরা মিথ্যেবাদী নয়। যা ফলেছে তার ভাগ দিতে চায়। কিন্তু মালিক নেবে না। নতুন আইনে খুব কড়াকড়ি। ভাগের ধান মালিককে বুঝিয়ে দিয়ে যদি একখানা রসিদ পায়—তাহলে সেই রসিদের বলে ভাগচাষী হিসেবে নাম রেকর্ড করাতে পারে। তখন জমি থেকে তাকে কে সরায়! তাহলে হাজরা নস্কর একরকম পাকাপাকি রায়ত হয়ে যায়। চাইকি কোনদিন সরকারের ঘরে খাজনা জমা দিয়ে দাখিলা কেটে নেওয়ার অধিকারও তার ওপর বর্তাতে পারে। এমনকিছু আকাশকুসুম নয়। এমন ব্যাপার তো অনেক জায়গাতেই ঘটেছে।

তার কপাল মন্দ তাই হচ্ছেনা। হালের বলদ নেই। একটা এঁড়ে

পুষছে। সেটা এখন বেশ বড় হয়েছে। তার লাগদার আরেকটি বলদ হলেই হাল জুড়তে পারে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠছে না। হলে কিন্তু চেয়ে চিন্তে আরও জমি যোগাড় করতে পারত। দুটো ধান আনত ঘরে। এভাবে দোরে দোরে জন খেটে সংসার নিয়ে খাবি খেতে হত না।

তার মালিক জলিল গাজির বয়স বেশী নয়। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। লোহা সিমেন্টের দোকান আছে বাজারে। রমজানের ঈদে একবার উট জবাই করেছিল। সে সময় কাঁচের প্লেট গ্লাস দপ্তরখানায় বিছিয়ে দিয়ে মেহমানদের দাওয়াত দিয়েছিল। নিজচাষে ছত্রিশ বিঘে জমি আছে। বাড়ির ভেতর একটা টিউবয়েল—বাইরে একটা টিউবয়েল। তিনটে দিঘি ছাড়াও একখানা লরি আছে। সারা বাজারের হয়ে সে-লরি মঙ্গল আর শনিতে শেয়ালদায় গস্ত করতে যায়। মণ প্রতি ভাড়া দু'টাকা। নিজে পার্টি করে। ভোট এলে পাড়ায় পাড়ায় মিটিং-এ যায়। খরার সময় ঠিকেদারি নিয়ে দূরে দূরে রাস্তা বানায়। কালভার্ট বানায়।

হাজরা তার দোকানে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে বলেছে, বাবু, অভাবী মানুষ আমি। পেটের জ্বালায় ধানটা খেয়ে ফেলব। আপনার ভাগ আপনি নিয়ে নিন—আমায় একখানা রসিদ দিন।

জলিল গাজি হাজরার চেয়ে সামান্য কিছু ছোট হবে বয়সে। হেসে বলেছে, ও ধান তুমি রাখো। আরও দু'বস্তা ধান নিয়ে গিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে এই বর্ষাটা পেটভরে খাওয়া দাওয়া কর। গায়ে তাগদ করে আমার রাস্তার কাজে লেগে যাও। দিন গেলি চার টাকা কোমরে গুঁজে বাড়ি ফেরবা। ও জমি তুমি ছেড়ে দাও নস্কর। আমার পাম্প আছে। লোক আছে। আমি চাষ করে দু'টো ধান পাই।

হাজরা গলেনি। ভাগের ধানও ভাঙেনি। গাঁয়ের মাতব্বরদের বলেছে। অন্য সব পার্টির দাদাদের বলেছে। তাদের পরামর্শ: বিনে রসিদে ধান দিও না। দরকার হলে আমরা জে.এল.আর. ও অফিসে যাব। গাজি তোমার জমি ছাড়াতে পারবে না।

খাবার ধান নেই। অথচ ঘরে মালিকের ভাগের ধান। ভাঙা যাবে না।

এক এঁড়েতে হাল চলে না। যতক্ষণ না আরেকটা হচ্ছে ততক্ষণ ওকে বসিয়ে খাওয়াতে হবে।

হাজরার হাসি পায়। তার অবস্থা ঠিক দ্বারিকপোতার মত। জায়গা

আছে, ফলে না। বর্ষায় সমুদ্র। খোরোকালে খটখটে ডাঙা।

এক ভরসা পুকুর ভরতি মাছ। আর খালের মোচা চিংড়ি, আর যেমন ট্যাংরা, ধান্যেপুঁটি, শোল, শাল, শিঙি, মাগুর, বাইন, ন্যাদোস, তাছাড়া কিছু কাঁকড়া। কখনো সখনো দু'একটা কচ্ছপ। কিন্তু তাও ভাগ্যে নেই। তার জাল নেই। একগাছি যা আছে—তাতে লোহার কাঠি পরানো দরকার। একসঙ্গে দু'কেজি কাঠির দাম বারো টাকা পাবে কোথায়? খালে পাটা মেরে যে মাছ ধরবে তারও উপায় নেই। অন্ততঃ তিনখানা পাটা কিনতে একসঙ্গে তিরিশ-বত্রিশ টাকা চাই। তাতে একটা মরা মানুষের চিকিৎসা হয়ে যায়।

টিউবয়েল বসায় ঝোড়ো। তার তেমন কাজ নেই। সে একটা পরামর্শ দিল। ব্যাঙ ধরে আন, আমি কিনে নেব।

এই ফাগুন মাসে ব্যাঙ পাব কোথায়?

দেবতা চমকাবে—তারপর ব্যাঙ ধরবি—সেদিন আর নেই।

ঝোড়ো কিছু শহর ঘেঁষা লোক। রেল স্টেশনের দোকানে বসে চা গেলে। চারদিকে টিউবয়েল বসিয়ে বেড়ায়। এবার তেমন কাজ নেই। ওর কথাটা মনে লাগল। বেশ কিছুকাল এখানকার দু'চার জন ব্যাঙের আড়ত করেছে। সেখানে সকালবেলা জ্যান্ত ব্যাঙের পেছনের দু'খানা পা কেটে রেখে বাকীটা ফেলে দেওয়া হয়। তারপর ধোওয়া-ধুয়ি করে ঠ্যাংগুলো বরফচাপা দিয়ে কলকাতায় চালান যায়।

ঘরে তার মন বসে না। একদিন ভালো উপায় হলে বউ তার পান্তা, গরম, বাসী করে চালের আণ্ডিল নষ্ট করবে। অথচ আয় করে পয়সা তো আর অন্য জায়গায় রাখা যায় না। মাঝের থেকে লাভ—দুটো ছেলে একটা মেয়ে মাসের মধ্যে বিশদিন কোনক্রমে একবেলা খেয়ে থাকে। গরিব ঘরে যে বুঝে চলবে তেমন বউ পায়নি হাজরা।

একই উঠোনে আর দুই ভায়ের ঘর। সে বড়। পরের ভাই বজরা কোত্থেকে ভাগিয়ে এনে বিয়ে করেছিল। সে বউ বিষ খেয়ে মরতেই আবার বিয়ে বসেছে। দিনে তাস পেটায়—রাতে তার কাটে। ছোট ভাইটা ভাল। ঘটির সঙ্গে বিধবা মা থাকে। ঘটির বয়স বছর ষোল। মাকে গরু দুয়ে দেয়—মা দুধ বেচে। ঘটি নিজে তিনটে তালগাছ কাটে। তার রস বিক্রি হয়, গুড় হয়। নিজে তাড়ি করে খায়—দাদাদের দেয়। মরসুমে খেজুরগাছও কাটে। হাজরাও দুটো তালগাছ কাটে। গাঁয়ের মাথায়

বর্ষাকালের মেঘ ঝুলে পড়লে সব ভাই ঘরে ফিরে আসে। যে-যার বারান্দায় বসে তখন কথা বলে। সুখ দুঃখের, ঝগড়ার—। কখনো নিন্দের। ক্বচিৎ প্রশংসার।

এইভাবে থানা রায়পুর, গ্রাম মিস্ত্রীপাড়া, রেলস্টেশন বন্দীপুর, ব্লক দেকাঠির ৺খগেন নস্করের তিন ছেলের জীবন কেটে যাচ্ছিল। তার ভেতর হাজরা নস্কর নতুন কাজে নেমে জীবনে প্রথম পয়সার মুখ দেখলো। যার জীবনে কোনদিন হাসি ছিল না—সে এখন দুপুরে ঘুমোয়। সন্ধ্যের ঘোরে তালগাছের মোচ কেটে কলসী বসায়। সারাদিনের জমানো তাড়িটুকু নামিয়ে উঠোনের দিকে তাকিয়ে বসে চুক চুক করে খায়। ক'গ্লাসের পর ঘরের ভেতর তাকিয়ে বউকে হাঁক পাড়ে। বেস্পতি। যন্তর দে—

খুব সাধারণ জিনিসের যন্তর। একখানা ভালো কঞ্চির শক্ত ছিপ। তাতে আড় বঁড়শি লাগানো। কাপড়ের দোকান থেকে আনা একটা পলিথিনের মোড়ক। নারকেল মালা চাপা দেওয়া একটা গুড়ের কলসী। হ্যারিকেন একটা। আরেকখানা দা। ট্রেনে ফিরি হয়—আগুন ধরানোর ছ'আনা দামের পাথর। বিড়ির কৌটো। ব্যাস!

বেস্পতি সুশনি শাকের তরকারি করেছিল। সঙ্গে নুন আর ভাত। ডাবা হাড়িতে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে খেয়ে নিচ্ছিল হাজরা। সন্ধ্যে রাতেই রেল লাইন ধরে বেরিয়ে পড়তে পারলে অনেকটা পথ কাবার করা যাবে। এখনো তো টোপই যোগাড় হয়নি। অবিশ্যি সেজন্য কোন ভাবনা নেই। এই বন্দীপুর স্টেশনের বাজার এলাকায় যে-দোকানেই যাবে—দোকানদার নিজেই তাকে খাতির করে গোলার ঘর খুলে দেবে। হাজরা তখন আলুর বস্তা হোক, মসল্লার গুদাম হোক—কিংবা কেরোসিনের আড়ত হোক—হামা দিয়ে অন্ধকারে ঢুকে যাবে। তারপর যেখানে যত আরশোলা পাবে কপাকপ ধরবে আর পলিথিনের ব্যাগে পুরবে। এই হল তার ব্যাঙ ধরার টোপ। দোকানদাররা খুশী। আরশোলা কোতলের এমন মাগনা যন্ত্র কোথায় পাবে?

ব্যাঙধরা বড় নেশা। বলা ভাল পয়সার নেশা। টপাটপ ধরে কলসী বোঝাই করে ভোর ভোর ফিরতে পারলে চাই কি বারো চোদ্দ টাকাও রাত ফুরোলে রোজগার হয়। সাহেব মেমেদের ঘেন্না পিত্তি নেই। এমন বন বাদাড়ের জিনিসও খায় কে জানতো! আর কেজি পিছু দরও চড়ছে রোজ রোজ। ব্যাঙ নাকি ফুরিয়ে যাচ্ছে—তাই।

এ তাড়াহুড়োর কাজ নয়। ঘাসের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে এসেছিল হাজরা। লালাজির ইটখোলা পার হলেই রেল লাইনের দু'ধারে শুধু অন্ধকার। তখন হ্যারিকেনটা উসকে নিল। জোলো ঘাসের আড়ালে আড়ালে গর্ত করে ব্যাঙ বাসা করে থাকে। মেঘ ডাকলে তবে জানান দেয়। নয়ত নয়। রাত বাড়লে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেরোবে। কতরকমের খুচরো সব পোকা থাকে ঘাসে। সেগুলো থপ থপ করে খুঁজে বেড়াবে। নয়ত ঘাপটি মেরে বসে থাকবে।

যত রাত বাড়ে সংসার তার কাছে তত পরিষ্কার লাগে। গাঁ গঞ্জের মানুষজন সন্ধ্যের পর বিশেষ জেগে থাকে না। ওঠে ভোর ভোর। এক এক তল্লাট তখন তার জন্য ছবির মত পড়ে থাকে। সে ব্যাঙ ধরতে বেরিয়ে হ্যারিকেন তুলে তুলে সেসব জায়গা দেখে। গোলাবাড়ি। পুকুর ঘাট। কলাবাগান। উঠোন। ধানের গাদা। পোকাপড়া গাই অন্ধকার আকাশের নীচে একঠায় দাঁড়িয়ে অনবরত লেজের ঝাপটায় মশা তাড়াচ্ছে। তার এইসব দেখার সময় অন্য কেউ থাকে না। দিনের বেলা ট্রেনে যাওয়ার সময় এসব জায়গা চোখে পড়েছে—কিন্তু তখন এখনকার মত তন্ন তন্ন করে দেখা হয়নি।

কালকেপুরের রেলপুকুর পেরিয়ে টিনের চালতোলা ঘর পড়ল পথে। গোয়াল ঘরের বাইরে দু'জোড়া হাল জোয়াল। নিশ্চয় ষোল ষোল খেই বত্রিশ বিঘের চাষ। পরিশ্রমী চাষী একখানা হালে এক মরসুমে ষোল বিঘে জমি কাড়ায় নিশ্চয়। এখন ধানের দর ভাল যাচ্ছে। ভাগের ধানটা বেচে দিয়ে একটা তাগড়াই এঁড়ে বাছুর কেনা যেত। কিন্তু জলিল গাজি তাকে ঝুলিয়ে রেখেছে।

স্কুলবাড়ি মন্দির কামারশালা ক্লাবঘর—কত যে সে এই ক'মাস দেখল দিনের বেলায় এমন নির্বিঘ্নে দেখা যায় না। এখন বেশ পরিষ্কার সব দেখা যায়; সে চোর নয়। হাতের হ্যারিকেনে আলো জ্বলে। ডাকাত নয়! সঙ্গে সম্বল একখানা হাত-দা মাত্র।

হাজরা রোজ নিশুতি রাতে সারা পৃথিবীর একটা আন্দাজ পায়। তখন তার দেখে বেড়ানোর পথে কোন বাধা নেই। ইটখোলা ছাড়িয়ে ভিমরুলতলা। এখানে নাকি বিরাট ভিমরুলের চাক ছিল এই বট গাছে। তিনজন সাহেব রেললাইন বসাতে এসে বাবা পঞ্চাননের দাস ভিমরুলের দঙ্গলকে ক্ষেপিয়েছিল। তখনকার সাহেবরা নাকি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে

বেড়াত। ঘোড়া ছুটিয়েও পার পায়নি সাহেবরা। ভিমরুলের কামড়ে জ্বর—শেষে ভুল বকে মরে যাওয়ার দশা। ইংরেজের রেল কোম্পানি পঞ্চাননতলায় পুজো দিয়ে তবে রেল লাইন বসাতে পেরেছিল। এসব কথা এখানকার সবাই জানে। সে-ভিমরুলের চাক এতদিন থাকার কথা নয়। বটগাছটা পড়ে আছে। সামনেই সাহেবপুরের মাঠ।

হ্যারিকেনটা লেজের মত ঝুলিয়ে হাঁটতে হচ্ছিল। কাদায় মাটি ওগলানো জায়গা দেখলেই হাজরা দাঁড়িয়ে পড়ে। মাটির চেহারা সাবুদানার মত হলে বুঝতে হবে—এসব মনি কেঁচোর কাণ্ড। মাছের টোপে এই কেঁচো কেটে কেটে বঁড়শিতে গেঁথে দিতে পারলে মৃগেল ধরা দেবেই।

আউলিয়াপুরের মোড়লদের বড়দিঘির বকচরে অনেক কলাগাছ। বেশী রাতে জ্যোৎস্না বেরিয়েছে ফুটফুটে। সঙ্গে দক্ষিণে বাতাস। সে-বাতাসে কলাপাতার বেশির ভাগই ছিঁড়ে ফালি ফালি হয়ে যাচ্ছিল। বাঁধানো ঘাট। তাতে তিজেল হাঁড়ি গোটা দুই ডোবানো। অনন্ত মোড়লের সংসার বিরাট। দু'পক্ষের হিসেব ধরলে কম করেও জনা তিরিশেক লোক। কলাগাছের শুকনো বাসনা সরিয়ে হ্যারিকেন নামালো। গর্তের চেহারাটা চেনা চেনা। এরকম জায়গাতেই ব্যাঙ থাকে। ভাগ্য ভাল হলে এক সঙ্গে দু'তিনটেও বেরিয়ে পড়ে। কাঁধের ছিপটা নামিয়ে কোমরের ব্যাগ থেকে একটা বড় সাইজের আরশোলা তুলে নিয়ে গেঁথে ফেলল। তার পর ঠিক আন্দাজ মত গর্তের মুখে ছেড়ে দিতেই জখম আরশোলাটা গর্ত পেয়ে পাতালের ভেতর নেমে গেল। সময়টা বড় সুন্দর। এমন মিহি বাতাস। এমন খুনখুনে জ্যোৎস্না। শুধু মোড়লদের কুকুরটা যা-কিছু চেঁচাচ্ছে। আরশোলাটা এখন অনেকক্ষণ ধরে মাটির ভেতরের অন্ধকার গর্তে মাথা খুঁড়বে। তারপর একসময় এ-গলি সে-গলি করে আসল গর্তে গিয়ে পড়বে। সেখানে ছানা পোনা নিয়ে ব্যাঙের সংসার।

বাইরে মাটির ওপরে মোড়লদের গোয়ালঘরে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। মাঝে মাঝেই দড়িবাঁধা গরু কান লটপট করে মশা তাড়াচ্ছিল। উত্তর দিকে ঢেঁকিঘর। তার পাশেই ধানের গোলা। গোলার মাথায় টিনের পরী এক পা শূন্যে তুলে উত্তরে উড়ে চলেছে। কাল কোনো ব্রত ছিল বাড়ির মেয়েদের। উঠোনের কোণে মাটির ঘট, তাতে জল, জলে টগর ফুল ডোবানো। উঠোনের মাটি খুবলে দুধ ঢালা হয়েছিল বোধহয়। এ-বাড়িতে কোন

আইবুড়ো মেয়ে আছে নিশ্চয়। অনন্ত মোড়লের প্রথম পক্ষের বড় নাতনী নয়ত? হাজরা মনে মনে একটা অঙ্ক কষে দেখল। হ্যাঁ। এতদিনে বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। হাজরা তাকে একসময় খুকিটি দেখেছে।

এখান থেকে বাদার ভেতর দিয়ে সোজা হেঁটে গিয়ে পিচ রাস্তায় পড়লে দশঘরা গ্রাম। এপথে সোজা গেলে একঘর ব্রাহ্মণ, তিনঘর কায়স্থ, ষোলঘর মোড়লের বসতবাড়ি পড়বে। এর ভেতর অনন্ত মোড়লের কলাবাগানই সবচেয়ে পর্যাপ্ত। অনন্তর মত ভাল চাষীও এদিকটায় কম। গোড়ায় অনন্তর জমি জায়গা, হালবলদ কিছুই ছিল না। এখন আস্তে আস্তে তার সংসারটা ষোলকলায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

আরশোলাটা অনেকক্ষণ পাতালে গেছে। এখনো ওপরে ওঠার নাম নেই।

মাটির দেওয়ালের গায়ে হাল জোয়াল, হাতসুদ্ধ ঠেসান দিয়ে দাঁড় করানো। মোটা মোটা বাবলা গাছ কেটে নিয়ে হালের কাঠ তৈরি করেছে অনন্ত। এখানকার কামারশালার তৈরী বড় একখানা ফলা—হাজরা দেখল—অনন্ত মোড়ল খুলে রেখেছে। আগে তো চোখে পড়েনি। হয়ত গরু জখম হচ্ছে ফলার দোষে—তাই খুলেছে অনন্ত—কামারশালায় পাঠাবে।

যদি ভাই দু'টো তার কথা শুনতো—তাহলে দাঁতে কামড় দিয়ে একবার চাষ করে দেখত হাজরা। তার সংসারও ফুলে ফেঁপে উঠতে পারত। এই বেশ ভাল। বেঁচে থাক ব্যাঙ। রোদে বেরোতে হয় না। রাতে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাজ। ভাত খেয়ে সারাদিন গড়াও। এ হল গিয়ে ব্যবসা। নিজের মালিক নিজে।

এই সময়টা তার বড় ভাল লাগে। এখন সে কত দেশ দেখতে পায়। এক একদিন কত দূর দূর চলে যায় ব্যাঙের খোঁজে। একবার ব্রহ্মডাঙায় গিয়ে চোর বলে ধরা পড়ছিল। ভাগ্য ভাল সে-গাঁয়ে হারান রায়ের বড় খুকির বিয়ে হয়েছিল। সে বেরিয়ে এসে হাজরাকে দেখিয়ে বলেছিল, আমার বাপের বাড়ির দেশের লোক। মেরো না বলছি—

এখন তার মন বলে, সব দেশে এমন চেনা জানা মানুষ আছে তার। এই পৃথিবীটাই তো তার চেনা হয়ে গেল এই ক'মাসে। বড় বড় মাঠের ভেতর দিয়ে নিশুতি রাতে ব্যাঙের লোভে লোভে ঘুরতে গিয়ে কত জিনিস যে সে দেখছে। দিনের বেলায় যেসব জিনিস খুব জরুরী মনে হবে—রাতের

বেলায় তা কেমন অর্থহীন হয়ে পড়ে। এক একজন নিজের নিজের জমির আল দিয়েছে। তাতে ঢোল কলমির ডাল বসানো। মাথার ওপর চাঁদ, তারা চোখ মেলে সব দেখে যাচ্ছে। সেখানে দখল রাখা এই আল-চিহ্ন কিংবা ঢোল কলমি বসিয়ে নিরিখ ঠিক রাখার চেষ্টা নেহাত খোকাপনা। রাতে না ঘুরলে এসব কোনদিন সে টের পেত না।

আজ অনন্তর বাড়ি খুব খাওয়া দাওয়া হয়েছে। জ্যোৎস্নার ভেতর বসে একজোড়া ধাড়ি বিড়াল কুচুর কুচুর করে এঁটোকাঁটা খেয়েই চলেছে। বঁড়শিতে টান পড়তেই হাজরা সাবধান হয়ে গেল। গেঁথে গেলে ব্যাঙ ঠিক ওপরে উঠে আসবে। এলো তাই। আস্তে ছিপ সুদ্ধ উঁচু করে ব্যাঙটাকে শূন্যে তুলল। প্রায় হাফ কেজি হবে। তারপর আলগোছে বঁড়শি ছাড়িয়ে ব্যাঙটাকে চিৎ করে রেখে দিল। কালচে চামড়ার ওপর আধো অন্ধকারে মুখের কাছে আরও কালো রং বেরিয়ে এসে লেগে গেল।

আরে-ব্বাস! আরও একটা বড় ব্যাঙ তড়াক করে গর্ত থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল। এ কি ভাগ্য! কাল বন্দীপুর স্টেশনের লেভেল ক্রসিং-এ সবাই দেখতে পাবে—দুলে দুলে একটা লোক পূবের রেল লাইন ধরে এগিয়ে আসছে। গালে দাড়ি। কাঁধে ছিপ। ডান হাতে দা। কোমরে কলসী—পলিথিনের ব্যাগ। বাঁ হাতে নেভানো হ্যারিকেন। মুখ দেখলেই বোঝা যাবে—এ দিনের বেলার লোক নয়। চোখের নীচে কালি। মুখ ভরতি হাসি। তখন হাজরা রেলের পথটি ধরে দুলে দুলে চলে আসবে বন্দীপুর বাজারে। পঞ্চাননের ব্যাঙ আড়তে। সেখানে সোনা ও কোলা ব্যাঙ—উভয় প্রকারই ক্রয় করা হয়। ঝোড়ো তার সাইনবোর্ডে সবই লিখে দিয়েছে। সন্ধ্যে হলে তাতে ডুম জ্বলে। নেভে। জ্বলে—

টপ করে চিৎ করানো প্রথম ব্যাঙটা কলসীতে পুরে নারকেল মালা চাপা দিল হাজরা। কিন্তু আরেকটা গেল কোনদিকে। মেটে জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে একদলা অন্ধকার লাফাতে লাফাতে গোয়ালের কোণে চলে গেল। কলসীর ভেতরের গুলো ছোট ছোট লম্ফ দিয়ে নারকেল মালা খুলে ফেলতে চাইছে। ভেতরে বাতাস নেই। হাজরা জানে, খানিক পরেই ওরা আপনা-আপনি ঝিমিয়ে পড়বে।

হাজরা হ্যারিকেন উসকে সেদিকেই গেল। আরেকটু হলেই ধরে ফেলত। ব্যাঙটা বুঝতে পেরেছে। ওইটুকু মাথায় কত যে বুদ্ধি ধরে! ধরতে

ধরতে পারল না। আবার ফসকে গেল। হাজরা উবু হয়ে যেই হাত বাড়িয়েছে—অমনি গোয়ালের মোটা তালকাঠের গুড়ির ওপাশ থেকে একটা কালো বিদ্যুৎ বেঁকে মাথাটা উঁচু করে দাঁড়াল।

হ্যারিকেন পড়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই হাজরা উঠে দাঁড়াল।

মাথায় খড়ম। লাল কেরোসিনের আলো। সব পরিষ্কার দেখা যায় না। সারা গা ছাই রঙের। কালান্তক যম। হাজরা নড়লেই ফস করে মাথা নামাবে। নামালে সেখানে তার পা। তাহলে আর কথা নেই। হাসা কেউটে। বেশ বয়স হয়েছে বুঝলো। উনি যে এখানে তা তো হাজরার জানা কথা নয়। মাথাটা দুলছে। সারা পৃথিবী নিশ্চুপ।

শুধু তার ভেতর—থুপ থাপ আওয়াজ হচ্ছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে নারকেল মালা পড়ে গিয়েছে। সেই সুযোগে এক একটা ব্যাঙ কলসীর ভেতর দিয়ে লম্ফ দিচ্ছে। খোলা বাতাস পেয়ে জোর হয়েছে গায়ে। কলসী থেকে এক লাফে উঠোনের মাটিতে। তার পরেই থুপ থাপ। সেই জখম ব্যাঙটাই বেরুতে পারেনি। একবার লাফিয়ে শূন্যে উঠেছিল। হাজরার বুকে লেগে আবার কলসীর ভেতরেই পড়ে গেল। গায়ে লাগতেই হাজরার বুকখানা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ব্যাঙটার মুখটা রক্তে ভিজে।

সাপের মুখ গায়ে লাগলে আরও ঠাণ্ডা লাগে নিশ্চয়। কিছু করার নেই তার এখন। হ্যারিকেন দোলাতে পারছিল না। কিছুই আশ্চর্য নয়। হয়ত আলোটাই দেখছে মন দিয়ে। নইলে সাত আটটা ব্যাঙ লাফিয়ে বেরিয়ে গেল—একটার পেছনেও ছুটলো না কেন।

বাবা পঞ্চানন। আমি মিস্ত্রীপাড়ার হাজরা নস্কর। জলিল গাজির ভাগচাষী। রেল স্টেশন বন্দীপুর। তোমার নামে মাসভোর গান দেব। কাঙালি খাওয়াব। এবার আমাকে বাঁচাও।

সাপটা একটুক্ষণ মাথা নামিয়েই আবার তুলে ধরল। এখনো রাত ভোর হতে অনেকক্ষণ দেরি। নাহলে লোকজন এগিয়ে আসত। কাছাকাছি গোয়ালের সামনেই কালো গাইটা সব বুঝতে পেরেছে। কান খাড়া করে একবার বড় চোখ দিয়ে হাজরার দিকে তাকালো। হাজরাও তাকালো। কিছু করার উপায় নেই। বাতাস বন্ধ। উঠোনের গা দিয়ে শিমের লতা গোয়ালের ছাদ বেয়ে উঠতে গিয়ে থেমে ছিল। ডগাগুলো তখনও একটু একটু কাঁপছে। অন্য গরু-বাছুর কিছু বুঝতে পারেনি। কেউ কেউ শুয়ে

ছিল। গোবর মাথামাখি অবস্থায় একটা বড় গরু চার পায়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। গেরস্থর রাখাল কোথায়? সেও কি কালঘুম ঘুমোচ্ছে? এখনই গোবর কাড়ানো দরকার।

হ্যারিকেনের আলোটুকুর ভেতর হাজরার জন্যে পৃথিবী থমকে পড়ে থাকল। সেখানে খড়ম আঁকা ছোট্ট ফণা সিধে হয়ে দাঁড়ানো। তার এক-হাতেরও ভেতর হাজরার ডান পা। আঙুলগুলো ভোঁতা। এই ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়ার ভেতরে হাজরা টের পেল—তার ডান পায়ের লোমের ভেতর দিয়ে ঘামের ফোঁটা নীচে যাওয়ার পথ খুঁজছে। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা অবধি চুলবুল করে উঠল। তার পা এখন আর পা নেই। এবার বাঁচলে সে ঝিনুক দিয়ে পা চুলকে রক্ত তুলে ফেলবে। সে যে কি আরাম! সামনের কালো গাইটাও মশার কামড় খাচ্ছিল। কিন্তু তাই বলে লেজ একটুও নাড়াচ্ছে না। দুখানা কানই খাড়া করে রেখেছে। তার পেছনের পায়ের দেড় হাতের ভেতর সাপটা। অত বড় মাথা সুদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে সব দেখতে হচ্ছে বলে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল গরুটার। ডানচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

হাজরা সব দেখেও যেমন ছিল তেমন থাকল। গরুর গা থেকে একঝাঁক মশা উড়ে এসে তার খোলা পিঠ পেয়ে বসে গেল। হাত পেছনে পাঠাবার উপায় নেই। গোয়ালের গায়েই হাঁসের ঘর। তারা ধবধবে জ্যোৎস্না দেখে দিন বুঝি শুরু হল ভেবেছে। তাই একেবারে একসঙ্গে চাপা গলায় ঘরের ভেতর নড়াচড়া করছিল। হাঁসগুলোর জন্যে ভয় ধরে গেল হাজরার। বড় বোকা জীব। একবার তার নিজের হাঁসঘরে এমন যম ঢুকেছিল। ছোবলায়নি। কিছু করেনি। তবু একটা ধাড়ি হাঁস ভয়ে মরে যায়। না জানি এবার তার নিজের কি হয়।

হ্যারিকেনের প্রায় নীচে এসে খড়ম আঁকা মাথাটা নামালো—তারপর সাপটা নিজের গলার নীচেটা ঘাসের সঙ্গে, গোয়ালের মাটিতে সামান্য ঘষে আবার ফণা তুলে দাঁড়ালো। এবার সারা শরীরটা আগাগোড়া দেখা গেল। কাছেই কোথাও বাসা বেঁধেছে।

হপ্তা দুই আগে হাজরা নিজে ব্যাঙের গর্ত থেকে একটা সাপ গেঁথে তুলেছিল। আসলে সেটা সাপেরই গর্ত ছিল। গোড়ায় বুঝতে পারেনি। সে এখন হলফ করে বলতে পারে—সাপটাকে সে মারতে চায়নি। কিন্তু

জ্যান্ত অবস্থায় বঁড়শি কে খুলবে? নগদ দশ পয়সা দামের বঁড়শিও ফেলে দেওয়া যায় না। সাপটাকে মেরে তবে বঁড়শি বাঁচায়। সেই শাপেই কি আজ তার এই দশা।

আরও কাছে এসে দাঁড়াতে হাজরার সর্বাঙ্গ ঘেমে গেল। ডান পা-খানা থরথর করে কাঁপছিল। অবুঝ হাঁসগুলো কোক কোক করছে। পেছনে আউলিয়াপুরের মাঠ। সামনে সাহেবপুর। শেষকালে তার ভাগ্যে এই ছিল! জখম ব্যাঙটা এবারও লাফ দিয়ে হাজরার বুকে গুতো খেয়ে সেই কলসীর ভেতরেই পড়ে গেল। তার সারা শরীর ঘেমে ছিল। চোখের পলক ফেলতে পারছে না। তারই শরীরের একটা বাড়তি টুকরোর মত কোমরে ঝোলানো কলসীর ভেতর ব্যাঙটাই শুধু লাফাচ্ছে। কিন্তু থামানোর উপায় নেই।

হাজরার চোখের সামনে মিস্ত্রীপাড়ার উঠোন ভেসে উঠল। রান্নাঘরের পাশেই ছেচতলায় একটা কুমড়ো গাছ লতিয়ে উঠছে। একখানা কঞ্চি বসিয়ে দেওয়া দরকার। ঘরেব গোলপাতাও আজ দু'বছর পালটানো হয়নি। বউ যা অসাবধানী! শেষে ভাগের এক বস্তা ধান চোরে না খায়।

এখন তার আর ছোবল খেতে কোন আপত্তি নেই। মশার ঝাঁক পিঠ খুবলে খেল। ডান পায়ের কাঁপুনি থামেনি। সেখানে লোমের ভেতর সারি সারি ঘামের ফোঁটা নেমে পড়ে জায়গাটা ভিজিয়ে ফেলেছে। ছোবল খেয়ে সবচেয়ে আগে সে মাটিতে বসে পড়ে দু'হাতে মনের সুখে পা-খানা চুলকোবে। কেননা এখন তো সে জানে পর পর কি হবে। সাপে কাটা মানুষের বড় ঘুম পায়। সবচেয়ে আগে নাক বসে গিয়ে গলার আওয়াজ খোনা হয়ে যাবে। আহা! বড় আপশোস! সারা রাত ধরে দু'টো তালগাছে কলসী বোঝাই হয়ে তাড়ি জমেছে। খাবার লোক সে-ই থাকবে না। দুনিয়ায় এত রস। কচুর শাক। ওলের ডালনা। খেজুর তাড়ির সঙ্গে চিতি কাঁকড়া পুড়িয়ে খেতে কি যে লাগে! তারই নাম স্বর্গ। পাতলা করে কচু কেটে নিয়ে পোড়া পোড়া করে ভাজলে দিব্যি বিস্কুট হয়ে যায়। আর বাঁশের কোড়ের ডালনা। তার তুলনা হয় না। এখনো যদি ছোবল না দেয়—হাজরা তাহলে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে।

খুট করে আগল খুলে কে বেরিয়ে এল। কে ওখানে?

অনন্ত মোড়ল। চোখ তুলেই হাজরা গলা শুনে বুঝলো—আমি।

গেরস্থকে সঙ্গে পেয়ে কুকুরটাও বেদম চেঁচিয়ে কাছাকাছি ছুটে এল।

তাতে ফণা একটুও নড়ল না। একেবারে সামনে থেকে সব দেখে কুকুরের গলার পর্দা নেমে গেল। স্রেফ কুইকুই আওয়াজ বেরোতে লাগল তখন।

আমি কে? সাড়া দিচ্ছ না কেন? চলতে চলতে অনন্ত মোড়ল লাঙলের খোলা ফলাটা তুলে নিল হাতে। হাজরা পাশ থেকে সব দেখেও নড়ল না। শুধু বুঝল এখুনি তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারবে। কিন্তু নড়বার উপায় নেই তার। মূর্তিমান বিপদ হাজরার সামনে একেবারে বুক খুলে দাঁড়াল।

খুব চাপা গলায় বলল, ছুঁড়বেন না মোড়ল মশাই—

হাত তুলেছিল অনন্ত। আদর করব!

আমার বড় বিপদ—

রাতেভিতে গরু চুরি করতে বেরোলেই বিপদ হয়। গোয়াল থেকে গরু হাবিশ করলে ক'টা—

আপনি এসে দেখে যান। আমি গোয়ালে ঢুকিনি। আমি রায়পুর মিস্ত্রীপাড়ার ৺খগেন নস্করের ব্যাটা। আমার বড় বিপদ—

চালাকি ছাড়। এদিকে এসো—পালাবার চেষ্টা করলেই ছুঁড়বো—

যাবার উপায় নেই। দু'দিকে চোখ রাখতে গিয়ে হাজরার দুই ভ্রূর মাঝখানে টন টন করে উঠলো। আমার সামনে কি দেখুন—

অনন্তর বয়স হয়েছে। লোকচরিত্র তার অজানা নয়। ধরা পড়লে চোর জোচ্চোর পালাবার জন্যে অনেক ফন্দি বের করে। কাছে গেলে কিছু মারতে পারে। সাবধানী অনন্ত বলল, এই শেষবার—এদিক তাকাও বলছি—

উপায় নেই। কেউটে ফণা তুলে দাঁড়ালো।

শব্দ, কুকুরের ডাকে অনন্তর বড় ব্যাটা উঠে এসেছিল। টর্চ ফেলেই ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল, আরে বাবা!

কড়া আলোয় ফণা নামিয়ে নিল। তারপর কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে গোয়ালের পেছনের নালায় এঁকে বেঁকে নেমে পড়ল।

বাপ ব্যাটা এগিয়ে আসছিল। হাজরা বুঝলো এখুনি তার হাত থেকে হ্যারিকেনটা খসে পড়বে কিংবা তার আগে সে নিজেই জ্ঞান হারাবে। তাই তাড়াতাড়ি কলসীর ভেতর হাত গলিয়ে দিল। আঙুল ভিজে যাচ্ছিল। ছোট জিনিসটা খপ করে ধরেই গায়ে যত জোর ছিল সবটুকু একত্র করে কাদায় ছুঁড়ে দিল।

৺লক্ষ্মণ মিস্ত্রীর জীবন ও সময়

এই সময়টা—এই বর্ষার মুখে মুখে নোনা খালের জলে গাঙ থেকে মোচা, হরিণে, চামানে চিংড়ির খুদে খুদে ছানা ভেসে আসে। মাটি ফাটানো রোদ্দের গায়ে ঠিক এই এখনই বৃষ্টি এসে তাতানো ভাপ কেড়ে নেয়। এখন মোচা চিংড়ির ঝাঁক ধরে নিয়ে গিয়ে বাড়ির পুকুরে ফেলতে পারলে শীত নামার মুখে মুখে পাঁচ ছ'মাসের ভেতর সেসব চিংড়ি এক-একটা দেড় দু'শো গ্রামে গিয়ে দাঁড়াবে। তখন ধরে সুখ। খেয়ে সুখ। বাজারে নীলামের কাঁটায় গিয়ে ওজন করে বেচে দিয়েও সুখ। কেজি বিশ বাইশ টাকা। বাজারে পড়তে পায় না। বিদেশে চালান যায়। সেই টাকায় জালের কাঠি হবে। গইলের ছাদে টালি উঠবে।

দু'ধারে কচুরিপানার দু'টো লাইন সযুত করে ঠেসে বসিয়ে দিয়ে ঠিক মাঝখানটায় আটল সাজিয়ে লক্ষ্মণ মিস্ত্রি ওপরে উঠে এল। ইরিগেশনের খাল। একদা নৌকো চলত। এখন অবহেলায় বুক বুঁজে এসেছে। তারই গায়ে গায়ে আলে আলে ভাগ করা ধান চাষের মাঠ। যে কোন ট্রেনের জানলায় বসে যে ছবি দেখা যায় ঠিক তাই আর কি।

লক্ষ্মণ সেখান থেকেই ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে হাঁক পাড়ল, উঠে যা বললাম। উঠে যা। বলতে বলতে লক্ষ্মণ আলের দিকে তেড়ে গেল।

কি হবে? বলে শরৎ মিস্ত্রী উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল অনন্ত সর্দার। শরৎ লক্ষ্মণ মিস্ত্রীর বাপ। অনন্ত লক্ষ্মণের দু' নম্বর শ্বশুর। দু'জনই মাথা নিচু করে জয়া ধানের কচি বীজ রুয়ে যাচ্ছিল এতক্ষণ। খানিক আগেও লক্ষ্মণ মাথা হেঁট করে ওদেরই সঙ্গে রুচ্ছিল। গোবর-সার মেশানো পাঁক মাটিতে কারকিত করে কেমিকাল সার মিশিয়ে নেওয়া হয়েছে। দু'বিঘে চার কাঠা জায়গা। ভাগের জায়গা। অর্ধেক দিয়েও লক্ষ্মণের গোলায়

ভালই ওঠে। লক্ষ্মণ চাষটা জানে। ফলায় ভাল। এ তো দেশী ধানের চাষ নয়। যেমন তেমন রুয়ে দিয়ে যাত্রা গান সেরে সেই ধান কাটতে ফিরে এলাম! এ হল যত্নের জিনিস। অষ্টপ্রহর কড়া নজর রাখতে হবে।

অনন্ত লক্ষ্মণের নতুন শ্বশুর। জামাইকে ওভাবে মারমুখো হয়ে ছুটে আসতে দেখে ঘাবড়ে গেল। মারবে না তো। ভয়ে ভয়ে আলে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণ একবিঘত অন্তর তিন কলি করে ধান চারা বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরে মাটিতে বসাচ্ছিল। আর পিছু হটছিল। মাথা নিচু করে জমিতে নজর রাখতে হয়। লাইন বেঁকে না যায়। তাহলে মাসখানেক পরে নিড়েনে গোলমাল হয়ে যাবে। তখন এই তিন কলি চারা রোদ্দুরে, জলের রসে ইউরিয়া খেয়ে খেয়ে আশি কলি পর্যন্ত হবে। আরও পরে শিষ পিছু গোনাগুনতি একশো দশটা ধানের ভারে গাছ নুয়ে পড়বে। পৌষ ধানের হারাহারি বিঘেয় তিন গুণ ধান দেবে তখন।

শরৎ তার নতুন বেয়াইকে আবছা হেসে অভয় দিল, পাগল!

অনন্তর নাকের বাঁ পাশে সাদা শ্বেতীর দাগটায় রোদ পড়ে চিক চিক করে উঠল। এতক্ষণ মাথা নিচু করে রোয়ার দরুণ মুখে রক্ত এসে থানা দিয়েছে। বয়সের শুকনো মুখও ভারি থমথমে। লক্ষ্মণ এসে চেঁচিয়ে বাপকে জমি থেকে তুলে দিল, ওঠ বলছি বাবু। ওঠ। এমন ফাঁকি দিয়ে রোয় কেউ?

রোয়ার মাটি তৈরি, নিড়েন নিয়ে ছেলের এমন যত্নআত্তির বাড়াবাড়ি দেখে শরৎ মিস্ত্রি মনে মনে বেশ গর্বসুখ পায়। আলের ওপর কালো পাথরখানা দাঁড়ানো। দুই বুকে দু'থাবড়া মাংস দিয়ে ভগবান লক্ষ্মণের গায়ে পাকা হতে ঘুঁটে দিয়েছে। টানটান একমেটে কাঠামোর ধারা তার দু'ধারে দু'খানা হাত লাগানো। এই হাতে তার ছেলে দিনে দশ কাঠা একাই রুইতে পারে। এক কাহন অবধি ধান ঠ্যাঙায় একদিনে। কেউ ঘাঁটায় না তার ছেলেকে। ভয়ঙ্কর হাত চলে। দমাদম। ভয় পায় অনেকেই। সাদা চোখের ভেতর কালো মণিজোড়া এদিক ওদিক ঘুরছে অনবরত। এ ছেলের দৃষ্টি থেকে কোন জিনিস এড়াবার উপায় নেই। পাশের জমিতে তার জ্ঞাতি ভাই পঞ্চানন মিস্ত্রী হাত আল দিচ্ছিল। বর্ষায় সব জায়গায় জল ধরে রাখা যাবে। সে ভাইপোকে ধমকালো। ও কি হচ্ছে লক্ষ্মণ! কোন হায়া নেই তোর। নতুন শ্বশুরটো পর্যন্ত ডরায় তোরে! যা বলছি। যা মাছ ধরগে যা—

শরৎ জানে তাকে খুব হিংসে পাড়াপড়শীর। তাদের বাপবেটাকে কোন কিছুই কাবু করতে পারে না। জরজারি। প্রবল বৃষ্টিতে চারদিক ভাসা হলেও তাদের কোন ভয় নেই। লক্ষ্মণটা এখন যেন তার প্রায় ডাঙরডোঙর ছোট ভাইটি। পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে বিপদে আপদে। ইঁট কাটা, ধান ঝাড়া, ডাঙা জমিতে বাগান করায় শরৎ মিস্ত্রীর জোগাড়ে বল, সঙ্গী সাথী বল—সে ওই লক্ষ্মণ মিস্ত্রী। মা-মরা একটা ছেলে তার। ওই ছেলে নিয়ে সে পৃথক হয়েছিল। এখন তার বলভরসা এই লক্ষ্মণ। তা বয়স এখন বিশ বাইশ তো হবে।

এদেশে বিয়ে হয় আগে। লোকে বিয়েও করে অনেক। মান্ত মিস্ত্রীর তিন ব্যাটা—কোনো, গণেশ আর ফোকো—মোট এগারোখানা বিয়ে করেছে। একটা বউও নেই তিন ভাইয়ের। অথচ বয়স কি এমন ভাই তিনটের। তিরিশও ছাড়ায় নি। তিন ভাইয়ের এগারোখানা বউয়ের কোনোটা ছেড়ে গেছে। কোনোটা পালিয়েছে। কোনোটা পটল তুলেছে। কেউ কেউ আবার অন্যত্র বিয়ে বসেছে। এদেশে এরকমই।

গরু দুধ দেয় এখানে এক সের তিনপো। তিরিশ পেরোতেই চুল দাড়ি পাকে। আর পারলে দু'তিনটে বিয়ে করে নেয় লোকে। মাটি বা ধান কেটে ফিরে এসে ঠিক ভরদুপুরে বউ পেটানো হয়। বেদম। তাতে বউ ভাগে। নয়ত বশ হয়। কিংবা ভাল করে তেল মেখে মাথার ওপর মস্ত বড় একটা খোঁপা করে সন্ধ্যে সন্ধ্যে ধানের পোকা মারার বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়। এই হল গিয়ে এ-তল্লাটের রীতি। বেগমপুর, খেয়াদা, মগরমপুর, খাড়াপাতাল—আশপাশের দু'দশখানা গাঁয়ে এইটেই চল।

শরৎ নিজেই বিয়ে করেছে দু'খানা। তার ছেলে লক্ষ্মণেরও এই বয়সের ভেতর দু'খানা হয়ে গেল। আলে বসে নতুন বেয়াইকে একটা বিড়ি দিল। নিজে একটা ধরালো। ধরিয়ে বলল, জামাইকে ভয় পাসনে। লক্ষ্মণ আমাদের ওরকমই।

বেচারা বেয়াই তার। মেয়ে ছাড়া তিনকুলে কেউ ছিল না। অন্যত্র জন খাটতো। লক্ষ্মণই বাপকে বলল, শ্বশুরটারে নিয়ে আয়। পেটে ভাতায় থাকবে'খন। তবে ফাঁকি দিলি একদম তেইড়ে দেব।

এদেশে ফাগুনের গোড়া থেকে টানা তিনটি মাস এলোপাথাড়ি দক্ষিণে বাতাস বয়। হাওয়ার কি দাপট। তখন মেঘ দাঁড়াতে পায় না আকাশে।

তাদের ছুটে বেড়াতে হয়। কলকাতা ছোটার মুখে ইলেকট্রিক ট্রেন তার বাঁশীর সবটাই এই বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে যায়। ঘন ঘন ট্রেন। ঘন ঘন যাতায়াত। সবজি যাচ্ছে। তাড়ি যাচ্ছে। যাত্রার দল আসছে। বরযাত্রী আসছে। এস ইউ সি-র জন্মদিনের মিছিল শহীদ মিনার থেকে ফিরছে। সবই এই ট্রেনে।

শরৎ অনন্তকে হেসে বলল, ছেলেটা আমার বড় ময়াটে চটা! এই গরম। এই ঠাণ্ডা।

শরতের মুখে এখনকার হাসি একেবারে বাউল দরবেশের। মানুষটা লম্বা আছে। কাঁচাপাকা চুলদাড়ি। গোটা ছুই দাঁত না থাকায় হাসলে জিভ দেখা যায় খানিক। তাই বাইরের লোক দেখলেই বলবে ষাট পঁয়ষট্টি। আসলে শরতের এখন তেতাল্লিশ। কিন্তু সব সময় ফোকলা মুখে সেই তিনকেলে হাসি। তাতেই লোকে আরও ভুল করে। এখানে যে সব আগে আগে। জন্ম। বিয়ে। দক্ষিণে বাতাস। চুলদাড়িতে পাক। জ্যাঠো রোয়া। বউ পেটানো। এমন কি পটল তোলা।

লক্ষ্মণ রাগে রাগে ক্ষেতে নামল। ঘাসকুটি কিছু নেই। ক্ষীরের মত গদ-মাটিতে পা বসে গেল। বাপ আর শ্বশুরের রোয়া তার পছন্দ হয়নি। আড়ে বিঘেয় হাত দশ পনের জায়গার রোয়া রাগে গজগজ করতে করতে লক্ষ্মণ তুলে ফেলল। তারপর ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের ছু'খানা আঙুলে তিনকলি করে ধানচারা ধরে সমান ফাঁকে ফাঁকে রুইতে লাগল। তখন বাঁ হাতখানা তার বাঁ উরুর ওপর। তাতে গোছ করে ধান-চারা ধরা আছে।

শরৎ আর অনন্ত—খানিক দূরে আলে বসে হাসতে হাসতে দেখছিল। শরৎ মনে মনে বলল, ব্যাটা আমার ঠিক তার ঠাকুর্দার মত হবে। ৺মোহন মিস্ত্রীর মত। তাড়ির সঙ্গে সমুদ্রের কাঁকড়া কোনদিন ভেজে খাওয়ার তর সইত না লোকটার। শরৎ খোকা বয়সে দেখেছে—তার বাপ মোহন মিস্ত্রী দিনমানে কাঠকুটি দিয়ে আগুন জ্বেলে তাড়ির ঝাঁপা নিয়ে বসত। আর জ্যান্ত কাঁকড়া দাড়া সুদ্ধ সেই আগুনে আধপোড়া করে প্রায় কাঁচাই চিবিয়ে খেয়ে নিত। খোলা সুদ্ধ। ঠিক তার বাপের চেহারা পেয়েছে ছেলেটা। সেই রোখ। সেই এক রকমের রাগ।

লক্ষ্মণ রুইতে রুইতেই উঠে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বলল, এই বাবা। আবার

গল্প মারছিস?

এই তো মোটে বসলাম রে। বিড়িটা খাই—

নুড়ো জেলে দেব মুখে। এই শ্বশুর। ওঠ্—

অনন্ত সর্দার ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল।

শরৎ বসে-বসেই এক হাতের টানে বেয়াইকে আবার ধপাস করে আলের ওপর টেনে বসিয়ে দিল। তুমিও যেমন! সব কথা শুনতি আছে নাকি ওর! তাহলি আমাদের চলে!

লক্ষ্মণ হালের মাঝখানে দড়ি ধরার মোটা কঞ্চি নিয়ে তেড়ে উঠল। ওঠ্ বলছি। বাড়ি যা বাবা। ভালোয় ভালোয় যা। বাগানে জল দিবিনে? দশ পণ লঙ্কাচারা এমনি এমনি বসালাম? ঝিঙের মাদায় ছায়া করবে কে?

যাচ্ছি রে। যাচ্ছি। খুব দুর্বল গলায় বলে উঠে দাঁড়াল শরৎ। অনন্তকে বলল, চল বেয়াই।

আলের ওপর দিয়ে দু'খানা আধপাকা মানুষ মিস্ত্রীপাড়ার পথ ধরল। এখান থেকে পাড়াটা দেখা যায়। কেষ্ট মিস্ত্রীর খামার। জ্ঞানো মিস্ত্রীর ঠাকুর ঘর। মণি মিস্ত্রীর জল ছেঁচা মেশিনের আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

অনন্ত মেয়ে দিয়েছে মাস ছ'য়েক। খেয়াদার ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে জামাইবাড়ি এসে পাকাপাকি উঠেছে। চাষবাস দেখবে। খাটাখাটি করবে। পর তো নয়। নিজের জামাই। বড় উঠোন। ঘরের পেছনে বাপকেলে পুকুর। গোয়ালঘর। গোলা। নারকেল, সুপুরি, তাল, খেজুর গাছ। এক কোণে ওল, বেগুন, লঙ্কা, ঢেঁড়সের ক্ষেত। জামাইয়ের আগের পক্ষের একটা কচি খুকী আছে। মেয়েটা এই ক'মাসেই তার বড় ন্যাওটা হয়ে পড়েছে। মাঠ থেকে ফড়িং ধরে এনে দেখাতে হয়। আকাশে মেঘ উঠলে কোলে নিয়ে দেখাতে হয়। তার মেয়েকে অবশ্য সতীনের সঙ্গে ঘর করতে হয় না। জামাই তার পয়লা বউকে বিদায় দিয়ে তার মেয়েকে ঘরে এনেছে।

দু'জন আধপাকা মানুষ উঠোনে বসে বোকনো ভরে যখন ভাত খাচ্ছে—তখন কলকাতার ডাকগাড়ি বাঁশি দিয়ে পরের স্টেশন পিয়ালির দিকে পাড়ি দিয়েছে। লক্ষ্মণের খুকীটি পাতিহাঁসের পায়ে দড়ি বেঁধে পুকুরঘাটে যাচ্ছিল। এমন সময় লক্ষ্মণ উঠোনে পা দিল। হাতে আটল ভর্তি চিংড়ি। পা এদিক

ওদিক পড়ছে। তার মানে তিতখুটে তেলো তাড়ির বহরটা আজ কিছু বেশি হয়ে গেছে। ঝাঁপ দিয়ে পুকুরে পড়েই মাছ ক'টা ছেড়ে দিয়ে জলে দাপাতে লাগল। গহিন পুকুরের মাঝখানটায় ডুব দিয়ে দিয়ে মাটি তুলে খুকীকে দেখাতে লাগল। এই দ্যাখ। কেমন কালো মাটি। তারপর নাকের কাছে গন্ধ নিয়ে চেঁচাতে লাগল। কী গোন্ধ! উঃ! আর থুক থুক শব্দ করে ঘেন্নায় সে মাটি পুকুরেই ছুড়ে দিতে লাগল। পাড়ে দাঁড়িয়ে বাপের কাণ্ড দেখে খুকী হাসতে লাগল।

লাল চোখে ভিজে গায় এসে ছেলে খেতে বসলে শরৎ বিড়ি ধরালো। তামাক কিনে হাতে পাকানো বিড়ি।

খেতে খেতে লক্ষ্মণ আবার বাপকে দাবড়ালো। বসে আছিস কেন বাবা। হাত জালটা হাতে নিয়ে এবার বুনে যা না। বসে থাকিস নে বাবা—

শরৎ কোন জবাব দিল না। বড় বড় টানে বিড়ির আগুন লাল করে তুলল। অনন্ত বেয়াই খাবার পর ঘুমোচ্ছে। তার মেয়ে ছেলেকে ভাত বেড়ে দিয়ে এইমাত্র রান্নাঘরে খেতে বসল। পাশে তার সতীনের খুকীটি আবার খেতে বসেছে।

উঠোনে পায়রা উড়ে এসে বসল। গোয়ালের গা দিয়ে সাদা বেড়াল গুটি গুটি এসে লক্ষ্মণের পাতের পাশে দাঁড়াল। কালো কুচকুচে কুকুরটাও খানিক দূরে দাঁড়িয়ে। শরৎ দেখল, এ সবের মাঝখানে তার মা-মরা ছেলেটা খাঁটি গেরস্থের মত বগলে বাঁ হাত গুঁজে আসন-পিঁড়ি হয়ে খেয়ে চলেছে। একবার মনে মনে হাসল। আরেকবার খোলাখুলি হাসল।

লক্ষ্মণ খেতে খেতেই বাপের মুখের ফোকলা হাসিটুকু দেখলো। তার শউরো এখন ঘুমোচ্ছে। ঠিক এই বেলা। ঠিক এই বেলা। মুখখানা নরম করে লক্ষ্মণ বাপকে বলল, বাবু, চল বেগমপুর যাই। যাবি? অনেকদিন যাইনে—

বাগানে জল দেবেনে কে?

শউরোকে বলে যাব। জল দেবে। ঝিঙে চারার মাদায় ছায়া করে দেবে। সন্ধে হলি জাল বুনতি বসবে। মেয়ে বাপে ভালই থাকবে।

শরৎ একবার কি ভাবল। তারপর বলল, চল তাহলি বেলাবেলি—

খানিক পরে দেখা গেল শরৎ মিস্ত্রী তার মা-মরা ছেলেটাকে নিয়ে মিস্ত্রীপাড়া থেকে বেরিয়ে দ্বারিকপোতার মাঠে নামল। কাঠফাটা রোদ্দুর।

দু'টো লোক গমগম করে হাঁটছে। শরতের মাথায় গামছা বিড়ে করে পাকানো। লক্ষ্মণের হাতে তিন ফুটো এক ছাতা। পেল্লায় মাঠের ভেতর ছাতার একরত্তি ছায়াটুকু দাবড়ে দাবড়ে লক্ষ্মণ মিস্ত্রী তার বাপকে নিয়ে পিচ-রাস্তায় এসে উঠল।

ঠিক এই সময় শরৎ মিস্ত্রী তার সেয়ানা ছেলেকে হাঁটতে হাঁটতেই একটা প্রশ্ন করল। প্রশ্নটা লক্ষ্মণের খুব কঠিন লাগল।

খুকীর মাকে বিদেয় দিয়ে কি ভাল করলি?

খুকীর মা মানে লক্ষ্মণের পয়লা বউ।

লক্ষ্মণ বলল, বাবু। বেগমপুরে যাকে দেখতি যাচ্ছি—তারেও তো বিদেয় দিইছিলি তুই। আমি তখন ছোট। এখন হলি পারতিস?

তার তো কাশ রোগ ছিল।

হো হো করে হেসে উঠল লক্ষ্মণ। কাশরোগ না লোকের কথায় বাবা!

শরৎ দুপুরের ফাঁকা পিচ-রাস্তায় রেগেমেগে উঠল। হাতে কিছু থাকলে তাই নিয়ে লক্ষ্মণকে তাড়াই করে বসত। আমারই কাশরোগ ধরে যাচ্ছিল। তুই তার বুঝবি কি?

বাপ ব্যাটায় হাঁটতে হাঁটতেই কথা হচ্ছিল। আরও আধ ঘণ্টাখানেক হাঁটলে তবে বেগমপুর। তারপর সেই অঞ্চল-প্রধানের ফলফলারির বাগান-ঘেরা বাড়ির বাইরে গিয়ে উঁচু মাটির বাঁধের গা ঘেষে লক্ষ্মণ মিস্ত্রী তার বাপকে নিয়ে বনঝালের জঙ্গলে ঘাপটি মেরে বসবে। যদি দেখা যায় নতুন মাকে। নতুন মা এই সময়টা ধান সেদ্ধ করতে বসে। একা একা পুকুরে নামে। গইলে ঢোকে। অত বড় বাড়ির উঠোন পারাপার করে। নির্জন দুপুরে এই সময়টায় নতুন মাকে আশ ভরে দেখা যায়। সেয়ানা হয়ে উঠে তক এই এক তার খেলা। বাপকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাপের বিদেয় দেওয়া বউ মাঝে মাঝে দেখে আসে লক্ষ্মণ। সেই কোন্ ছোটবেলায় বাপের বিয়েতে এক সন্ধে খ্যাট খেয়েছিল। আমের চাটনি খেয়েছিল মনে আছে তার। হ্যাজাকের আলো। কিছুকাল কোলেও চড়েছিল এই নতুন মায়ের। তারপর একদিন চলে গেল। সব মনে নেই লক্ষ্মণের। আবছা আবছা চোখে ভাসে।

কাশরোগই যদি থাকবে তবে আবার নতুন মা-র নতুন সংসার কি করে হয়রে বাপ! তুই বল বাবা। বুক ঠুকে বল।

শরৎ এর কোন জবাবই দিতে পারে না। লক্ষ্মণের মা ভেদবমিতে ফৌত হলে পর এই মেয়েকে বে করেছিল শরৎ মিস্ত্রী। লগদ লব্বই টাকা গুণে দিয়ে। পায়ের গোছ কি। হাতের গোছ কি! এই ড্যাম্ ড্যাম্। ঢেঁকিতে পাড় দিতি বসলি মাথা ঘুরে যেত। চোখ ফেরানো যায় না। খড় কুচাতে বসে নিজের হাতে কোপ দিয়ে বসেছিল শরৎ। লক্ষ্মণ তখন খোকাটি। সে অবধি ন্যাওটা হয়ে পড়ল। কিন্তু শরতের শরীর যে বয় না। শুধু ভাঙে। শুধু ভাঙে। সেজঠাকুর্দা—মাতব্বররা সবাই বলল, তোর বউয়ের কাশরোগ।

তবু শরৎ ছাড়তে চায়নি। কিন্তু রাত হলেই তার সন্দেহ চেপে বসত। তবে কি। তবে কি? ছ'মাসের মাথায় কাটান ছাটান হয়ে গেল। সে আলাদা শুতো। লক্ষ্মণ থাকত তার নতুন মায়ের কাছে।

সব কথা তো তখন লক্ষ্মণকে বলা যেত না। না, বলা যায় নিজের ব্যাটাকে? থিরিশতলার ছায়ায় দাঁড়িয়ে শরৎ মিস্ত্রী তার হাতে পাকানো বিড়ি ধরালো। লক্ষ্মণকেও দিল একটা। কলকাতায় গস্ত করতে ব্যাপারীদের লরি যাচ্ছে। বেগমপুরের পথ দিয়েই যাবে। একসঙ্গে বিড়ি ধরিয়ে বাপ-ব্যাটায় হাত তুললো। যদি নিয়ে যায়। তাহলে এতটা পথ আর হাঁটতে হয় না। লরির ছাদে ব্যাপারীদের একজন হাত নেড়ে জানালো, জায়গা নেই। জায়গা নেই।

লক্ষ্মণ তখন খোকাটি। চাষীবাড়ি মেয়ে-মাগী বসিয়ে খাওয়াবে কে? এ তো ভদ্দরলোকের বাড়ি নয়। গেরস্থ বাড়ি। বউ বিয়োবে না। ঘরে থাকলে শরীর ভাঙে। মাতব্বররা বলে কাশরোগ।

পৌষধান উঠতেই শরৎ তার নতুন বউ ভাগালো। যেতে চায় কি! লক্ষ্মণটাকে কোলে নিয়ে কি কান্নাকাটি। কাঁকালে উঠে ছেলেটাও কাঁদে। শেষে বাপ হয়ে ছেলেকে ছিঁড়ে নিতে হল। শরৎ ভেবেছিল—বয়সকালের মেয়েমানুষ—তখনকার ইউনিয়ন বোর্ডের কোন না কোন পিসিডেন্টের জলপাত্তর হয়েই এই গাঁয়েঘাটে থেকে যাবে। পুরুষমানুষ সে। তাই মন শক্ত রাখতে হয়। নয় তো সেদিন কষ্ট কি তারও হয়নি? কিন্তু জমিজিরেত, লঙ্কাবাগানের মুখ চেয়ে সেদিনও তার বুক বাঁধতে হয়েছিল। গেরস্থ বাড়ি নিষ্ফলা ক্ষয়াটে জিনিস জেনেশুনে পুষবে কে? শেষমেষ পোষানির একটা মায়াও তো পড়ে যেতে পারত। তখন?

তখন নতুন নতুন কন্‌ট্রোলের কাল। আটা দিয়ে গাঁয়েঘাটে পিসিডেন্টরা রাস্তা বানাচ্ছে। খাল কাটাচ্ছে। আটার সের ছ' আনা। হেমন্ত কয়ালের তখন কন্‌ট্রোলের দোকান। ছ'সাতজন লোক খাটে। তখনো সে অঞ্চলপ্রধান হয়নি। তার ঘাটে গিয়ে মেয়েমানুষটা ভিড়ে গেল। গোড়ায় গোড়ায় ছিল জলপাত্তর। তারপর একদিন বউ হয়ে গেল। হেমন্তর ঘরে গিয়ে বছর বিয়োনি হল তার বউ। হেমন্তর পুকুর হল। জায়গা হল। আমবাগান। নারকেল বাগান। ঘরভর্ত্তি ছেলেমেয়ে।

লক্ষ্মণটা অনেকদিন আগে একদিন নতুন পুকুরের মেলা ঘুরে এসে বলেছিল, এই বাবা! নতুন মাকে আমি সামনে গিয়ে চেনা দিলাম। নাম বলিনি। কিন্তু চিনতে পারলে না।

শরৎ হেঁসেলের মটকা ছাইতে ছাইতে উঠোনে দাঁড়ানো ডাগর ছেলেটাকে বলেছিল, নাম বললিনে কেন?

লজ্জা করল।

বললে ঠিক চিনত। তারপর বলল, তার আর দোষ কি। অনেককিছু পালটে গেছে। সেই খোকাটি তো আর নোস্! তাই চিনতি পারে নি। মনে মনে বলেছিল, কাশরোগ না কচু। তাহলি বছর বিয়োনি হয় কখনো! বোঝার ভুল। হিসেবের ভুল। এই করেই তো আমরা মরি। এরকম ভুল আরেকবার করেছিল শরৎ। তার একটা দুধেল গাই পাল খায় না বলে গোহাটায় গিয়ে জলের দামে বেচে দিয়ে এসেছিল। ওমা! আশ্চর্য কাণ্ড। সাতবেড়ের গোকুল বদ্যি সেই বাঁজা গাই কিনে পরের পূর্ণিমেয় গাভিন করে আনল। সবই ভাগ্য। কখন যে কি ফসকায়! কে বলতে পারে!

দু'টো লোক তখনো হাঁটছে। একজন আধপাকা। একজন তরতাজা। এই এক খেলা বাপবেটার। সেই নতুনপুকুরের মেলার দিন থেকে। তা ক'বছর হয়ে গেল। কখনো লক্ষ্মণ কথাটা পাড়ে—কিরে বাবু—বেগমপুরে যাবি? চল্ ঘুরে আসি। কখনো শরৎ পাড়ে—কিরে যাবি নাকি। তোর নতুন মা আজ দুপুরির দিকি পুকুরে নামবে। পাট ভিজানো আছে না।

এইরকম আর কি!

দৃশ্যটা খুব সাধারণ। বাপব্যাটায় গিয়ে বনঝালের জঙ্গলে ঘাপটি মেরে বসে। সেদিকটায় লোক চলাচল নেই। ঢোলকলমি, জিওল, ভারেণ্ডার

জঙ্গলমত। সেখান থেকে সব দেখা যায়। কিছুদিন অন্তর। দেখতে দেখতে লক্ষ্মণ বলে, ওই তো নতুন মা—

শরৎ কিছু বলে না। পায়ে মশা বসেছিল। যাতে শব্দ না হয়—এমনভাবে চাপড় মারে। মশাটা মরেছে। রক্তে নিরাকার। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে মুছে ফেলে।

সেদিনও অন্ন ধারা হল না। লক্ষ্মণের নতুন মা জানেও না—তার এককালের সতীনপো এখন ডাগরটি। দু'দুখানা বে করে বসে আছে। বাপকে নিয়ে তাকে দেখে যায় মাঝে মাঝে। বিকেলে ফেরার পথে পিচ রাস্তায় বাপের সঙ্গে কোন কথা হচ্ছিল না। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল—তার কতদিনকার নতুন মা ভেজানো পাট সরিয়ে সরিয়ে পা ধুচ্ছিল। হাতে পয়সা হতে হেমন্ত কয়াল এখন দুপুরে আগল এঁটে ঘুমোয়। বিকেলে একবাটি চা খায় মুড়ি দিয়ে। নতুন মাকেই সারা সংসারটা আগলাতে হয়। বনঝালের জঙ্গলে বাপের পাশে উবু হয়ে বসে একবার খুব আস্তে ডেকেছিল—নতুন মাগো। নতুন মা—

পাশে বসা বাপটা তার গলা চেপে ধরে বলেছিল, চুপ কর। আচমকা দেখে ভয় পাবে।

চেনা দেব? এই বাবা—

না। ভয় পেয়ে চোর ডাকাত ভাববে। চেঁচিয়ে উঠবে—

বাপের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মণের মনে হচ্ছিল—একটা বুড়ো সাদা শেয়াল বসে আছে ঘাপটি মেরে। এখুনি ডাণ্ডা পেটা করা দরকার। কিন্তু পরক্ষণেই মনে খুব মায়া হয় তার। ভেবেছিল, পথে তালশাঁস পেলে চারগণ্ডা পয়সার কিনে খাওয়াবে বাপটাকে।

ফেরার পথে ওরা তালশাঁস পেল না। পেল মেঘলা আকাশ। জলভর্তি লম্বা খাল। বাস ছুটে যাওয়ার পিচরাস্তা।

খুকির মাটাকে যে বিদেয় করলি—

কথা শেষ করার সুযোগ পেল না শরৎ। লক্ষ্মণ খেঁকিয়ে উঠল। চুপ করবি তুই।

শরৎ পুরো ব্যাপারটার জন্যে নিজেকেই দায়ী করে মনে মনে। ব্যাটার বউটা তার খুবই ভাল ছিল। রুটি সেঁকার তাওয়া নেই। কলাই থালায় কাঠের আঁচে একখানা করে রুটি সেঁকে দিত। শউরোর রুটি ক'খানা যাতে

কোথাও না পোড়ে সেদিকে নজর ছিল। বিকেল হলেই নিজের থেকে ওল বাগানে জল দিতো। কিছু বলতে হত না।

অথচ আমিই সর্বনাশটা করলাম। শরৎ লক্ষ্মণকে আবার একটা বিড়ি দিল। মেশিন দিল। মেশিনের চকমকি পাথরগুলো এদানী বড় খারাপ হয়ে যায়। কিছুতেই ফুলকি দিয়ে আগুন ওঠে না। আহা, ছেলেটা তার বড় শুকনো মুখে হাঁটছে!

গত বছর খোরোকালে ইঁটখোলায় বাপবেটায় লেগেছিল। হাজার ইঁট কাটলে চোদ্দ টাকা। ফুরোনের কাজ। সেই সন্ধ্যেতারা আকাশের কিনারে ঢলে পড়লে—বেশ রাত থাকতে দু'জনে দ্বারিকপোতার মাঠ ভেঙ্গে ইঁটখোলায় এসে উঠত। হাতে হ্যারিকেন। সাদা বালি আর জাব করা মাটির তাল ফর্মায় ঠুকে ইঁট বানাতো সকাল সাতটা আটটা অবধি।

একদিন বাড়ি ফিরে কানাকানি শোনে—ব্যাটার বউ তার কুল ভেঙ্গেছে। ভাঙ্গিয়েছে ভুবন মিস্ত্রীর ছোট ব্যাটা বলাই। হায়ার সেকেণ্ডারি না কি জিনিস দেবে। তাগড়া ছেলে। সাইকেল চালায়। পারটি ক্রিকসনে পাইপগান চালায়। এগেনস্ট্ পারটির সঙ্গে গোলাগুলি নিয়ে টক্কর দিয়ে থাকে। সেই ছেলের এই কাণ্ড। শেষ রাত্তিরে। ফাঁকা ঘরে। দেখেছে কে? না, জ্ঞাতিভাই পঞ্চানন মিস্ত্রীর বউ। একথা কি চাপা থাকে।

এদেশের রীতি ধরে লক্ষ্মণ তার বউটাকে পেটালো। খুকীটা সারা দিন কাঁদলো। বিকেলে ফলিডল খেল বউ। সন্ধ্যেবেলা সাইকেল ভ্যানে চাপিয়ে লক্ষ্মণ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে হাজির। ডাক্তার পাম্প করে বাঁচিয়ে দিল।

এরপর বেশ কিছুকাল ভাল ছিল। ফিরে আবার। কে যেন লক্ষ্মণের ঘরের পেছনে খেজুরতলা থেকে দু'জনকে বেরোতে দেখেছে একসঙ্গে। লক্ষ্মণ প্রায় তার বাপের কায়দায় এবার বউ ভাগালো। আহা! কচি বউটা। এখন নাকি ফার্স্ট ট্রেনে যাদবপুর-ঢাকুরে কোন্ কাজের বাড়ি খাটতে যায়। ফেরে বিকেলে। সাড়ে চারটের ট্রেনে। গায়ে জামা নেই, পরনের শাড়িখানা ধুড়ধুড়ি অবস্থা। হাতে কিলোখানেক আটা। আহা! দেখলে চোখে জল পড়ে।

নতুন পুকুরের মাঠ পেরিয়ে লক্ষ্মণ আর একটাও কথা বলল না। বিকেল ঘন কালো হয়ে আসছিল। সঙ্গে দখিনা বাতাস। এলোপাথাড়ি। ছাতা

ভাঁজ করে কাঁধে ফেলেছে। শরৎ তবু তার ভাগ্য ভাল বলে নিজেকে নিজেই বোঝালো। ব্যাটা তো সাধু সন্ন্যেসী হয়ে যায়নি। ফের বে বসেছে। তিন বিঘের সবজির বাগান দিয়েছে। চাষে ষোলআনা মতি। গরুর যত্ন নেয়। কিসে সংসারে সাশ্রয় করে দুটো পয়সা হয়—সেদিকে কড়া নজর। মাছ চিংড়ি ধরে এনে বাড়ির পুকুরে ফেলে। উঠোনে ওল বসিয়েছে। মান বসিয়েছে তিরিশখানা। ক্ষার দিয়ে—কলার বাসনা দিয়ে পরনের কাপড় চোপড় কেচে পরিষ্কার রাখে। তাড়িটা খায়। কিন্তু গাঁজা তো খায় না। ওই এক পাজি নেশা। বুক লাল হয়ে দেহ শুকিয়ে যাবে।

বাপকে বলে কি করে সব কথা। লক্ষ্মণ সেসব কথা আর কোনদিন মুখে আনবে!

চোত সংক্রান্তির ক'দিন আগে তার খুড়ো পঞ্চানন মিস্ত্রী খবরটা আনে। তার চেয়ে কিছু বড় তার খুড়ো। একসঙ্গে খেলেছে। জিরেন কাটের রস একসঙ্গে খায়। খুড়োই খবরটা ভাঙ্গলো সন্ধ্যে বেলা। বাপ তখন কেরোসিনের লাইন দিতে গেছে কন্ট্রোলে। পঞ্চা খুড়ো গিয়েছিল যাদবপুরে। রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে যোগাড় দিতে।

সন্ধ্যে বেলা আরেক জ্ঞাতি খুড়ো কিশোরী মিস্ত্রী—মান্য মিস্ত্রীর তিন ব্যাটা—গণেশ, কোনো, ফোকো—সবাই বসে। পৃথিবীতে এই সময় হলুদ বর্ণের চাঁদ ওঠে। রাখাল গরু নিয়ে ফিরছিল। বাদুড়গুলো আকাশ দেখতে বেরিয়েছে সবে। পঞ্চা খুড়ো তখন খবরটা ভাঙ্গলো। ও লক্ষ্মণ! তোর সেই বউয়ের ভাগ্য ফিরে গেছে। হাঃ! হাঃ!

লক্ষ্মণ চুপ করেই ছিল!

হাত ভর্তি চুড়ি। গা ভর্তি গয়না। রান্নাঘরের ছাদঢালাই হচ্ছে। আমার মাথায় কড়াই ভর্তি মশলা। ও মা! বাড়ির গিন্নি তোর সেই বউ। তারপর পাড়ায় খোঁজ নিয়ে জানলাম সব। তোর বউ ও-বাড়ি ঝি খাটতি গিছলো। এখন তিনি বউ-মরা কর্তার গিন্নি। কি ভাগ্যি! রানীর হালে আছে। শুনলাম টেবিলে বসে বাবুর সঙ্গে ভাত খায়—চা খায় দিনি দোবারা—ঘড়ি ধরে। বেটাইম কিছু হবার উপায় নেই। হুঁ। এ হল গিয়ে ভদ্দরলোকের কারবার! সোজা কথা! গর্বে পঞ্চাননের বুক ফুলে উঠেছিল।

সবাই বলল, এরি বলে ভাগ্য! ও মেয়ের রাণী হবার কথা। দিলি তুই তেইড়ে! এখন দ্যাখগে। ভদ্দরলোকের বউ বনে আছে। পায়ে

স্যাণ্ডেল। ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজে।

পঞ্চা খুড়ো বলল, সায়া সেমিজ পরে। এই অ্যাতখানি সিঁদুরের টিপ—

এসব কথা কি বাপকে বলা যায়। বাবু, তোমার যেমন ফসকানি ভাগ্য! আমারও তেমনি ফসকানি কপাল! বাপ ব্যাটায় আমরা আছি ভাল। আজ পুকুর ধারে নতুন মায়ের শাড়ির লাল পাড় কেমন ডগডগ করছিল। একদিন ঠিক চেনা দিয়ে দেব মা তোমায়। আমি তোমার সেই কাঁকালের লক্ষ্মণ। তোমার ওই ভর ভরাট সংসারের সব ছেলেমেয়ের আগে আমি হয়েছি মা। মাগো, ঠিক তোমায় চেনা দিয়ে দেব। তুমি চমকে যাবে মা—

পঞ্চা খুড়োকে নিয়ে পরদিন যাদবপুরে গিয়েছিল লক্ষ্মণ। বাড়ির সামনে পেছনে খালি ঘোরাফেরা করার পর একবার যেন মনে হল, খুকীর মা জানলা দিয়ে তাদের দেখল। তারপর কোথায় কি! সব ভোঁ ভাঁ। আধ-পাকা একজন মানুষ ছাতা হাতে অফিস বেরোল। ঠিক ভদ্দরলোকের মত দেখতে। খুড়ো যা বলেছে একেবারে তাই। হাতে ঘড়ি। বুকে কলম। হাতে টিফিনের কৌটা। চোখে চশমা। পায়ে বুট। তারপরেই বউ বেরোলো। ঝুলবারান্দায়। সবটা নয়। দু'খানা হাত পুব আকাশে তুলে ধরল শুধু। গয়নায় চুড়িতে হাত বোঝাই। দেহখানা দেখালো না। পুবির আলো পড়ে সে-হাত ঝক মক করে উঠল। এসব কথা বাপকে বলা হয়নি লক্ষ্মণের। আলো ঠিকরে পড়ে হাত দিয়ে ছটা দিচ্ছিল।

সন্ধ্যেয় ফিরে দেখলো, অনন্ত লোকটা বড় ভাল। কোটকেনার মাঠে— ওই সেই দূরে—বাঁকে করে জল দিচ্ছে। দেহখানা দেখা যায় ছোট। বেশ দূর তো। তারপর সন্ধ্যের মুখ। অনেকদিন পরে পৃথিবীতে আবার হলুদ বর্ণ চাঁদ উঠছিল। তার ভেতর দিয়ে একখানা ট্রেন ম্যাটমেটে আলো জেলে শহরে যাচ্ছিল। শরতের বিবেকবুদ্ধি বোধহয় কামড় দিল। নিজে থেকেই বলল, যাই, জল দিইগে।

একা একাই বাপ বাগানের দিকে রওনা দিল। হাজার হোক নতুন বেয়াই তো। দুটো গল্পগাছাও করা যায় এক সঙ্গে হলে।

লক্ষ্মণের চোখের সামনে তিন বিঘের বাগানখানা ভেসে উঠল। আর তিনটে মাস পরে—

আর মোটে তিনটে মাস পরে। যদি ঝড়বৃষ্টিতে জলবসা না হয় ক্ষেত।

তাহলে—

তাহলে একদিন অন্তর একদিন ঝিঙে উঠবে অন্তত দুমণ। লম্বা কম করেও তিরিশ কিলো। ঢেঁড়শ সেই পরিমাণ। কুমড়োর তো কথাই নেই। তখন লোক রাখতে হবে। দিনে রাতে পাহারা চাই। তাছাড়া ঝাঁকা বোঝাই দিয়ে শেয়ালদা পাঠাতে হবে। সেখান থেকে কোলে মার্কেটে পাইকেরের ঘরে—

পয়সা খায় কে তখন ?

খালি দাওয়ায় তার একহারা বউটা দাঁড়ানো। গায়ে জামা দিয়েছে। কপালে সিঁদুরের টিপ। পায়ে আলতা। ঠোঁটে বুঝি হাসি। লক্ষ্মণের খুব ভাল লাগল।

খুকী কোথায় ?

সে তো সেই বিকেলে বাবুর সঙ্গে বাগানে গেল।

শুনে লক্ষ্মণের খুব ভাল লাগল। তার শউরোটা লোক ভাল। মেয়ের সতীন-ঝিকে ভালবেসে বসে আছে। লক্ষ্মণের মনটা কিসে একেবারে ভরে গেল। ঠিক এইভাবে নতুন বর্ষার জলে ফি-রাতে শুকনো পুকুর ভরাট হয়। এট্টু এট্টু করে জল বাড়ে। তখন কোন তল পাওয়া যায় না।

দুলবি ?

লক্ষ্মণের কথায় বউ চুপ করে থাকল। এ দোলনা তার আমলের নয়। তার সতীনের সময়কার। দড়ির দোলনা। গেরস্থ বাড়ি মাত্রেই থাকে। খোকাখুকু হলে চৌচালার বারান্দায় টানিয়ে দেয়। তাতে মানুষের ছানা ঘুমোয়। দোল খায়। বড় হলে খোকাখুকু কোলে নিয়ে বাবা মাও দোলে। ফাঁকা পেলে দেবাদেবী।

লক্ষ্মণের বউ ছুট্টে ঘরের ভেতর চলে গেল। সদ্য তোলা ওলের সঙ্গে চিংড়ি দিয়ে ডালনা বসিয়েছে। কেমন যেন ধরা ধরা গন্ধ ছড়াচ্ছে। পুড়ে গেল না তো !

লক্ষ্মণও ছুটে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল।

ক'দিনে লক্ষ্মণের কুমড়ো চারার ডগাগুলো লগবগ করে বেড়ে গেল। ঝিঙে লতায় ফুল এসেছে। লক্ষ্মণ পয়লা ফুলটার মুখ সুতোয় বেঁধে দিয়ে টোটকা করে এল একদিন। তাহলে ভাল সাইজের ঝিঙে ধরবে।

ফের যে বসবে বলে গণেশ বে-পাড়ায় মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছিল। জানাশুনা জায়গার লোকে তো আর ও-বাড়িতে মেয়ে দেবে না। ট্রেন যায় আসে। আবার দু'পক্ষ ঘুরে পৃথিবীতে হলুদবর্ণের পুরো গোলালো চাঁদ উঠছিল ক'দিন ধরেই।

ভোর ভোর ধানক্ষেতে গিয়ে শরতের বুকখানা দুলে উঠল। কি গোছ। সকাল বেলাই মেঘবর্ণ। আরো তো সারাবেলা পড়ে আছে। বেলায় বেলায় রঙ পাল্টাবে। না জানি বিকেলের ঘোরে আরও কত গাঢ় সবুজবর্ণ ধরে। তিনকলি ধানচারা এখন কোথাও কোথাও ঝাড়ে বংশে পঞ্চাশ কলি। আলে উবু হয়ে বসে গুণে দেখল শরৎ। তরিবত করে বাঁচাতে পারলে তো ধানে ধানে গাছ শুয়ে পড়বে। এ-বছরটা পৃথিবীটা হাসিমুখেই তাকাচ্ছে চারদিকে। একটা ভেঁপু-পোকা পাতার ওপর দিয়ে পালাচ্ছিল। সেটা টিপে মারতে গিয়ে নজরে পড়ল শরতের। এ কি দশা! হা ভগবান! ঘাসে বোঝাই হয়ে গেছে। সব সার খেয়ে নিচ্ছে ঘাস। এখন ধানচারাদের বাড়ন্ত বয়স। বাড়বার মুখে এখনই বাধা? গোমে গোমে হেঁটে ফিরল শরৎ। উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল। কোথায় গেলি হারামজাদা! কোথায়—

খুকী ঘুমোচ্ছিল। লক্ষ্মণ আর তার বউ সারারাত গল্প করেছে। জানলার নিচে ঘেঁটুফুলের বড় বড় পাতায় রাতভর জ্যোৎস্না হেসেছে। ভোর ভোর অনন্ত যখন বাগান চৌকি দিয়ে ফিরেছে—তখনো ওরা দুজন ঘুমোয়নি। সকালবেলা ফাঁকা উঠোন পেয়ে দুজনে গলাগলি করে দড়ির দোলনায় দুলছিল। ভোরের বাতাস ছেচতলার বড় বড় ঘাস কাঁপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

এমন সময় শরৎ একেবারে দোলনার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। হারামজাদো! মাঠের ধান ঘাসে টুইটুম্বুর। গুষ্টির তুষ্টি করে দোলনায় দোলা—

ব্যাটার বউ একগলা ঘোমটা দিয়ে এক লাফে ঘরে। বাপের রাগ লক্ষ্মণ জানে। সেও লাফিয়ে উঠোনে। হাতের কাছে যা পাবে তাই এখন ছুঁড়ে মারতে পারে শরৎ।

শরৎ তা কিছুই করল না। চাপা গলায় বলল, নিড়েনের অভাবে অত সুন্দর ধান গরানে মেরে যাবে—

তুই ভাবিসনে বাবা। আমি ঠিক নিড়োবো—

প্রায় দশ কাঠা আন্দাজ নিড়িয়ে লক্ষ্মণ যখন ঘরে ফিরল—তখন মাথার ওপরে সূর্যের চলানির সবে শুরু। তেউড়ে কলাইয়ের ডাল। তেঁতুলের টক। চ্যাং মাছের ঝাল। মান সেদ্ধ। খেয়ে উঠে একটা ঘুম দিল লক্ষ্মণ। চৌচালার বড় দাওয়ায়। তার নিচেই গর্ত করে হাঁস মুরগির ঘর। তাতে সাপ, খটাস বা বেড়ালের ঢোকার কোন পথ নেই।

লক্ষ্মণ দেখছিল নিড়েনের অভাবে ধানক্ষেত ঘাসে ছেয়ে গেছে। পা ফেলা যায় না। তার বড় অনুতাপ হল। এ আমি কি করলাম! এত সুন্দর ধান। নিজের হাতে গলা টিপে মারলাম। বিয়েন কাঠি তো বেরোবে না আর। চারা যে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। শুয়ে শুয়ে পরিষ্কার বুঝলো—ধানচারাগুলো ডাটালো হয়ে উঠে বিন্ বিন্ করছে—বাড়বে বলে—আরও বাড়তে চাইছে বলে। চৌদিকে ঘাসে দম আটকে ফেলেছে। বাড়তে পারছে না। তার ঠিক পিঠের নিচেই ফাঁপা মাটির দাওয়ার ভেতরে হাঁসের ঘরে সাপ ঢুকছে। ডিমের লোভে। হাঁসগুলো বের করা দরকার। ভয়ে দাপাদাপি করছে। সাপটা ফণা তুললো। বুড়ো সাপ বেশিক্ষণ ফণা তুলে ধরে রাখতে পারে না। মাথা দোলে। মাথা ঘোরে। আহা-হা কি রূপ! কি রূপ! চোখ ভরে দেখে লক্ষ্মণ। বুড়ো সাদা মাথাটার নিচি দুধবরণ গা। তাতে কালচে কালচে বুটি। এমন জিনিসের হাতে মরেও সুখ। ধেড়ে হাঁসটা তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে অন্ধকার বাসায় চুপ করে দাঁড়ানো। ছোবল পড়লে আর সরে দাঁড়াবার জায়গাও নেই। তার চেয়ে ভালোয় ভালোয় ডিমগুলো—অন্ধকারে সেগুলো ফিক ফিক করছে। ধেড়েটা সব বুঝতে পেরেছে এক লহমায়। আহা এমন জিনিসের হাতে পড়ে মরেও সুখ।

পঞ্চা খুড়ো, কিশোরী খুড়ো—গণেশ, ফোকো, কোনো—তিনভাই—আরও সবাই একসঙ্গে মিছিল করে চলেছে। জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ। দুটো মেঠাইয়ের দোকান পড়ল। রাজপুরের শ্মশান। এখানে কত মড়া যে পোড়াতে এসে ঘাটের সঙ্গীদের সঙ্গে বসে লক্ষ্মণ কয়েকবার লেডিকিনি আর আলুর দম খেয়েছে! বুড়ো মানুষ মরলি বড় মজা হয়। ক' বার শুধু হরি হরি বল। হরি হরি। তারপরেই লেডি-লেডিকিনি। শুধু আধপোড়া নাইকুণ্ডুলিটা মাটি মাখিয়ে তাল বানাও। তারপর আদিগঙ্গায় ছুঁড়ে দিলিই কাজ শেষ।

লেডিকিনি। তারপর আলুর দম। জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ। এ লড়াই বাঁচার লড়াই। সব কথা ছাই মনেও থাকে না।

সবে গাঁয়ের রাস্তা ছেড়ে গড়িয়া এল। দাদারা মেঠাইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। এখনো টালিগঞ্জ। তারপর ময়দান। সেখানে জোর বক্তৃতে হবে। জমি দেওয়া হবে শেষ মেষ। বুড়ো বঙ্কিম মিস্ত্রী আলাং তালাং বকছিল। কোমপানি বাঁধের গায়ে লাইন ধরে এক বিঘে দু' বিঘে করে জমি সবার নামে বিলি হচ্ছে। আকাশের নিচি বাঁশের খুঁটো পুঁতে সীমানা চৌহদ্দি। বর্ষা পড়লেই গেতু নয়ত দামোদর ধান রুয়ে দিতি হবে। খুব সারি জায়গা। বলকারী। রুয়ে দিলিই ধান।

ও বলাই! তোর পাইপগানের নল ফেটে গেল কখন? মুখ ঘুরিয়ে নে। মুখ ঘুরিয়ে নে। নয়ত বেদম জখম হবি। এসব পারটি ফ্রিক্‌শনের ব্যাপার। এগেন্‌স্ট পারটি হরপুরের মাঠ দিয়ে বেড় দিচ্ছে। জমি দখলের লড়াই। দখলে রাখার লড়াই। ওরা হাজার দুয়েক লোক। সারা গাঁ বেড় দিয়েছে। এবার আগুন দেবে। সব্বাইকে দেশছাড়া করবে। এদিকে শুধু বলাই। ভুবন মিস্ত্রীর ব্যাটা। তার পয়লা বউয়ের কুল ভেঙ্গেছিল। আহা। বড় সোন্দর পাইপগান চালায়। কি টিপ! লক্ষ্মণের বাঁ ধারে পঞ্চা খুড়ো, কিশোরী খুড়ো। গণেশ। তার বাপ মানা মিস্ত্রী। সাত আটজনে দু'হাজার লোকের মহড়া। গুলি। দমাদ্দম। হাঃ। হাঃ। তার বুড়ো বাপটা—শরৎ মিস্ত্রি সবার অগে। হাতে একখানা রাম-দা। কি প্রবল ঘোরাচ্ছে। এই বাপ! সরে যা। গুলি লাগবে। বলাইয়ের পাইপগানের নল ফেটে চৌচালা। পঞ্চা খুড়ো কাঠি এগিয়ে দিচ্ছিল। এক একখানা কাঠি ব্ল্যাকের দরে তিন টাকা। কি আওয়াজ দেয়। উঃ। শালারা পালাচ্ছে এবার। ধর। ধর। তেইড়ে ধর। হাজার দুই লোক বনবাদাড় ভেঙ্গে পালাচ্ছে। হুঁ হুঁ বাবা। এ হল গিয়ে মিস্ত্রী পাড়া। গুলির একেবারে পরিষ্কার টিপ। দু তিনটে লোক পড়ল। একটাকে ধরে নিয়ে পালাচ্ছে। দু'টো পড়ে আছে। গুলি করে দিলি হয়। তাহলিই সব সাবাড়। বিকেলে ময়দানে বক্তৃতে আছে। আবার পুলিসও আসতি পারে। এখনই লাশ সরানো দরকার। ও বজরা। তুই কখন এলি? তুই তো ওয়াগন ভাঙ্গিস। তুই এর মধ্যি কেন? খুব মজা লাগে, তাই না? মানুষজন কেমন ভয়ে তরাসে পালায়। বিড়েলের মত। তুই এদ্দিকটায়

পাহারায় থাকিস।

ছুটে এগোতে গিয়ে লক্ষণ দেখল—কোমপানি বাঁধের গায়ে আমতলায় নতুন মা দাঁড়িয়ে। মুখে হাসি। কপালে সিঁদুরের টিপ। ডগডগে লাল পেড়ে শাড়ি।

লক্ষ্মণ চেনা দিল। তুই কখন এলি নতুন মা? সব দেখলি?

সব।

সব?

সব। আয় এখানে একটু জিরিয়ে নে। তারপর খেয়ে নে। পান্তা এনিছি।

বাপকে ডাকি?

না দরকার নেই।

দেখুক। একবারটি। কে এল!

না। তুই খেয়ে নে। আমি দাঁড়াই। আর গুলিগোলায় যাসনে বাপ—

লক্ষণ বিশ্বাসই করতে পারছিল না। ডাবা হাঁড়িটা টেনে নিয়ে দু' গরাস পান্তা মুখে দিয়েও অবাক হল। সত্যি সত্যি নতুন মা লালপেড়ে শাড়ি পরে দাঁড়ানো। মোলাম পায়ের পাতা ঘাসে ঢাকা মাঠে। আমতলার ঠাণ্ডা ছায়া বাতাসে বাতাসে জায়গা বদলাচ্ছে—আবার ফিরেও আসছিল।

আমি চেনা না দিতিই চিনলি মা?

নতুন মা হাসলো। ওমা! চিনবোনি কেন?

আমি তো এখন স্যায়না হয়েছি মা—

তাতে কি?

আমায় তো তুই পেটে ধরিসনি মা—

কে বললে? তুই তো আমার পয়লা ছেলে। নতুন সংসারে পরে আরও অনেক পেটে ধরলাম। এখন তো তোর অনেক ভাইবোন। কিন্তু তোকে কাঁকালে নিয়ে যা সুখ!

সত্যি মা? পান্তার গরাস গলায় আটকে বিষম খেল লক্ষ্মণ। নতুন মা বাঁ-হাতে তার মাথায় থাবড়া দিয়ে ডান হাতে জলের গ্লাস এগিয়ে দিল। ভাত মুখে এত কথা বলে না বাপ। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি যাই। তোর হেমন্ত জ্যাঠার এখন একবাটি চা চাই। তারপর গদিতে গিয়ে বসবে।

আরেকটু থাকো না নতুন মা। আর দু' গরাস খেয়ে নি—

ধীরে সুস্থে খেয়ে খেয়ে লক্ষ্মণ ফন্দি এঁটে নতুন মাকে দেরি করিয়ে আটকে দিচ্ছিল। সত্যি এমন হয়? মা ফিরে আসে। তাদের তো বাপ-ব্যাটার শুধু ফসকানি কপাল। এসব সত্যি?

বাপ-ব্যাটায় তোকে আমরা দেখতে যাই মা। সেই অ্যাতখানি পথ। বেগমপুরে পুকুর ধারে। জানিস মা?

সব জানি। সব।

সত্যি?

সব। খেয়ে নে। আর দু' গরাস খেয়ে নে—

রাম-দা হাতে শরৎ মিস্ত্রী ফিরছিল। আমতলায় এই ছবি দেখে তার তো চক্ষুস্থির। লক্ষ্মণ মজায় মজায় বাপের দিকে তাকালো। দ্যাখোসে! কে এসেছে। অবাক শরৎ মিস্ত্রীর হাতে রাম-দা ঝুলছে। এক লহমায় কোথায় কি! সব ফক্কিকারি। ভোঁ ভাঁ। নতুন মা হাওয়া।

মেলা দেখে ফেরার পথে একখানা গণেশ ঠাকুর কিনেছে লক্ষ্মণ। খুকী কিনেছে রাধাকেষ্ট। জোড়ে। ওরে, মাটির পুতুল সাবধানে নে মা। হাত ফসকালিই টুকরো টুকরো। এ ঝক্কি কার পোয়ায় বল। পাঁপড় খাবি মা? মুচমুচে।

ও লক্ষ্মণ, উঠবি নে বাপ? সন্ধ্যে করে ঘুমোয় এখন—

বাপ আর শউরো ঝিঙে বাগানে জল দিয়ে সবে ফিরেছে। মুড়ির বাটির সামনে খুকী। বউ তার লম্প জ্বেলে বারান্দায় বসিয়ে দিল।

লক্ষ্মণ তখনো দেখছিল, ছেচতলার নিচেই ঘন ঘাস হয়েছে। সবুজ আর বিনবিনে! সাদা ন্যাড়া উঠোনের লাগোয়া এই সবুজ জায়গাটুকুতে ঘরের চাল ধুয়ে নাগাড়ে বৃষ্টির জল এসে পড়ে। সেখানটায় মাথা দিয়ে সে শুয়ে আছে। চোখের পাশেই ঘাসের গোড়া। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল লক্ষ্মণ। সিধে সিধে সব ঘাস দাঁড়ানো। সবাই তার চোখের সমকক্ষ। সেই পরিমাণ লম্বা। ঘাসগুলো যে বাড়ছে—তার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছিল লক্ষ্মণ। পৃথিবীর ভেতরকার টানে সে যেন উঠতে পারছে না। মাথাটা ভীষণ ভারি। দু চোখ তার ঘাসে টেনে ধরেছে প্রায়। শরীর তোলা যাচ্ছে না।

এই সময় শরৎ এসে ধাক্কা দিতেই লক্ষ্মণের চোখ খুলে গেল। দেখল, সামনে তার বাপের মুখখানা ঝুঁকে পড়েছে। উঠবিনে বাপ? আঁধার করে দিলি শুয়ে শুয়ে—

লক্ষ্মণ চনবন করে উঠে বসতে গিয়ে দেখল, উঠতে পারছে না। এই একটু আগেও তো নতুন মা ছিল। তখন তার বাপের হাতে ছিল রাম-দা। ঠাকুরতলায় মানসিকে অনেক পাঁঠা বলি পড়ে। তার জংধরা রাম-দা।

বাবু আমি যে উঠতি পারিনে—

অনন্ত বলল, বেলাবেলি ঘুমোলি গা অমন ধরে যায়—এট্টু পরে ঠিক হয়ে যাবে।

রাতে লক্ষ্মণ কিছু খেল না। পরদিন সকালে দিনের আলো ফুটলে সবাই দেখল, লক্ষ্মণের সারা শরীর ফুলে গেছে। চোখের পাতা, নাক, কান, হাত—সব। সব। এখন সে একখানা শরীরে দু'খানা লক্ষ্মণ। আঙুল দিয়ে টিপলে সে-জায়গাটা বসে যায়।

সেদিনটা শরৎ আর বাগানে জল দিতে গেল না। মনে মনে বলল, কেন যে ছেলেটাকে ধানক্ষেতে নিড়েন দিতে পাঠালাম। আমারই দোষ। ছেলের গর্ব বড় গর্ব। কোন কাজে গর্ব করতি নেই। কোন কিছু নিয়ে গর্ব করতি নেই। সুখের গব বড় খারাপ গব।

লক্ষ্মণ ভারি চোখ মেলে দু'বার বলল, বাগানে জল দিতি গেলিনে বাবু?

যাবানে—বলেও শরতের যাওয়া হল না।

সন্ধ্যেবেলা ডাক্তার নীরদবরণ এসে গুণে গুণে আটটি টাকা নিল। ঝিঙে বেচা টাকা। লক্ষ্মণের সাধের বাগানের পয়লা ঝিঙে। এই অ্যাত বড় বড়।

যাবার সময়ও নীরদবরণ উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কাল সকালেই কলেজে ভর্তি করে দিয়ে এস। নুন খাবে না। লক্ষ্মণকে শুনিয়ে বলল, এখন স্ত্রী-সংসর্গ বিলকুল বন্ধ।

সেদিনও রাতে জ্যোৎস্না ছিল খুব। খাটে লক্ষ্মণ আর খুকী। মাটির মেঝেতে বউ।

ভাগ্য ভাল। নীরদবরণের চিঠিতে গোরাচাঁদে ফ্রি বেড পেল। মাসখানেক পরে ফিরে এল লক্ষ্মণ। খুব রোগা। গায়ে শক্তি নেই। লোকে জানতে চাইলে বলে, যমে মানুষে টানাটানি গেল। বড় বড় ইঞ্জেকসন। পেচ্ছাবের দোষে ফুলে গেলাম।

ক'দিনের ভেতর লক্ষ্মণের ধানে থোড় এল। চড়চড়ে রোদে গোল গোল বিয়েন কাঠিগুলো এবার ফেটে গিয়ে শিষ বেরোবে। তারপর তাতে দুধ ধরবে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে লক্ষ্মণের সব নতুন লাগে। গাঁয়ের রাস্তা। দিঘির পাড়। কাঁঠাল গাছটা। বউকে। ভোরবেলা শিশির ভেজা ঝিঙে। পনেরোদিন পরে লক্ষ্মণ আবার ফুলে গেল। এবার ডবল। নীরদবরণ জানতে চাইল, নুন খেয়েছিলি?

আলুনি খাওয়া যায় কখনো? তা একটু আধটু কি খাইনি!

তবেই সামলাও। চোখ, জিভ দেখে নীরদবরণ বলল, স্ত্রী-সংসর্গ?

তা দু' একবার কি হয়নি!

তবেই সামলাও। ঘর ভর্তি রোগী! হাঁপানি আছে। আমাশা আছে। কত কিসের। নীরদবরণ বলল, কাল সক্কালের ট্রেনে আবার কলেজে যাবি।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে এবার লক্ষ্মণের সব কিছু নতুন লাগছিল। ঠিকই করে ফেলেছে, নাইঝোলা গরুটা বেচে দেবে। বর্ষায় হাল দেবার সময় নাই বেয়ে জোঁক উঠে আসে। সেই টাকায় একটা সাইজমত গরু কিনে বড় বাছুরটাকেও সেই সঙ্গে হালে ধরাবে। জমি বাড়াবে। চাষে আরও মন দেবে। কলকাতার হাসপাতালে রোগীদের আত্মীয়স্বজনকে আসতে দেখেছে বিকেলবেলা। তাদের মেয়েছেলের মত তার নিজের বউয়ের জন্যে জুতো কিনবে। কানে কানপাশা। খুকীর সোয়েটার। বাবা আর শউরের জন্যে দু'খানা কম্বল। যে শীতির মধ্যি বাগান চৌকি দিতি হয়! ঠাণ্ডায় দাঁত নাচে টকাটক।

রাতে হাসতে হাসতে বউকে বলল, আমি কলেজে যাচ্ছিনে।

অনেকদিন পরে বউয়ের মুখে হাসি ফুটেছিল। লক্ষ্মণ আবার ফুলে যেতে সে মুখে আর হাসি নেই। বউ বলল, তবে?

এবার কলেজে গেলি আমি মরে যাব বউ। ইঞ্জেকসন দিয়ে মেরে ফেলবে। ইউনিয়ন পিসিডেণ্ট ছেল জ্ঞানো জ্যাঠা। সে কলকাতায় তার চেনা কবিরাজবাড়ি নে যাবে। একেবারে ধন্বন্তরী।

টাকা?

তা একবারে এট্টু বেশি লাগবে। নীরদবরণের মত বারে বারে নেয় না। দশকাঠা জমি লিখে দিলি ভুবন মিস্ত্রী তিনশো টাকা দেবে—

লণ্ঠনের আলোয় বউ লক্ষ্মণের দিকে তাকাতে পারছিল না। মাথাটা ফুলে ডবল। নাকটাও তাই। চোখ ফুলে মণি ঢেকে গেছে। লণ্ঠনের

কাঁপুনি ধরা আলো সেই ভারি মুখে পড়ে দুলে দুলে বেড়াচ্ছিল। বউ খুব আস্তে বলল, তাই যাও।

লক্ষ্মণের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সংসারে আমার এত টান। বউয়ের তো তা নেই। মুখ ঘুইরে কথা বলে। কথায় মন নেই। ছাই পষ্ট শোনাও গেল না।

লক্ষ্মণ উপুড় হয়ে পড়ে থাকল বিছানায়।

ক'দিন ধরে কবিরাজবাড়ি হাঁটাহাঁটি গেল। তিনশো টাকা দেখতে দেখতে ফোঁত। নাইঝোলা গরুটাও ভুবন মিস্ত্রী কিনে নিল। সে-টাকাও কবিরাজের ট্যাঁকে পৌঁছে গেল।

জ্ঞানো জ্যাঠা আর আসে না। শরতের তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার অবস্থা। হালের গরু গেল। এবার বর্ষায় চষবে কি দিয়ে?

লক্ষ্মণ এখন দাওয়ায় বসে থাকে দিন রাত। পাড়ার খেলুড়ে বাচ্চাছেলেরা বলে, এই ফোলাবাবা। এখন সে তিনগুণ। মেঝে দিয়ে কালো বড় ডেয়ো পিঁপড়ে হেঁটে গেলে দেখতে পায়। বিকেলের দিকে আস্তে আস্তে বলে, বাবু বাগানে জল দিলিনে? ঝিঙের ফুলগুলো টোটকা করে দিসনি?

আবার কোনদিন বা আপন মনে বলে, ধানে এবার থোড় এল তাই না? একদিন সন্ধ্যেবেলা শরতকে একা পেয়ে বলল, নতুন মাকে তো চেনা দিলাম না বাবু!

শরৎ সেই ফোলা মুখে খানিকক্ষণ চোখ রেখেও বুঝতে পারল না, ছেলের মুখে হাসি? না দুঃখু?

সেদিনই রাতে মিস্ত্রীপাড়ার দিঘির পাড়ে শিরিশতলায় এক সাধু এল। কেউ তাকে দিল লাউ। কেউ গাইয়ের দুধ। ভুবন মিস্ত্রী দিল—মরিচশাল ধানের খই আর নিজের গাছের মর্তমান কলা একজোড়া। শরৎ বেশি রাতে গেল। গোটা কয়েক ঝিঙে হাতে। তখন সেখানে কেউ নেই। রাতের লাস্ট ট্রেন চলে গেছে। গরুগুলো নিঃশব্দে একা জাবর কাটছিল। দূরে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের লাল বাতিটা তখন ধকধক করে জ্বলছে।

একেবারে অল্পবয়সী সাধু, লক্ষ্মণের চেয়ে দু'দশ বছরের বড় হবে। গিয়েছিল ছেলের কথাটা বলতে। যদি কিছু জানা যায়। কেউ কি বাণ মারল তার ছেলেটাকে? কেউ কি কোন শেকড় বাকড় খাইয়ে দিল? যদি জানা যায়!

কিন্তু সাধুকে দেখে শরতই জানতে চাইল, বে হয়েছে?

সময় পাইনি।

বে করনি। সংসার করনি তো জানবেটা কি।

সাধু তখন দাড়ি চুলকে স্বর্গের কথাটা পাড়ল। শরৎ খানিক মন দিয়ে শুনলো। একবার তার মনে হল, সাধু বুঝি বা এমন কোন খালের কথা বলছে—যার সন্ধান এখনো লোকজনে পায়নি। তাতে অনেক মাছ। আটল, হাতজাল নিয়ে গে পড়লেই হয়। চিংড়ি, পারসে, ভেটকি, ভাঙনে বোঝাই হয়ে যাবে।

ছেলের কথা বলতে গিয়ে শরৎ জানতে চাইল, স্বর্গ জায়গাটা কেমন? কেননা, সাধু যতই বলে যাচ্ছিল—শরতের ততই গুলিয়ে যাচ্ছিল। এখন শশা ক্ষেতে শেয়াল গড়াগড়ি দিচ্ছে। পিঠে যেখানটা উঁচু ঠেকবে—সেখানটায় লতাপাতার নিচে ঠিক শশা আছে। এর নাম স্বর্গ?

শরতের কথায় সাধু থতমত খেয়ে থেমে পড়ল। আবার বলতে গেল, স্বর্গ মানে—

তখন মাঠে মাঠে জোনাকি। শরৎ জানে—নতুন বেয়াই, নাতনি, ব্যাটার বউ এখন ঘুমোচ্ছে। জেগে আছে লক্ষ্মণ। কালো পাথরখানা হয়ে দাওয়ায় বসে। উঠোনে হয়ত এখন ছায়া-গোলা জ্যোৎস্নায় বেড়ালগুলোর খেলা দেখছে। বেড়ালরা এই সময় গোলার গা থেকে ইঁদুর ধরে এনে আধমরা করে ছেড়ে দেয়। তারপর উঠোনময় সেটাকে নিয়ে তাদের লাফালাফি দাপাদাপি। এর নাম স্বর্গ?

সাধু আবার বলল, স্বর্গ মানে—

শরৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, সেখানে কি বর্ষায় গোরুর পায়ে এসো হয় না? কোন গো-বদ্যি লাগে না?

তা কেন? সাধু নতুন কথা হাতড়াচ্ছিল।

তবে?

এই আধপাকা মানুষটার দিকে তাকিয়ে সাধু ভয় পেল। চোখজোড়া ধকধক করে জ্বলছে। ধুনির আলোয় মশা যায়নি। তাদের পিন পিন।

শরৎ বলল, সে জায়গাটা আমাদের এই জায়গার চে কোনদিকি ভেন্ন? তফাতটা কি? সেখানে জর হলি গা পোড়ে না?

সাধু বলল, তুমি কাল সক্কালে এস। সব বলে দেব।

'ছুচ্ছাতা' বলে ঝিঙেগুলো হাতে নিয়েই শরৎ ফিরে এল। লক্ষ্মণ তখনো বসে। সেও শুনেছে—কে এক সাধু এসেছে। টেনে টেনে বলল, সাধু কিছু দিল?

কি দেবে? জানলে তো।

শরতের ক্ষিধে মরে গেছে। ছেলের মুখখানা অনেকদিন দেখা হয় না। লণ্ঠন জ্বালিয়ে লক্ষ্মণের পাশে এসে বসল।

আলো সয় না চোখে। তুই শুগে যা বাবু।

যাচ্ছি রে। এখন কেমন বাসিস।

আর কেমন!

ভালো হয়ে যাবি দেখিস। তুই সেরে ওঠ। আবার বেগমপুর যাব। ধানে শিষ এল এবার—

জল আছে তো মাঠে?

সব আছে। সে চিন্তে আমার। তুই ভালো হয়ে ওঠ।

ঝিঙের কি দর যাচ্ছে বাবু?

বাইশ টাকা মণ।

আরও উঠবে দেখিস। তুই শুগে যা বাবু।

—এই যাই—

কথা শেষ হল না শরতের। আচমকা ডান পা তুলে লক্ষ্মণ লণ্ঠনটায় লাথি কষালো। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার।

করলি কি? বলে শরৎ লণ্ঠনটা কুড়োচ্ছিল। ঘরে নিয়ে গিয়ে ফের জ্বেলে আনবে। লক্ষ্মণের ফোলা মুখে তখন হাসি। ভারি পা তুলতে কষ্ট হয়েছে বলে একটু হাঁফাচ্ছিল। শরৎ ঘরে ঢুকতেই লক্ষ্মণ কোমর থেকে শিশিটা বের করল। ধানের পোকা মারার ফলিডল। গত সনে ক্ষেতে দিয়ে কিছুটা বেঁচেছিল। কুলুঙ্গিতে তোলা ছিল। আজ বউ ঘাটে নাইতে নামলে লক্ষ্মণ খুঁজে পেতে বের করেছে।

ব্যাটার বউ অসাড়ে ঘুমোচ্ছিল। শরৎ লণ্ঠনটা জ্বেলে নিয়ে ফের বারান্দায় এসে বসল। নীরদবরণ পঞ্চাশ টাকা পেলি তোকে আবার কলেজে ভর্তি করে দেবে। সবই তো হাতের লোক সেখানে ওর। ভোর হলেই মন আড়াই ঝিঙে পাইকেরের ঘরে তুলে দিয়ে নীরদবরণকে টাকাটা দিয়ে আসবো। হালের গরু গেল। পাশে দাঁড়াবার এমন মদ্দ ছেলেটার এই

অবস্থা। এখন যে করে হোক লক্ষ্মণকে খাড়া করা দরকার। মাঠে ধান। তিন বিঘের ভাণ্ডার—ঝিঙের বাগান। এ সব কে সামলাবে। ওকি? লক্ষ্মণ!

শরতের বুকের গর্তের ভেতর থেকে আওয়াজ চিরে বেরিয়ে এল। ও লক্ষ্মণ?

অনন্ত ঘুমোচ্ছিল। উঠে পড়েছে। তার মেয়েও উঠেছে।

লক্ষ্মণ ততক্ষণে কাত হয়ে পড়ে বাঁ হাতের নখে দাওয়ার নিকোনা মাটি খামচে ধরেছে। বুকের ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ে শব্দ দাওয়া দিয়ে গড়িয়ে পুকুরে নামতে লাগল।

শিশিটা কুড়িয়ে পেল অনন্ত। শরৎ সেটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল। লণ্ঠনের আলোয় ধরে বলল, ওঃ! সব্বনাশ।

তার চেঁচানিতে পাশাপাশি ঘরের জ্ঞাতিগোত্ররাও উঠে পড়েছে। লক্ষ্মণের মুখ দিয়ে নাল গড়াচ্ছিল। দু' চোখের জলের ফোঁটা এক লাইনে মিশে গিয়ে মাটিতে পড়ল, বাগানে জল দিসনি বাবু—

সবচেয়ে বেশি দৌড়োদৌড়ি করল লক্ষ্মণের খুড়ো। পঞ্চা খুড়ো। পঞ্চানন মিস্ত্রী। তার এককালের খেলুড়ে। এই সেদিন তো লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে যাদবপুর ঘুরে এসে সবাইকে বুক ফুলিয়ে বলছিল—ও সব্বনাশ! লক্ষ্মণের পহলা বউয়ের একেবারে রাণীর কপাল! দোবারা বে বসল। এখন দুহাত ভর্তি গহনা। হাত ঘুরোলি সোনায় দানায় ঝকমক করে—

নীরদবরণ এল না। কেউ না।

কোন ডাক্তারকে না পেয়ে পঞ্চানন যখন ফিরল—তখন পুবের আকাশে কাক উড়ছে। বলবান ধান গাছের গায়ের শিশির মরেনি। সব্‌জি আর মাছের ট্রেন দাপাতে দাপাতে স্টেশনে ঢুকলো। শরৎ বা অনন্ত—কেউ ঝিঙে তুলতে যায়নি বাগানে। লক্ষ্মণের খুকীটি সাত সকালে মুড়ির বাটি পেতে বসল। বউটা ঘরের দোর ধরে দাঁড়ানো।

ভুবন মিস্ত্রী বলল, এ মড়া তো কেউ ঘাটে নেবে না। লক্ষ্মণ তখন সবে যেন পাশ ফিরে শুয়েছে দাওয়ায়। ধুতির বাইরে বাঁ পাটা দাওয়া ছাড়িয়ে ঝুলছে।

দীনবন্ধু এ তল্লাটের অঞ্চলপ্রধান। রেশন কার্ড বিলি করে। সবাই মাটি কেটে এসে তার কাছ থেকে কালি করিয়ে নেয়। হিসেবে নিখুঁত। দলিল করাতে তার সাক্ষী নেয় সবাই। সে বলল, আত্মঘাতীর কেস। কোন ডাক্তার তো লিখে দিতে রাজি হবে না রে! তোরা বরং থানায় যা—

ওরাই কাটাছেঁড়া করে পুড়িয়ে দেবে। ঘাটের খরচ খরচার হাত থে বেঁচে গেলি শরৎ। তোর ছেলেটা বড় বুঝদার ছিল রে শরৎ। আহা-হা-হা! শেষ বেলায় সব বুঝেসুঝেই মরে গেল—

শরৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনলো। মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল, ও আমার সম্বন্ধী রে! এখন বিপদ যাচ্ছে। মুখ ফসকে কিছু বলে এখন শত্রু বাড়ানো বুদ্ধির কাজ হবে না। তুনিয়া দেখতে বড় সরল জায়গা। এখানে আসলে কিন্তু সাবধানে চলা চাই। সব দিকি নজর থাকা চাই। না হলিই মুশকিল।

থানায় গেল পঞ্চানন। তু'টো স্টেশন পরেই থানা। ফিরে এল সাটেলে। থানার ভ্যান এল তুটোয়। লক্ষ্মণ ততক্ষণে তিনগুণ ফুলে গেছে। এই অ্যাত বড় মাথা। অ্যাত বড় নাক। সব দেখে শুনে এ এস আইয়ের মনে খটকা লাগল। হলেও আত্মঘাতী। কিসের না কিসের রোগী। কিচ্ছু বলা যায় না। শরতকে ডেকে বলল, তুটো তো স্টেশন। লাইন ধরে সোজা পথে যাবি। ঘণ্টা খানেকের রাস্তা তো। থানায় পৌঁছে দে মড়া—

গাঁয়ের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে খালি ভ্যান ফিরে গেল। মাঠে শাদা রোদ্দুর। তাকানো যায় না।

পঞ্চানন তার প্রায় বাপের বয়সী দাদা শরতকে বলল, চল যাই শ্যামল বাঙালের কাছে যাই। এমন সময় কেঁদে পড়লি টাকা পাবি—

আমি যাব না। তুই যা—

লোকটার সঙ্গে ভা.' জ মতে ধান চাষ করে পঞ্চানন। ছিল বিদিশী। এখন প্রায় এ-দিশী। পুকুর কাটিয়ে শ্যামল বাঙাল লাথগঞ্জের ইটের পাঁজা পুড়িয়ে ঘর করেছে। পাকা বাড়ি। ইটের পাঁজায় আগুন দেবার সময় তিন ভরি গাঁজা কিনে দিয়েছিল। এখন তাড়ি খায় হাঁড়ি হাঁড়ি। ওদের কাছেই হাতেখড়ি। সময় অসময়ে চাইলে দেয়। দেশের নাকি ভাল করবে! যত্ত বাঙালে কাণ্ড! পঞ্চানন গিয়ে চাইতেই দশ টাকার একখানা নোট ধরে দিল শ্যামল বাঙাল। লোক ধরে নিয়ে থানায় যেতে হবে। এই পাঁচ মাইল রাস্তা তো মড়া নে যেতে হবে। একটা খরচ খরচা আছে না? পঞ্চানন চলে যাচ্ছিল। শ্যামল বাঙাল থামাল, কতবার শরতকে বললাম—চল হাসপাতালে ভর্তি করে আসি। আমার কথাটা শুনলে লক্ষ্মণ মরত না রে—

আর বোলো না বাবু। যত্ত বব্বরের কাণ্ড। সন্ধ্যে সন্ধ্যে ফিরে সব

জানাব। তোমার কি বাগানের মাটি কাটা হবে বাবু? বলতো কাল সকাল থেকে লাগি। আমরা পাঁচজনের একখাতা বসে আছি—

কেন? আর কোথাও কাজ নেই এখন?

কোথায় কাজ? ভুট্টা দু' টাকা ষাট! কাজ দেবে কে? সামনের দিন সকাল থে লাগি?

লাগ। কিন্তু এখন তো না কাটলেও চলতো আমার—

তুমি এট্টু দেখ আমাদের বাবু। এই সময়টা এট্টু দেখে যাও। ধান উঠলি সব ঠিক হয়ে যাবে—বলতে বলতে পঞ্চানন চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ থেমে বলল, তোমার পুকুর ধারের বড় মানকচুটা কে নিয়েছে জানো? লক্ষ্মণ আর বেচো মিস্ত্রী দুজনে খেয়েছিল। যাক, দুঃখু রেখো না, আমার ভাইপোটা খুব স্বাদ করে খেয়ে গেছে—

ভাত-ঘুমের ভেতর একবার যেন হরিবোল শুনতে পেল শ্যামল বাঙাল। আহা! লক্ষ্মণ এখনো তার চোখে ভাসে। এই তো সেদিন তার সাদা টেরিলিনের বুশ শার্টটা চেয়ে নিল লক্ষ্মণ। পুরনো সুতো খুলে যাচ্ছিল। আরেকবার সেলাই দিয়ে নিলে অনেক দিন চলতো। সেই শার্ট গায়ে দিয়ে লক্ষ্মণ আবার বিয়ে বসল। ফিরে এসে তার কাছে জমি চেয়েছিল। ভাগে করবে। চাষে বড় যত্ন ছিল। মন ছিল। ঘাসবুটি বেছে জমি তকতকে করে নিত। কত ফুর্তি। কত মেশামেশি। বড় মানকচুটা তাহলে লক্ষ্মণরা চুরি করেছিল।

সন্ধ্যের কিছু পরে বাঁধা ভাঁড়ের চার গ্লাস রস খেয়ে বেড়াতে বেরোল শ্যামল বাঙাল। ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছিল। অন্ধকার কেটে এবারে জ্যোৎস্না বেরোবে। পঞ্চাশের এখনো ঢের দেরি। তবু এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে ছড়ি। এসব নিলে বেশ সম্পন্ন গেরস্থ ভাবটা আসে। এখানকার লোকজনও তাতে বেশ মানে। পছন্দ করে। রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ধানকলের দেবেন এক-একদিন জানতে চায়—ও বাঙালমশাই! ধান উঠলি এবার কি দেবেন জমিতে? আমি বলি মুসুরি কড়াই ছড়িয়ে দিন। কোন হাঙ্গাম নেই। জলের বালাই নেই।

দেখি। আগে ধানটা তো উঠুক। বস্তা কত করে হবে মনে হয়?

একশো কুড়ি টাকা তো ছাড়িয়ে যাবেই—বেশিও হতি পারে—আপনি ওই মুসুরিই করুন। বোশেখ মাসে ডাল উঠে আসবে।

দেখি। চলতে চলতে শ্যামল বাঙাল ছড়ির ডগা এগিয়ে দেয়। টর্চের বোতাম টেপে। অর্থাৎ এবার আমি এগোই। এই গেরস্থ ভাবটা প্র্যাকটিস করতে এত আরাম। শহরে থাকতে এসব একদম জানা ছিল না। যে-মেয়েমানুষটি রেখেছে—সেটিও পালটানো দরকার এবার। এদেশের কথায় বাসি জলপাত্র তিতকুটে হয়ে যায় শেষে। সারাদিনের রোদে পোড়া সন্ধ্যের তাড়ি। ঠিক তিতকুটে নয়। তার মুখে আলুনি ঠেকে এখন। কিন্তু মায়া? বড় পাজি জিনিস। এই বাজারে তাড়ালে যাবে কোথায়? এখন ভাঙানো ভুট্টার কেজি দু টাকা ষাট। থাক্। থেকে যাবে। ঘরের কাজকর্ম করবে। ভালো জলপাত্রের খবর এসেছে একটা। নতুন পুকুরের ওদিক থেকে। বয়সকালের মেয়েছেলে। বনিবনা হচ্ছে না। ঠিকমত খেতে দেয় না। স্বামীর ঘর ভেঙে আসবে। কিছু ঝকমারি আছে। তা তো থাকবেই। কিসে নেই! ভাল জিনিসে ও একটু আধটু হবেই। হাঁটতে হাঁটতে শ্যামল বাঙাল ঠিক করতে পারছিল না—এবার জমিতে কি দেবে? চৈতি মুগ। না মুসুরি। এখানকার লোক বলে, মুসারি কড়াই। ডাল মাড়াই করে বের করে নেবার পর গাছগুলো হালের গরুতে খুব আদর করে খায়। বলকারী। এখানকার লোকে বলে, স্বাদিষ্ট। এখানে সব আগে আগে হয়। জন্ম। বে। এখানে অল্প বয়সে লোকে আত্মঘাতী হয়। আহা রে লক্ষ্মণ! আগে আগে চুল পাকে। দাড়ি পাকে। আগে আগে পটল তোলে সবাই।

বোতাম টিপতেই টর্চের আলোর ভেতরে পঞ্চানন মিস্ত্রী পড়ে গেল। দু' ধারের দোকানঘরগুলোতে এখন গাঁয়ের মানুষজন সওদা করতে এসেছে। সরষের খোল—দশ কেজি। নুন আড়াই শো। রাস্তা থেকে শোনা যাচ্ছিল।

হাত দিয়ে আলো আড়াল করে দাঁড়াল পঞ্চানন, দিয়ে এলাম বাবু। ওরাই পোড়াবে।

জর্দা-পান চিবোচ্ছে। সঙ্গে দিশির ভুরভুরে গন্ধ।

ক'জন গেলি? কোন জবাবের জন্য জানতে চায়নি শ্যামল বাঙাল। এই সময়টুকু একটু হাঁটা দরকার তার। এদানী বড় অম্বল হচ্ছে। পরিশ্রম কম। হাঁটাচলা না হলে তাড়িটা পেটের ভেতর খলখল করে।

আমরা সেই পাঁচজন। মাটি কাটার একখাতা।

কে কে ?

আমি, গণেশ, ভাসা, তুলসী আর হাজরা—কাল সক্কালে থেকো কিন্তু। ভোর থেকে কাটব—বলতে বলতে পঞ্চানন কাটলো। শ্যামল বাঙাল ঠিক করতে পারল না—এখন এতটা পথ নতুন পুকুর অবধি যাবে ? না ফিরে যাবে ?

পরদিন খুব ভোরে উষাকালের আলো তখনো ঠিকমত ফোটেনি। সূর্য আকাশে এলো বলে। শ্যামল বাঙাল উঠে দেখল, তার জলপাত্র চায়ের জল চাপিয়েছে সবে। তোলা বাসি জলে নিশ্চয়। মনটা খুঁত খুঁত করে উঠল। পই পই করে কতদিন বারণ করেছে, বাসি জলে চায়ের জল বসাবি নে—স্বাদ পাইনে—

ঘাটলার পুকুরের ওপারে একথাতা লোক তখন মাটি কাটছে। পঞ্চানন মাটি বোঝাই ঝোড়া তুলে দিল ভাসার মাথায়। সদ্য কাটা মাটি। সূর্য আসেনি বলে মোলাম আলোয় মাটির গা দেখা যাচ্ছিল। সকালটা একদম আলো দিয়ে ধোয়া। পরিষ্কার তকতকে। ঠিক করলো, আজই নতুন পুকুরে যাবে—

দাঁতনের জন্যে শ্যামল বাঙাল নিমের ডাল ভাঙতে বাঁ দিকে ঘুরতেই দেখল—শরৎ মিস্ত্রী আলে বসে আছে। হাতে বাজারের থলে। তার ভেতর থেকে শিশি বোতলের মুখ বেরিয়ে। উবু হয়ে বসে শরৎ ফলা ধানের নুয়ে পড়া শিষ হাত দিয়ে তুলে তুলে দিচ্ছিল। বোধহয় কাল কারও ছাড়া গরু খানিক জায়গা মাড়িয়ে দিয়ে গেছে। ধামসানো শিষগুলো ধানের ভারে শুয়ে পড়ে আছে। শরৎ মিস্ত্রী একটা একটা করে সাবধানে তুলে দিচ্ছিল। তার হাতে খুব আদর। তোয়াজে তোয়াজে দু'একটা শিষ খানিক খানিক খাড়া হল।

মুখ তুলে তাকাতেই শ্যামল বাঙালের সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল। শরৎ উঠে দাঁড়াল। ক'দিন দেখতি পারিনি। গাছ একদম শুয়ে পড়েছে বাবু।

ধান তো ভাল হবে শরৎ।

মন তো তাই বাসে। সব শিষ পোষেনি। দেরি আছে এখনো। আরও পুষবে। পুষ্ট হবে দানা আরও—

শরতের বাজারের থলের ভেতর একজোড়া খালি শিশি নড়েচড়ে ঠুঙঠাঙ করে উঠল। যাই বাজার যাই বাবু। কন্‌ট্রোলে কেরোচিন এল ?

শুনছি তো।

হাজরা নস্করের যাত্রাসঙ্গী

গোহাটায় গিয়ে হাজরা নস্করের মাথা খারাপ হয়ে গেল। শনি মঙ্গলে শাকসারের হাটে চৌদিকের গোরু এসে জমা হয়। বিরাট বিরাট পিপুল গাছের ছায়ায় জায়গাটা আগাগোড়া মোলায়েম হয়ে আছে। তার ভেতরে এখানে সেখানে চক্কর চক্কর রোদ্দুর। গাছগাছালি ফুঁড়ে সাদা, লাল, কালো বলদগুলোর গায়ে এসে পড়ছে। দালালদের ছাতার ডগায় সরু সরু পিন বসানো। তা দিয়ে খোঁচাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে লেজ তুলে লাফিয়ে উঠছে।

এর মধ্যে দেখেশুনে কেনা কঠিন কাজ। কোমরে পাকানো নোটের গোছার ওপর দিয়ে গামছাখানা কষে বেঁধে নিল হাজরা।

বিকেল পড়ে আসছে। এই বেলা বলদের দাম নামবে। আষাঢ়ে বেলা তাল নারকেলের উঁচু সারির মাথায় ঝুলে আছে। দালালরা সারাদিন ব'কে ব'কে মুখের থুথু তুলে ফেলেছে। এখন পড়ে থাকা বলদগুলো নিয়ে ফিরতে হবে।

গাঁয়ের হালদার বামুন কার শ্রাদ্ধে একটা এঁড়ে পেয়েছিল। তিন বছর আগে সেটা তিরিশ টাকায় কিনেছিল। খেয়ে পরে তা এখন ভাগড়াই। সযুত একটা বলদ পেলেই হাল জুড়বে।

নিজের হাল নেই বলে ভাগে জমি পায় না হাজরা। নতুন বর্ষায় ঝারিকপোতা, মৈত্রী আবাদ, ভাসা বাদার মাটি মাখন হয়ে উঠেছে। গোরুর পা পড়লে বজ বজ করে ওঠে। অথচ আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র—চাষাবাদের তিন তিনটে মাস পরের জমিতে গতর খেটেই কাটে হাজরার। তারপর কাজ থাকে না আর। সেই কার্তিক পেরিয়ে ধান কাটার সময় আবার কাজ মেলে, পান্তা মেলে, শুকনো শরীরটা রসে ফুলে ওঠে আবার।

ইটখোলার পগমিলে মাটির তাল চাকা ঘুরিয়ে সরেস করা হয় বলদ জুতে। এক সন গেলে সে বলদের আর কিছু থাকে না। হাজরা প্রায় কিনে ফেলেছিল। কি সন্দেহ হতে ঘাড়ে গলায় হাত বুলিয়ে দেখল। ওরে বাবা! আরেকটু হলে পথে বসেছিল। এ বলদ তো দুপা হাল টানবে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিরোবে! তিনপো জমি সিধে সামিল করতে না করতে সূর্য আকাশের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবে।

তখনো দালাল বলদটাকে হাঁটিয়ে দেখাচ্ছিল, নিয়ে যাও বললাম—খুব লাভ হবে। ফি সন ষোল বিঘে জমি কাড়াবে। মাঝে মধ্যে হাল বেচেও পয়সা আসবে। এক বর্ষায় দাম ফিরে আসবে হাতে—

'খুব ভালো জিনিস ভাই। তোমার শ্বশুরকে দিও।'

দালাল বুঝলে, সুবিধে হবে না।

হাজরা অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সাতবার নিচের পাটির দাঁত দেখে একটা পেট মোটা সাদাপানা বলদ কিনল। গুনে গুনে একশো ন'টাকা দিল। তারপর পশ্চিম দিকে মুখ করে বাপের নাম নিল—নতুন দড়ি গলায় বেঁধে দিয়ে বলদের লেজে এক মোচড় দিল।

তখন আকাশ লাল করে দিয়ে সূর্য ফস করে ডুবে গেল। পাখিরা যে যার বাসায় ফিরে যাচ্ছে। বলদ কেনার ছাড়পত্রখানা কোমরে গুঁজে হাজরা নস্কর হাঁটতে লাগল। আগে আগে বলদ। পৌঁছতে রাত কাবার হয়ে যাবে। কিংবা আকাশে তারা থাকতে থাকতে সাহেবপুরের মাঠ পেরিয়ে যাবে। সেখান থেকে আরও চারপো পথ।

তারপরেই হাজরাদের বাড়ি। শরিকানি পুকুরের গা ঘেঁষে একফালি পথ। তার গায়ে একটা সজনে গাছ। উঠোনে কর্তাদের আমলের গোলা কাৎ হয়ে ভেঙে পড়েছে। সরানো হয়নি। দুটো লোক ধরে নিয়ে সারাদিন খাটলে তবে উঠোন থেকে ভাঙা গোলা তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া যায়।

পিচ রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে পায়ের তলা গরম হয়ে উঠল। হাজরা তাই ঘাসে ঢাকা পথ ধরে এগোতে লাগল। দু'ধারে সদ্য রোয়া মাঠ। জায়গা বদলানো ধান চারাগুলো এখনো ফ্যাকাশে ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অ্যাই ছাখো। আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। হাজরা আচ্ছাসে লেজে মোচড় দিল। অমনি চার পাঁচমনি বলদটা সামনের পা তুলে লাফিয়ে

উঠেই হাটা ধরল।

এসো বাবা! এখন কদমে কদমে লাফিয়ে চল। সারা দুনিয়া এখন ভিজে কাঁই হয়ে আছে। হালে জুড়ে তোকে আমি সারা মাঠ নেচে বেড়াব। মই জুতে তিন চক্করে বিঘে ঘুরে আসব।

এখন বড় বড় জলের ফোঁটা মাটিতে পড়ে গেঁথে যাচ্ছে। পাতি ঘাস গোরুর খুরে খুরে পাঁক মাটির ভেতর চাপা পড়ে যাবে—সার হয়ে জমি বলকারি হবে। তখন ধান ছুড়ে দিলে ঠেলে উঠবে।

এলো মাঠে নেমে পড়েছিল। হাজরা ছুটে যেতেই পথে ফিরে এল। নতুন বৃষ্টিতে পথের দু'ধারে কচি ঘাসের চাপড়। বলদটা থেমে থেমে মুখ নামাচ্ছিল।

চল বাবা। বাড়ি পৌঁছে নিই। তোমার জন্যে গোয়াল ঘরের খানিক জায়গা মাটি দিয়ে উঁচু করে দেব। জাব দেওয়ার জন্য মাটির মেছলা বসবে।

খানিক পথ হাটে হাজরা আর থেমে থেমে জবাব দেয়। হাটুরে লোকরাই থামায়। কত নিল? কেউ বলে, ক'বছর বয়স হল? ক'টা দাঁত? দু'একজন পিঠে একটা চাপড় দেয়—নয়ত লেজ মুচড়ে দেখে। হাজরার তখন আর নিজেকে হাজরা নস্কর বলে মনে হয় না। সেও একটা কেউকেটা। আস্ত একটা বলদের মালিক।

না জানি গাঁয়ে ঢুকলে কি হবে। এখুনি বুকের ভেতরটা কখনো ঢিপ ঢিপ—কখনো দপ দপ করছে। হাটতে হাটতে এক সময় চন্দনেশ্বর বাজারের কাছে কোমপানির দিঘির পাড়ে এসে পড়ল। বলদটা জল খেল আগে। তারপর হাজরা মুখ ডুবিয়ে খেল। উঠে আসার সময় দিঘির জল কিছুটা থিতোতে দিল। সেখানে সূর্য ডোবা আলোয় মুখের ছায়া দেখতে পেয়ে হাজরা থমকে গেল। মোটা জলের ভেতর দিঘির বুকের পাণ্ডব মাটি চুপ করে পড়ে আছে। সেখানে তার মুখখানা ভেসে উঠল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ছায়ায় চোখের জায়গায় দু'দলা অন্ধকার। রোদে জলা কপালের ওপর এক ছোপ চুল এসে পড়েছে। ভালই তো দেখাচ্ছে।

এই সময় হাজরার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। হঠাৎ হোঁচট খেলেও সময় সময় তার এমন হয়। আজ যদি বাবা বেঁচে থাকত। কাল দুপুরেই সে হাল জুতে মাঠে নামবে। অথচ দেখার মত কেউ নেই। খগেন নস্কর গত কার্তিকে ফলিডল খেয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মরেছে। আর ক'টা

মাস বেঁচে থাকলে হাজরাকে হাল জুড়ে বাদায় নামতে দেখতে পেত।

গলা ছেড়ে কাঁদতে পারলে বেঁচে যেত হাজরা। এখন কাঁদার উপায় নেই। থরো থরো হেঁটে গাঁয়ে পৌঁছতে হবে। ছাড়পত্রখানা কোমরে গোঁজা আছে। ক্রেতা: হাজরা নস্কর। সাং: শোলগোহালিয়া। জিলা: ২৪ পং।

রাত আটটার গাড়িটা বহুদূর দিয়ে গাছপালার আড়ালে ঝমঝম করে চলে গেল। হাঁটতে হাঁটতে তার বাঁশীর আন্দাজ পেল হাজরা। ততক্ষণে মেঘ ফাটিয়ে জোর জ্যোৎস্না বেরিয়ে পড়েছে। এখন কোথাও জিরিয়ে নিতে পারলে ভাল হত।

প্রতাপনগরের মজা খালের ধারে মোটা গুঁড়ি শিরিষ গাছটার নীচে বসে পড়ল। এই বৃক্ষ তার মত কত মানুষজনের যাতায়াতের সাক্ষী। বুড়ো হাবড়া—তবু কত ডালপালা। রস আছে।

গলার দড়ি টেনে ধরতেই বলদটাও বসে পড়ল। মোটা চাল একপালি চার টাকা চার আনা। খুদের কেজি এক টাকা দশ পয়সা। আটা ভুট্টাও কেজি এক টাকার নীচে নয়। বউ দু'টো, খোকাখুকু, বেওয়া মাকে ধরে সারা সংসারে দিন গেলে অন্তত তিনটে টাকা চাই। তারপর আছে বিড়ির পাতা, তামাকের জন্যে সারাদিনে কম করেও বিশ পয়সা।

কোমর থেকে এক গোছা আটার রুটি বের করল। তাতে গুড় মাখিয়ে দু'খানা বলদটার মুখে ধরতেই জিভ এগিয়ে গালে ভরে নিল। ক্ষিধে পেয়েছিল। তারপর হাজরা আর তার বলদ কচর মচর করে রুটি চিবোতে লাগল। বলদটা গিলে ফেলে লম্বা মুখে হাজরার নাকের কাছে তার নাক এগিয়ে দিল। হাজরা বড় জন্তুটার গন্ধ পেল নাকে। বড় মজার গন্ধ। ধানে থোড় এলে—গর্ভ হলে—শিষ বেরোনোর মুখে এমন গন্ধে সারা মাঠ ম ম করে ওঠে।

এক সময় রুটি ফুরিয়ে গেল। তবু হাজরার মুখের দিকে বড় বড় চোখ তুলে নাক এগিয়ে দিয়ে জন্তুটা তাকিয়ে আছে। গোরুর গাড়িতে বাঁশ যাচ্ছিল ক্যাচকোচ করে। জ্যোৎস্নায় রাতচরা পাখি বেরিয়ে পড়েছিল কয়েকটা। ওদের ভেতরে একটা আনাড়ি ডেকে উঠল। মজা খালের দু'ধারে নাবাল জমিতে সদ্য সামলা-রোয়া ধান স্থির হয়ে দাঁড়ানো। সারা তল্লাট জুড়ে সবুজ ধানচারাগুলো এখন মা বসুমতীর বুকে আপনা আপনি

শেকড় নামিয়ে দিচ্ছে—তার একটা চিনচিনে শব্দ—শিকড় নেমে পড়ার আওয়াজ হাজরা নস্কর ছায়া-গোলা জ্যোৎস্নায় বসে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল।

সন্ধ্যের পর পাতলা আলোয় আরও এমন অনেক কিছু সে টের পায়। তার কানে যায়। সব কিছু সে গুছিয়ে বলতে পারবে না। বুঝিয়ে বলতে পারবে না। তবু সে বোঝে। সে জানে। কাউকে কোনদিন বলেনি।

তাদের পরিবারের জীবজন্তুর ভাগ্য বড় ভাল নয়। কুকুর পুষলে বাঁচে না। হাঁস পুষলে খালের জলে নয়ত বাদায় চরতে বেরিয়ে আর ফেরে না। একটা খুব ন্যাওটো কুকুর ছিল। তাকে কারা মুখুণ্ডী করে দিল। কুকুর আর ডাকে না। কি খাইয়ে দিয়েছিল কে জানে! শেষে সাহেবপুরের গেজেল পালান চোনা শেকড় খাইয়ে কুকুরটার স্বর ফিরিয়ে আনে।

তাও বাঁচাতে পারেনি। মাস খানেকের ভেতর কে আবার বাজবরণের আঠা খাইয়ে দিল। কুকুরটার সারা পেট পচে ঢোল। ছাঁচতলায় চুপচাপ পড়ে থাকল তিনদিন। বিকেল হলে পেট অব্দি পুকুরের জলে ডুবিয়ে বসে থাকে। বড় যন্ত্রণা। চোখে দেখা যায় না। হাতে পয়সা নেই। ডাক্তার বদ্যি আর হল না।

মরার আগে কুকুরটা গিয়ে লেজ লম্বা করে দিয়ে বড় রাস্তায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। হাজরা কোলে করে ঘরে আনতে গেল। উঠল না। মুখ তুলে অনেক কষ্টে একবার হাজরাকে দেখল। আবার মাথা নামিয়ে দিল। তখন লাস্ট ট্রেন বেরিয়ে গেছে। সেদিন সারারাত হাজরা বিছানায় মটকা মেরে পড়েছিল। ঘরের বাইরেই চুচকো ঘাসের জঙ্গল অন্ধকারে নাগাড়ে বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছিল।

ভোরে উঠে মরা কুকুরটাকে খালের জলে টেনে ফেলে দিয়েছিল। তারপর আর অনেকদিন কোন কিছু পোষেনি। তা এবার বলদ একটা তার দরকার ছিল খুব। যার কাছেই ভাগে জমি চায়—সেই বলে, তুই চাষ করবি কি দিয়ে! হাল গরু নেই। চালে খড় নেই তোর। বীজধান নেই। দিলেও খেয়ে ফেলবি।

ভাগে দু'একবার জমি যে পায়নি তা নয়। কিন্তু হাল ভাড়া করে কস্মেও সুবিধে করে উঠতে পারেনি। ক্ষেতে পোকার দৃষ্টি পড়ে সব খাক হয়ে গেছে। শেষ অব্দি শুধু খাটুনিই সার।

কিন্তু এবার। মিস্ত্রীদের বলে কয়ে চার বিঘে জমি করেছে। কালই হালবলদ দেখাতে হবে তাদের। আস্তে আস্তে নতুন জীবটির গলায় হাত রাখল। বড় কান ঝাপটে হাজরার গালে চাপড় দিল বলদটা। গলকম্বল সুদ্ধ দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে খুব গদগদ হয়ে বলল, তুই আমারে দেখবি তো বাপ—

বলদের কালো রঙের নরম নাক হাজরার গলায় লেগে লালায় মাখামাখি হয়ে গেল। তখনি টের পেল সেই ক্ষেত ম ম করা গন্ধটা চৌদিকে চারিয়ে যাচ্ছে। নাকের ভেতর ঢুকে তার মনে খুব স্বাদ লাগল।

কার গোয়ালে ছিলি বাবা অ্যাদ্দিন ?

বলদ কোন জবাব দিল না। তার ঘাড়ে গলায় কানের নীচে এঁটুলির ঝাঁক কষে কামড়াচ্ছিল। রক্ত শুষে নিচ্ছে। হাজরাব হাতেও দু'একটা লাগল। লাগতেই ছেড়ে দিয়ে উঠে বসল, 'ও হরি! তাই বল।' তারপর হেসে বলল, 'কোন চিন্তে নেই। একবার বাড়ি পৌঁছই—তারপর ওষুধ হবে'খন।'

সেই রাত্তিরেই ওরা দুজনে রওনা দিল। হাজরা আর তার বলদ। মাথায় দুখানি শিঙ। কালো রঙের দুটি ফলা মাথায় ধরে এগোচ্ছে। পেছনে একটা মানুষ! সে শুধু মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে। পথের দু'ধারে এখন কোন লোক নেই। এই ক্ষয়াটে জ্যোৎস্নায় পিচের রাস্তাটা সারা দুনিয়া ঘুরে ঘুরে এখন কেমন সুন্দর তারই জন্য একেবারে তাদেরই দেশগাঁয়ের দিকে চলে গেছে। ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে যায় হাজরা। তাদের পঞ্চাননতলায় ভগবানের নামগানে—বাপের ঘোড়া হাতে লব যখন রামের মুখোমুখি হয় —কেউ কাউকে চেনে না—হাজরার ভেতরটা আপনা আপনি তখন দুমড়ে মুচড়ে ওঠে, কোমরের গামছা খুলে চোখ মুছতে হয়। তখন পরিষ্কার বোঝে, এই রাম লক্ষ্মণ, সাত পুরুষের ভিটে, হাল বলদ, এই পথ, বিদ্যেধরীর মজা বুক—এ-সবই এক—কখনো পালটায় না। গাছপালায়, মেঘে মাটিতে এক-রকমের দুঃখ মেশানো থাকে—ঠিক বাসি ভাতের পান্তা—তার আন্দাজ সব সময় পাওয়া যায় না। একবার পেলে লোকজনের ওপর আর রাগ হবে না। মানুষজনকে নিন্দে করতে দেখলে বড় মায়া হয় তখন।

এবার অভাবটা বড় বেশী টের পাওয়া যাচ্ছে। বড় মেয়েটার মুখে আটার পায়েস আর রোচে না। মাঘ মাসে উত্তরে ইঁট কাটতে যাবে।

ইট কাটায় বড় কষ্ট। রাত থাকতে—সন্ধ্যেতারাটা যখন নতুন পুকুরের ইটখোলার আকাশে জ্বল জ্বল করে জ্বলে—তখন থেকে ফর্মায় সাদি বালি মাখিয়ে উটকো হয়ে বসে ইট বানাতে বসবে। বেলা ন'টা দশটা বাজলে তবে সাত আটশো ইট হবে। তারপর আবার জল কাদা ঘেঁটে জাব তুলে রাখতে হবে। তবে ছুটি। নিজের কাছেই নিজের ছুটি। ফুরোনের কাজ। একটু ঢিলে দিলে আর পড়তায় পোষাবে না।

ভাদ্র মাসে এক একবার বুড়ি মারে। তখন বৃষ্টি আর থামে না। দেশ-গাঁ ভেসে গিয়ে তবু কিছু মাছ চিংড়ি হয়। ভোর ভোর খোটিতে গিয়ে কাঁটায় চড়িয়ে দিলে ওজন দৃষ্টান্তে পয়সা আসে দুটো। সে সময় বড় বড় গাছের গা ভিজে সড়সড় হয়ে থাকে। নালশে পিঁপড়ের বাসা অযথা বৃষ্টিতে গোড়া আলগা হয়ে খসে পড়ে। ডিমসুদ্ধ পিঁপড়ের আণ্ডিল থই থই জলে টান বুঝে ভেসে চলে। খাবার লোভে বোয়াল মাছ গন্ধে গন্ধে পেছনে ছোটে। রাত হলে ভাসা বিলিতি পানার কালো সবুজ পাতার ডগায় আলো জেলে জোনাকি বসে থাকে কখনো কখনো। বড় বড় বাঁওড়ের চারধার দিয়ে জামরুল, আঁশফল, বুনোজামের অষ্টাবক্র ডালগুলো ঝড়ে জলে কুঁজো হয়ে পাতা মেলে ধরে জলের একেবারে কিনারে নেমে আসে। অষ্টপ্রহর টুপ-টাপ টুপ-টাপ শব্দ করে জল পড়ে সেখানে। এসব জায়গায় ঝাঁক ধরে কই মাছ ভেসে ওঠে কোমর জলে।

মানিক মিস্ত্রীর বড় ছেলেটা বিষ্টু, তারই বয়সী, ভাদ্র মাস থেকে সেই পৌষ মাস অবধি সারা রাত ঠাণ্ডা খেয়ে খেয়ে মাছ ধরত। বুকে দোষ হয়ে যায় শেষটা। একদিন মাঝরাতে তাকে ঠেলে তুলল। 'বিষ্টু—চল, পোলোটা নে—কই ভেসেছে।' ঘুম-চোখে দুজনে গিয়ে পোলো হাতে বাঁওড়ের কোমর জলে নেমে গেল। মাঝরাতে শুধু ঝিঁঝির ডাক আর জলের টুপটাপ। একেবারে বুক-জলে এসে দেখল কোমরে লটকানো খলুই মাছে বোঝাই হয়ে গেছে। কিন্তু বিষ্টু কোথায় ?

ভালো কথা—বিষ্টু তো আর নেই। বৈশাখের গোড়াতেই কলজে ফুটো হয়ে কলকাতার কলেজে মরে গেছে। রাজপুরে সবাই মিলে পুড়িয়ে এল। হাজরার হাত থেকে পোলো খসে পড়ে জলে ডুবে গেল ; তাতে তখনো অনেক মাছ। হাজরা আস্তে আস্তে জল ভেঙে সেই মাঝরাতে বাঁওড়ের কিনারে এসে দাঁড়াল। পা আর চলে না। ঝুপসি গাছপালার গা দিয়ে

জল পড়ে অনবরত শব্দ হচ্ছিল—টপটপ, টপটপ, টপটপ। বাড়ি ফিরে ভোরবেলা তাই জ্বর এল—একেবারে সান্নিপাতিক। যমের দুয়োর ঘুরে ফিরে এল।

বিষ্টু বড় ভালো ছিল। বাপ মানিক মিস্ত্রী অভাবের সময় গাঁ-সুদ্ধ লোকের কাছে ধানবাড়ি করে। দেড় মণ ধান দিয়ে চাষ উঠলে দু'মণ নেয়। লম্বা উঠোনে তিন তিনটে গোলা।

বিষ্টুর কচি বউটা বেওয়া হয়েও বছর দু'তিন ছিল। বাপের বাড়ি সবদিন হাঁড়ি চড়ে না। যাবে কোথায়? পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। শ্বশুরকে বাবা ডাকায়। পেটে কিছু ধরেওনি। মানিক মিস্ত্রী লাথি দিয়ে তাড়িয়ে দিল। এখন নাকি আবাদে কার সঙ্গে ভেগে চলে গেছে—সেই সে নদীর ওপারে—লাট অঞ্চলে।

সেই পাপে মানিক মিস্ত্রি খোঁড়া হয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই—আপনাআপনি ডান পাখানা ফুলে গিয়ে ওই চিত্তির। এখন লেংচে লেংচে হাঁটে—কার্তিক মাস পেরোলেই সুদের তাগাদায় গাঁয়ের রাস্তায় ঘুরে ফেরে—তবে দিনে দিনে। মনে বড় সন্দেহ—অন্ধকার হলে কেউ যদি পাবড়ার বাড়ি মেরে খাল ধারে ফেলে রেখে যায়—আলো না ফুটলে কেউ টেরও পাবে না। জমি দেওয়ার সময় হাজরাকে বার বার বলেছে—ধর্মে মতি রাখিস—যার যা নিবি গুনে গেঁথে ফেরৎ দিবি। তবে না মানুষ।

অমন বাপের এমন ছেলে। কুস্তিয়ায় বাজির কারখানা পেরোলেই কুণ্ডুর ঘেরি—বিদ্যোধরীর চর—দশ বিশ হাজার বিঘে জমি চাঁদের আলোয় হাল্লাট হয়ে পড়ে আছে। দুদল দুবার বিলি করেছিল। পতাকা উড়ল দু' রকমের। একদল রোয় তো অন্য দল কেটে নেয়। এখন পুলিশ ক্যাম্প বসেছে। এবার আর হাল পড়েনি। গোছ পুতে দিলেই ধান হয়। বড় সারি জমি। বড় জুড়ি জায়গা। শেষ দিকে এক এক বছর ধান রাখা দায় হয়ে ওঠে। গাছ হয় অ্যাই অ্যাতো মোটা মোটা। সামলানো যায় না। শুয়ে যায়। চিটে হয়।

জায়গাটা ঘুরে মোড় নিতেই বিষ্টুর জন্যে মনটা হু হু ক'রে উঠল। আলাদা ঘর তুলে উঠে যাবে বলে বিয়ের বছরেই লাখগঞ্জের ইট বানিয়ে পাঁজা পুড়িয়েছিল। তাই নিয়ে বাপে পোয়ে খটাখটি লাগে। কে না জানে। পাঁজা আর খোলা হয়নি। তিন সনের বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে

বাইরেটা এখন গলে পড়েছে। ওপরে অশ্বত্থের ঝুরি গজিয়েছে। শীতের গোড়ায় বাতাস পেয়ে ডালপালা নিয়ে তারা দোলে।

নে বাবা আর খানিকটা চল। সামনের তালডাঙা পেরোলেই সাহেবপুরের মাঠ। ফাস্ট ট্রেনের বাঁশির আগে আগে ঘরে পৌঁছতে হবে। বাড়ি ফিরেই তোর একটা ওষুধ করে দেব।

বড় মজার ওষুধ। মলম নয়। বড়ি নয়। গুঁড়ো নয়। মিকচার নয়।

নিজে নিজেই ফাঁকা মাঠে এক কিস্তি হেসে নিল হাজরা নস্কর।

হু হু বাবা বড় মোক্ষম ওষুধ। এর আর মার নেই। শুধু চাই একখানা কাগজ। আর হাতখানেক লাল সুতো। পোকায় খসে পড়ছে গরু— এঁটুলিতে রক্ত শুষে গরুর দফা নিকেশ করে দিল—এ দাওয়াই দিলে তিন দিনে সুস্থ। ডাক্তার বদ্যির কোন দরকারই নেই। ভিজিটের টাকাও লাগবে না।

এবার হাজরা আগে আগে হাঁটতে লাগল। হাতে দড়ি। বলদটা পেছন পেছন দৌড়চ্ছে। নে বাবা খরো খরো হাঁট। বলেও নিজে হাঁটতে পারছে না হাজরা। শরীরে তো বিশেষ কিছু নেই। আজ ক'মাস ছাই মন্দ যা কিছু খেয়ে গুনে গুনে টাকা জমিয়েছে। নিজের বলদ চাই। ভাগের জমি কাড়িয়ে নিয়ে হাল বিক্রী করবে। ন'টার গাড়ি না আসতেই গরু তুলে দেবে। পাঁচ চাষে এক বিঘে জায়গা সিধে করে দিয়ে গালে থাপ্পড় মেরে পঁচিশটা টাকা গুনে গুনে নেবে। বিকেলটা ফাঁকা। তখন মাছ ধরবে। চাই কি যাতে কালার খড়ো ঘরে ঢুকে ঠাওায় ঠাওায় তাল ঠুকে গাঁজা টানবে! এতদিন পরে তা সত্যি হল। বড় খুকিটা ঘুম ভেঙে সকাল বেলায় উঠানে বাঁধা বলদ দেখে ছুটে আসবে। ছোট খোকা এখনো হামা টানে। খুব সাবধানে রাখতে হবে। বলদটার গায়ে হাত রাখল। সেই অবস্থাতেই হেঁটে চলেছে। গেরস্থর সবাইকে চিনতে কিছু সময় নেবে। ততদিন খোকাকে সামলে রাখতে হবে। নয়ত চাই কি গুটি গুটি হামা দিয়ে নতুন বলদের পেটের নিচে গিয়ে পড়ল। তবে তো হয়ে গেল।

কচুঘেঁচু খেয়ে এ কটা মাস বুক বেঁধে টাকা জমিয়েছে। আর খুব সাহস করে উঠোনের বাইরেই ছেঁচতলায় ছ'পালি ধান তুলে ফেলেছে। হরিমতি ধান। বীজ ভেঙে তুলে নিয়ে কোনক্রমে রুয়ে দিতে পারলে কার্তিক পড়তেই রাঙঝাল দেবে। অঘ্রাণের আগেই পেকে যাবে। শুধু কেটে তোলা। ভাগের

ধান খোঁড়া মিস্ত্রীকে বুঝিয়ে দিয়ে বাকিটা ঘরে নিয়ে যাবে।

সাহেবপুরের মাঠ আর শেষ হয় না। পুবের আকাশ খানিক পরে-ই লাল ডগডগে হয়ে উঠবে। এ হল গিয়ে অফলা ডাঙা। জল দাঁড়ায় না। মাঝে মাঝে কাঁটাওয়ালা বাবলা, শেয়াল কাঁটার ঝোপ। খটখাট সাদা বন-বেড়ালের একটা মাথা পড়ল। জলে রোদে ধুয়ে গিয়ে চোয়ালের ছুঁচলো হাড় এই নিরাকার মাঠে পড়ে আছে। এমন অনেক মাথা, হাড় এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। ছোট খোকারা মারা গেলে এখানেই পুঁতে দিয়ে যায়। সেই সব সদ্য খোঁড়া কাঁচা মাটিতে শ্বেত আকন্দের ঝাড় বসেছে—কোথাও বা ধুতরো ফুল ধরে আছে। পাখিদের সব অনাছিষ্টি কাণ্ড। হাজরা ভেবেই পায় না—ওরা কি জন্ম-মৃত্যু কিছুই মানে না। লোকালয়ের বাইরে পুরনো দিঘি পেলে ডাক পাখিগুলো কেমন মেয়েছেলের ধারা ডুব দেয়, গা ঝাড়ে আপন মনে, তারপর যে যার মত গলা তুলে ডাকতে থাকবে—ছোটবেলায় গরু চরাতে গিয়ে আবাদে নিজেই দেখেছে হাজরা।

লালচে ক্ষয়া ক্ষয়া দুব্বোর ঝাড়ে পায়ের হাজায় কাঁটা হয়ে ফুটে যাচ্ছিল। এক গেরো। কিছুতেই জোরে হাঁটা যাচ্ছে না। টিবি জায়গা ঘেঁষে এগোতেও সাহসে কুলোলো না। সেখানে সব শামুক ভাঙা গেড়িগুগলি খোর হাঁসাটে কেউটের আড্ডা। ওরা বর্ষাকালে ডাঙা খুঁজে খুঁজে বাসা পালটায়। একটু নীচু জায়গায় জল জমেছিল। বলদটা সেখানে গিয়ে মুখ নামাল।

হাজরাকে দাঁড়াতে হল। চোয়ালের হাড় জেগে গেল খুব—বলদটা অতবড় মাথা নামিয়ে জলে নাক গুঁজে দিল। দাবনার ওপর থেকে সেই ফাঁকে তিন তিনটে এঁটুলি তুলে ফেলল হাজরা। বড় কষ্ট পাচ্ছে। বাড়ি পৌঁছেই ধীরেন মণ্ডলের ছেলে কাত্তিকের ওখানে যাবে।

কাত্তিক লেখাপড়া জানে। ছোট বয়সে ওদের বাড়ি হাজরা রাখালি করেছে। খড় কেটে, গোয়াল কাড়িয়ে কার্তিককে কোলে নিয়ে ঘুরতে হত। বড় আখুটে ছিল। এখন গাঁয়ের স্কুলেই পড়ায়। পার্টি করে। সভা করে, লেকচার দেয়। তার কাছে গিয়ে একখানা সাদা কাগজে মানিক মিস্ত্রী আর এ তল্লাটের আরও নামী দু'জন সুদখোরের নাম লিখিয়ে নেবে। তারপর কাগজখানা লাল সুতোয় বেঁধে বলদের শিঙে ঝুলিয়ে দেবে। তিন দিনের ভেতর পোকা থাকুক—এঁটুলি থাকুক—বলদের গা থেকে সব কিছু

ঝরে পড়ে যাবে।

সাহেবপুরের মাঠ আর শেষ হয় না। খানিক পরে পাখিরাও জেগে যাবে। হাজরার বুকের ভেতর দিয়ে একটা কথা পাকিয়ে উঠল। কার্তিকের কাছে যাবে না। এই সেদিন ছেলেটার বে গেল। সানাই বাজিল। গরীব কাঙ্গালীরা এঁটো পাতা কুড়োলো। হাজরা যায়নি। আশা করেছিল--তাকে বলবে। একটা কাঁচা টাকা তুলে রেখেছিল। কার্তিকের বউর মুখ দেখে হাতে দেবে। কার্তিক ডাকেনি। তার কোলে কোলে থাকত ছেলেটা। পোঁটা পড়লে কতবার কোমরের গামছা দিয়ে নাক মুছিয়ে দিয়েছে।

এ তো বড় ঝামেলার মাঠ। ফুরোয় না। ফিকে অন্ধকারে সাহেবপুরের অফলা ডাঙ্গা একটু একটু করে ভেসে উঠছে। বলদ আর এগোয় না। হাজরা লেজের কাছে দাঁড়িয়ে পাঁকে বসে যাওয়া গোগাড়ির চাকা ঠেলে দেওয়ার ধারায় বলদটার দুই দাবনা ধরে ঠেলতে লাগল। একেবারে কাজল পরানো দুই চোখের কোলে বড় বড় জলের ফোঁটা এসে থেমে আছে।

জন্তু-জানোয়ার সামলানো হাজরার ধাতে নেই। কখন যে ওরা কি করে—কেন করে—হাজরা তা বোঝে না। এই এতবড় মাঠটা পেরোতে কত সময় যাবে। একেবারে খটখটে ডাঙা। শীতের শেষে মরা ঘাসের ওপর এত-টুকুন সব চারা মাথায় একটা করে ফুল ধরে জেগে ওঠে। তখন সারা তল্লাট কিছু অন্য রকম দেখায়। এমন রুখোসুখো মাঠ তখন মায়াবী চেহারা ধরে পড়ে থাকে। গরু হারালে সন্ধ্যের দিকে লোকজন এদিকে আসতে চায় না। একবার এক বিদেশী লোক সারা রাত মাঠে ঘুরে বেরোবার রাস্তা না পেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। রাখালরা দেখতে পেয়ে তুলে আনে শেষে।

হাজরার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তবে কি সেও আর এই মাঠ দিয়ে কোন দিন বেরিয়ে আসতে পারবে না। সাহেবপুরের মাঠ যে আর ফুরোয় না।

আকাশখানা এই রাত্তিরে যাত্রাপার্টির চাঁদোয়ার কায়দায় সাহেবপুরের মাঠের ওপর ঝুলে পড়েছে। তার ভেতর দিয়ে অফলা ডাঙা জমি ঢেউ তুলে কোথাও উঁচু—আবার কোথাও নাবিতে গড়ানো। জল খেয়ে বলদটা দাঁড়িয়ে পড়েছে।

হাজরা তাকে নড়াতে পারল না। এ কি অবুঝ জন্তু। আবদারের

একটা সময় থাকে। কোথায় আগে বাড়ি যাবি! জল খড় দেব। নিজে দুটো খাব। দু' চারজন দেখতে আসবে। তা না—নে বাবা চল।

কোথায়! জন্তুটা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল।

কোমর থেকে শেষ রুটিখানা বের করে বলদের মুখে ধরতেই নিমেষে গিলে ফেলল। কিন্তু তারপরেও আর নড়ার নাম নেই। এখান থেকে গাঁ দেখা যায় না। মাঠখানা অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। শেষ কোথায় বোঝার কোন উপায় নেই।

তিতিবিরক্ত হাজরা দড়িখানা পাকিয়ে সপাং সপাং দু' ঘা পিঠে দিতেই বলদটা সামনের পা তুলে দে ছুট। একটা ঢিবিতে উঠেই বলদটা হারিয়ে গেল। শুধু অন্ধকার।

দৃষ্টি ভাল ফেরে না হাজরার। তবু চোখ চিরে চিরে দেখতে গিয়ে দেখল, দেখা যায় না। একদলা পাথর গিলে ফেলল হাজরা। বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। অন্ধকারে শেষকালে একশো ন টাকা গায়েব হয়ে যাবে না কি!

পড়িমড়ি ছুটলো হাজরা।

সাহেবপুরের মাঠ এতক্ষণ ওৎ পেতে ছিল। সাদা কুচি কুচি ফুলগুলো দিনের বেলার মায়া। এমন রাতভিতে নিঃসম্বল মাঠখানা তাই আগাগোড়া অন্ধকার মেখে নির্দোষ সেজে পড়েছিল। দু'পা যেতেই বেঁটে বাবলার ঝাড়ে লটকে গিয়ে হাজরা ছিটকে পড়ল।

অনেকক্ষণ কোন কথাই ফুটলো না মুখে। শেষে বলদটা আবার একা একা ফিরতি পথ ধরে গোহাটার দিকে রওনা না দেয়। তাহলেই গেল। ভোর ভোর কেউ পেলে কি আর ছাড়বে।

হাজরা উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পারল না।

ফাঁকা মাঠ পেয়ে বাতাস দিচ্ছিল। লাই পেয়ে একটু একটু জ্যোৎস্নাও ফুটে বেরোলো। তাতে কাছের থেকে দেখতে পেল, বাবলা ঝাড়ের দু' চারটে হলদে ফুল ফিকে পারা চাঁদের আলোয় লেপ্টে আছে।

ওই তো। আসো বাপ। এই তো ইদিকে—ডান দিকে ফেরো—

বলদটা সাহেবপুরের মাঠের ঢেউ ধরে ধরে আবার ঢিবির মাথায় উঠে এসেছে। সাদাপানা চার-পাঁচ মণের জন্তুটা বুঝলো কি না বোঝা গেল না। হাজরা ওর চোখের জায়গায় শুধু দু' দলা অন্ধকার দেখতে পাচ্ছিল। তাদের

দু' জনের মাঝখানে সিকি রশি মাঠ পড়ে আছে। আলোর অভাবে বলদটার গা এখন ছাই মাখানো মনে হবে। তার চারপায়ের ফাঁক দিয়ে হাজরা দূরে তালখেজুরের মাথায় একটু না-দলা পাকানো অন্ধকার চিনতে পারল।

বলদটা দেখল দু' পায়ের সেই জন্তুটা মাটিতে বসে আছে। তার শরীরের মাঝখানের গামছাখানা খোলা। ওখান থেকেই বের করে তাকে খেতে দিয়েছিল।

খুব অগোছালো পায়ে এগিয়ে এল। হাজরার দিকে। গামছার ভেতর কি আছে বোঝা যাচ্ছিল না।

শেষ রাত্তিরের বাতাস কিছু জোর হয়ে এল। তাতে ঠাণ্ডা ছিল। এবার মাঠের আলো, অন্ধকারের ধাত ধরে ফেলেছে হাজরা। এসো বাপ। এসো—আমি তোমার কে!

জন্তুটা এগিয়ে এসে বড় বড় নিঃশ্বাস দিয়ে লাল মাখিয়ে হাজরার কান, গলায় ভাপ ছড়িয়ে দিল। তখন অফলা ডাঙা দিয়ে শুধু একটা গন্ধই বেরোচ্ছিল—গর্ভথোড়ের ম ম করা গন্ধ—চৌদিকে—এলোপাথাড়ি—ধান গাছ স্বাদে, দুধে ভরে উঠলে এমন গন্ধ দেয়।

সারা মাঠ ছড়ানো বেড়াল, শেয়াল, ময়ালের মাংস ছাড়ানো সাদা ফকফকে মুণ্ডু—চোখের গর্ত দিয়ে বাতাস চলে যাচ্ছিল, মেটে জ্যোৎস্না পিছলে পড়ছিল—কিন্তু সেসব দেখার কেউ ছিল না।

কন্দর্প

আমার বাড়ির সামনে দিনের বেলায় আলো, দীঘির জল, খালের পাড়—সব কিছু ঝলমল করে। রাতের বেলায় সেই একই জায়গা নিঝুম হয়ে যায়। খানিক দূর দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন যায় ঝমঝম করে। রাতে ডিস্ট্যাণ্ট সিগনাল একা রেললাইন পাহারা দেয়।

আমাদের বাড়ির সামনের খালপাড় দিয়ে গাঁয়ের ভেতরে যাওয়ার রাস্তা। এখানে শহরের ভাব আছে। গাঁয়ের ভাব আছে। সারের দোকান আছে। সিনেমা হলও আছে। বারান্দায় বসে দেখি চব্বিশ বছরের একজন তাগড়াই জোয়ান প্রায়ই ভোরবেলা গাইতে গাইতে যায়। আবার বিকেলের দিকে গাইতে গাইতে ফেরে। কোথাও কাজ করে বোধ হয়।

একদিন সকালে দু'জন মিস্ত্রী, দু'জন যোগাড়ে আমার ঘুম ভাঙালো। কি কাজ আছে বাবু? খবর দিয়েছেন তাই এলাম। ওদের হাতে কর্নিক, দাগরাজি করার কাঠের পাটা। সঙ্গে টিফিনের কৌটো। বুঝলাম, কাজ আছে শুনে তৈরী হয়েই এসেছে। কিন্তু সত্যিই তো কোন কাজ নেই। বললাম, কে খবর দিল তোমাদের? কোন কাজ নেই তো।

মনঃক্ষুন্ন হয়ে ফিরে যাবার সময় বলে গেল, এ বাবু গণেশের কাণ্ড। এমন বানিয়ে বানিয়ে বলল—বিশ্বাস না করে উপায় নেই। আপনার নাকি চৌবাচ্চার কাজ হবে—

গণেশ আর কেউ নয়। যে রোজ সকালবেলার বাতাসের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে কাজে যায় সে এই গুণধর। আবিষ্কার করতে দেরি হল না। একদিন বিকেলে থামালাম ওকে। ঘরে ফিরছিল। বললাম, তুমি এত সুন্দর দেখতে। কিন্তু এত মিথ্যে কথা বল কেন?

আমার কথার গোড়ার দিকটাই ও শুধু নিল। বাকিটুকু গ্রাহ্যই করল

না। তদনুযায়ী খুব লাজুক মুখ করে দাঁড়াল। সুঠাম চেহারা। গায়ে একটুও বাড়তি মেদ নেই কোথাও। নিজেই বলল, আগে আরও সুন্দর দেখতে ছিলাম বাবু। এখন তো বিশেষ খেতে পাইনে। আরও অনেক কিছু জানালো। যাত্রাদলে ছিল। বাইরে ডাক আসতো। কপাল খারাপ। তাই সে কাজ হারিয়েছে। কথা বলছিল আর আটকে যাচ্ছিল। বললাম, যখন গাও গলা তো আটকায় না—কিন্তু কথা বললেই জিভ জড়িয়ে যায়?

আমার কপাল মন্দ বাবু।

কেন?

একবার নদীর ওপারে অভিমন্যু পালা গেয়েছিলাম বাবু। সেখানে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বাদা অঞ্চল। সবাই আমাকে দেখতে এসেছিল। খেতে দিয়েছে থালা ভরে। লাট এলাকার কুকুরগুলো বড় মন্দ হয়। বড় জ্বালাচ্ছিল। যেই জিভ বের করে ভেঙিয়েছি—অমনি লাফ দিয়ে এক কামড়ে আমার জিভের ডগাটা কেটে নেয়।

তারপর?

ছুট ছুট। কুকুরের মুখ ফাঁক করে জিভের ডগা পাওয়া গেল। খেয়েই ফেলতো আরেকটু হলে। টুকরোটা হাতে নিয়ে নদীর পাড়ে ডাক্তারবাবুর দোকানে ছুটলাম। ভাগ্যিস বাড়ি ছিলেন। ঘোড়ার বালামচি দিয়ে সেলাই করে জুড়ে দিলেন।

লোকটা সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে জেনেই কিনা জানি না—গণেশ জিভ বের করে রাখল। সত্যি একটা সেলাইয়ের দাগ।

ভেতরে ঢোকাও।

গণেশ জিভ ভেতরে নিয়ে বলল, সেই থেকে বাবু কথা বলতে গেলে গ-গলা আটকে যায়। তবে গান আটকায় না। বুক ভরে গাই। কিন্তু আর ওরা আমায় পালাগানে ডাকে না। গানের সঙ্গে কথা থাকে তো।

প্রায় ছ'ফুটের জোয়ানটা আমার সামনে কথা বলতে বলতে ভেঙে পড়ল। গালে ওয়েস্টার্ন ছবির ডাকাবুকো হিরোর স্টাইলে দাড়ি। যেন এইমাত্র হিরোইনকে পাশে নিয়ে আফ্রিকার কুমির-বোঝাই নদী পেরোবে কাঠের ভেলায়। চোখে উজ্জ্বল মণি। কপালে কাটা দাগ। গাছকোমর করে ধুতি পরেছে। খালি গা। কপালে এক ঝোপ চুল এসে পড়েছে।

এখন যদি ও 'হ্যালো হানি' বলে এক লাফে দাওয়ায় বাঁধা অদৃশ্য ঘোড়াটার পিঠে সওয়ার হয়েই চাবুক চালায়—তাতেও অবাক হব না। আমি এই বাড়িতে পায়ে প্লাস্টার করে তিন মাস পড়ে আছি। প্লাস্টার খুলে ফেলব কাল পরশু। ঠাকুর ভাত চাপিয়ে সিগারেট আনতে গেছে।

সময় কাটাবার পক্ষে আদর্শ সঙ্গী। বললাম, মিথ্যে মিথ্যে দু'জন মিস্ত্রী, দু'জন যোগাড়েকে আমার বাড়ি পাঠিয়ে দিলে—লোকগুলোর কাজ হল না। অন্যত্র গেলে মজুরি পেত—

ও একটু আধটু তো হবেই। রোজ কি কাজ পাওয়া যাবে। তারপর খুকখুক করে হেসে ফেলে বলল, আপনি একা একা বারান্দায় বসে থাকেন। পা ভেঙে কষ্টে আছেন। তাই একটু আনন্দ দিলাম।

তাই বলে মিথ্যে বলবে?

তা বলতে হবে বাবু। তা বলতে হবে—আনন্দের জন্যে লোকে পয়সা ওড়ায়—ঘরবাড়ি বেচে ফেলে দিয়ে ফুর্তি করে। আমি না হয় একটু মিথ্যে বললাম। তাতে কোন খরচা নেই তো বাবু!

তা বটে! মনে মনে বললাম, আক্কেলজ্ঞান তো টনটনে—

পা ভাঙার পরে ঘরে বসে বসে জানতে পেরেছি—এতকাল আমার অগোচরে পৃথিবীতে অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে। এখানে বাতাস উঠলে গাছপালা মাথা নেড়ে নেড়ে তাতে গা ঢেলে দেয়। নেহাত শেকড় দিয়ে মাটিতে আষ্টেপৃষ্ঠে আটকানো—নয়তো বাতাসের সঙ্গে সঙ্গেই সারা তল্লাটের ঝাঁকালো গাছগুলো চলে যেত। পাশেই একটা খাল বয়ে গেছে। কলকাতা মোটে পনেরো মাইল। এইসব দৃশ্য কলকাতার চেয়ে অনেক জোরালো। কারও দেখার অপেক্ষা না রেখেই এইসব ব্যাপার সর্বক্ষণ ঘটে যাচ্ছে। গণেশদের গাঁয়ের চত্বরে গাদা ভেঙে মিস্ত্রীরা ধান আছড়াচ্ছে—পানকৌড়ি খালি আমাদের পুকুরে ডুব দিচ্ছে—আবার উঠে যাচ্ছে।

হাটতে আরম্ভ করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রেল গেটের কাছে ডাক্তারখানায় যাই। পথে একটা মন্দা তালগাছের নিচে মাঝে মাঝে গণেশকে দেখি। এক কলসি তাড়ির চারপাশে জনা পাঁচেকের সঙ্গে গোল হয়ে বসে। হাতে তাড়ির গ্লাস ফিরছে। আমাকে দেখে হাসে। কোন দিন বলে, এই মাটি কেটে এসে একটু বসলাম বাবু।

অথচ ওর গায়ে কোথাও মাটির দাগ নেই। সঙ্গে ঝোড়া বা কোদাল কিছু

নেই। বুঝলাম—পুরুষমানুষ—কাজ নেই বলতে লজ্জা পায়।

মাঝে মাঝে দেখি জ্যোৎস্না-রাতে গণেশ গান গেয়ে ফিরছে। গলায় কোন জড়তা নেই। খালি গা। মুখে আশুতোষ হাসি। কোন অভিযোগ নেই। এই পৃথিবী নিয়ে ও বড় খুশী। বিপদ-আপদ যেন ওর এই তল্লাটে ঢোকেই না। গানের ভাষা পালাগানের। ও কোকিলা রে...

জায়গাটা আমার ভালই লাগছে। এই বাড়িটি আমার পিতৃদেব বানিয়ে যান। তাঁর মৃত্যুর পর আমার কোনো ভাই এখানে আসেনি। আমার স্ত্রী দু'একবার এসেছেন। ছেলেরা ছোট থাকতে ঘুরে গেছে। এখন এদিকে আর মাড়ায় না কেউ। নারায়ণ আছে। পুজো হয়। ঠাকুর পুজোও করে, রান্নাও করে, ঘরও ঝাঁট দেয়—আবার গাঁজাও খায়।

আপসোস! আগে কেন এখানে আসিনি। এখানে যে জীবনের মানে একটু একটু করে জেনে ফেলা যায়। কোন তাড়াহুড়ো নেই। আমি মরে গেলে এইসব গাছপালার মানে কে বুঝবে! কে জানবে এখানে মিস্ত্রীপাড়ার মাঠের ওপর দিয়ে চাঁদ ওঠে ফরটিফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে।

আমাদের অল্প জমি। বনঝাল গাছে ঢাকা পড়ে থাকত। একদিন দেখি, গণেশ হাল এনেছে। বনঝাল গাছগুলো উপড়ে তুলে ফেলা হল। চাষ করব বাবু। গেতু ধান লাগাবো। বিশেষ জল লাগবে না।

বীজ পাবি কোথায়? সবার তো রোয়া সারা।

একটা সবজান্তা হাসি হেসে বলল, সে দেখবেন—

দেখতে সত্যি আমাকেই হল। ক'দিন পরে হইহই করে জনা তিনেক লোক এসে গেল। গণেশ রাতে রাতে তাদের তৈরী বীজ চুরি করে তুলে এনে আমার জমিতে রুয়েছে। টাকা দিয়ে ঝামেলা মেটাতে হল।

সন্ধ্যের দিকে গণেশ এল। বারান্দার লাইট জ্বেলে দিলাম। ভেবেছিলাম খুব একচোট রাগারাগি করব। আলোতে দেখি ওর চোখ দুটো ঘোলাটে। মুখে একটা পাতলা হাসি সময়োচিত গাম্ভীর্য উপেক্ষা করে ভুস করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বুকের ওপর চাক ধরে লাল হয়ে আছে অনেকটা। আজ তা হলে অনেকক্ষণ গাঁজা খেয়েছে। এখানকার রীতি অনুযায়ী বয়সে বড় হলেও আমি আজকাল ওকে কখনো কখনো 'গণেশদা তুই' বলে ডাকি।

'এটা কি করলি গণেশদা—'

'আপনি তো ভুল করলেন বাবু।'

'কিরকম ?'

'যে এসে চাইবে—তাকেই টাকা দিয়ে দেবেন—?'

'তোকে বাঁচালাম—আর তুই বলছিস গণেশদা—'

'দোষ তো আপনার। আমরা কি করব! আপনি যদি কাছাখোলা হন।'

'এই এক ভাল কায়দা তোদের! বিপদের সময়, হুজ্জুতির সময় লুকিয়ে থাকবি। আর পরে এসে দাবড়াবি—'

জানি আমি—গণেশ তার মত চলবে। আমি তাকে পাল্টাতে পারব না। আজকাল গণেশের নামে সবাই আমার কাছে নালিশ করে যায়। সবাই জানে, গণেশ, লক্ষ্মণ, পঞ্চানন, হাজরা, পালান, নাদু—রায়পুর, মিস্ত্রীপাড়ার এই হাড়হাভাতে চাষাভুষো আমার কাছে গিয়ে ভিড়েছে। জুতো পায়ে দিয়ে যারা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে—তারা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে। ভাবে, লোকটার মতলব কি? পা তো সেরে গেছে অনেকদিন।

ওদের কেউ জমি দেয় না। কেউ বাকি দেয় না। সুদে কেউ ধারও দেয় না। আমি ওদের ভাল করার ক্ষমতাও রাখি না। তবু ওরা আমার কাছে আসে। দেড় টাকা দু' টাকার তাড়ি আসে। খাঁটি না। তাতে মিল্ক পাউডার, স্যাকারিন মেশানো। বেলা বাড়লে ফুট কাটে। ওদের পরামর্শমত ভোরবেলা পান্তা খেয়ে বসে থাকি। খালি পেটে তাড়ি বিষ! তাই। হাতে হাতে গ্লাস ফেরে। লক্ষ্মণের বউটা আজকাল খুব আড্ডাবাজ হয়েছে। ঘরের কাজে মন নেই। পুলিনের সঙ্গে এয়ারকি দেয় খুব। লক্ষ্মণ একদিন এমন পেটালো—শেষে মেয়েটা মনের দুঃখে এনড্রিন খেয়ে মরে। সাইকেল-ভ্যানে চাপিয়ে আমাকেই সাত তাড়াতাড়ি বারুইপুর হাসপাতালে ছুটতে হয়। এমন সাত-সতেরো লেগেই থাকে। গণেশের বাবা কানাই মিস্ত্রীর ডান দিকটা অসাড় হয়ে পড়ে গেছে। কোন চিকিৎসা হচ্ছে না। হাজরা একদিন মাঝরাতে কাঁদতে কাঁদতে ডেকে তুললো। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে তার বাবা গলায় দড়ি দিয়েছে। এর আর শেষ নেই।

পাঁচ গ্লাস খাবার পর আমার মাথাটা ঘোরে। ওরা কলসির শেষে গাদটুকু আমায় আর দেয় না। বলে, খাবেন না বাবু। লিবরে ব্যথা হবে। গণেশ কলসির গাঢ় তলানিটুকু একটা গ্লাসে ঢেলে

তাতে একখানা কাঠি ডুবিয়ে দেয়। সেই কাঠির গা দিয়ে জমাট তলানি একটু একটু করে গ্লাসের নিচে গিয়ে থিতোয়। তখন গণেশ ওপরেরটুকু এক চুমুকে খেয়ে ফেলে।

তাড়ির কোন তুলনা নেই। টকাটক পাঁচটি গ্লাস মেরে দিলে ঝাঁ করে মাথায়, চোখে আগুন ধরে ওঠে। দুশ্চিন্তা কেটে যায়। গুঁতো লাগলে ব্যথা লাগে না। খাইদাই বেশ আছি। ছুটি বাড়িয়ে দিয়েছি। আগে ছিল ফুল পে ছুটি। এখন হাফ পে ছুটি যাচ্ছে।

আমার স্ত্রী ভাগিস চাকরি করেন। তাঁর ইনক্রিমেণ্ট আছে, ব্লাউজের ছিট আছে, রুচি আছে, আরাম সম্পর্কে নিজের মনোমত একটা আন্দাজ আছে। ছেলেদের জুলফি লম্বা হয়েছে, গোঁফ ভারি হচ্ছে। তাদের কাছে বাবা হিসেবে আমি লোকটি দূরের। তারা টাকা পায় মায়ের কাছ থেকে। আমার অল্প বয়সের ইনসিওরেন্স থেকে। আর কিছুকাল পরেই ওরা কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরি-বাকরির খোঁজ করবে।

আমি বেশ আছি। দুপুরে তাড়ির পাতলা নেশায় ছোট মাছের ঝোল দিয়ে অল্প ক'টি ভাত খাই। তারপর দরজা আটকে ঘুম। বিকেলে ধুতি পাঞ্জাবি পরে বেরোলে চৌত্রিশ বলে এখনো চালানো যায়। অথচ ষোল বছর আগে আমি সেখানে ছিলাম।

গাঁয়ের ভেতর বেড়াতে বেড়াতে যাই। লোকে অভাবে পড়ে বাঁশঝাড় বেচে দিচ্ছে। সজনেফুল কুড়িয়ে চচ্চড়ি খায়। যার পয়সা আছে সে পুকুর জমা নেয়। কেউ কেউ নিজের খেজুর বা তালগাছের বাঁধা ভাঁড়ে সকাল বিকেল নিয়মিত রস খায়।

গাঁয়ের ইউনিয়ন বোর্ডের সাবেক প্রেসিডেণ্ট তার মেয়েমানুষের বড় ছেলের খুব ঘটা করে বিয়ে দিল। সেই মেয়েমানুষ এখন বুড়ী হয়ে খালপাড়ে ছাগল চরায়। হাঁস পোষে। গুনে গুনে ডিম তুলে রাখে। ব্যাপারী এলে বেচবে। আমাকে দেখলে বলে, বয়েসকালে অত রস খেয়ো না বাবু।

আমি বলি, মোহিনীবাবু কতটা করে খেতেন?

মুখ টিপে হেসে ফেলে, পাকা দু ভাঁড়!

সেই মোহিনীবাবু এখন মামলার তদবির করতে আলিপুরে দৌড়য় রোজ। পুকুরে মাছ বড় করে। বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভে একটি মেয়ে। তার বিয়েতে মাছ লাগবে।

বড় আপসোস! আগে কেন আসিনি এখানে! আরও আগে। পৃথিবী আরও নবীন ছিল। আমি আরও তাজা ছিলাম। দরকারের কলকাতার বাইরে এখানকার এই জগতের আকাশে মেঘ আমি চিনি। বাতাস আমি চিনি। বর্ষা কোন দিক থেকে তেড়েফুঁড়ে আসবে তাও আমি জানি। গণেশ বলে, বাবু তুমি ঘরে যাও। ঠাণ্ডা লাগবে।

রাত অনেক। জ্যোৎস্নার সঙ্গে সঙ্গে হিম পড়ছিল।

বললাম, কাল তোদের মা আসবে। কোন গোলমাল করিসনি কিন্তু।

কিন্তু ওরা সেদিনই গোলমাল করল।

সকালে জাল ফেলে পুকুর থেকে মাছ তুলতে গিয়ে কিছু কাঁকড়াও পাওয়া গেল। রোগে ধরা কদম গাছটার মরা ডাল ভেঙে মাটির উনুনে কাঁকড়া ভাজা হল। সঙ্গে কাঁচালঙ্কা। তাড়ি। পৃথিবী বড়ই মনোহর জায়গা। নাদুদা আমায় বুকে জড়িয়ে ধরল। বাবু, গত জন্মে তুমি এদেশেই ছিলে। পালানদা বলল, অত হাত খোলা ভাব তোমার ভাল নয় বাবু। পয়সা জমাও। জমিয়ে জমিয়ে জমি কেনো। আমরা তো কেউ ভাগে জমি পাইনে। তোমার জমি আমরা ভাগে চাষ করব। তারপর গণেশকে দেখিয়ে বলল, ওর তো ঝামেলা নেই। বউ চলে গেছে। একটা ছেলে। তা ছেলের খুড়োজ্যাঠাই তাকে দেখে।

তোর বউ নেই?

গণেশ হেসে বলল, ছিল বাবু। আমার গান শুনে ভুলেছিল। গড়ে ইষ্টিশানের কাছে বাপের বাড়ি, শহরঘেঁষা মানুষ। খালি বলত, চল যাদবপুরে ঘরভাড়া করে থাকব। কিন্তু আমি অত টাকা পাব কোথায়?

শেষে এখানেই ছিল আড়াই বছর। চা খাবার বাই ছিল। রোজ চারগণ্ডা পয়সা যেত ওর চা-চিনিতে।

পালান বলল, হ্যাঁ বাবু! গণেশ তার মাগের পাছার কাপড় ধুয়ে দিত। বাসন মেজে দিত। বেলা দেড়টায় মাটি কেটে ফিরে এসে উনুন ধরিয়ে ভাত রেঁধে দিত। তাও বউটা থাকল না।

অন্য কোথাও বিয়ে বসেছে?

গণেশ বলল, না, তা বসেনি।

দেখা হয়েছে তোর সঙ্গে?

হয়েছিল বাবু। গায়েনপাড়ায়। তবে কোন কথা হয়নি। শুধু আমার

দিকে তাকিয়েছিল।

তুই তাকাসনি?

না বাবু।

তবে জানলি কি করে?

ও বাবু বোঝা যায়।

আস্তে আস্তে খুব জমে উঠেছিল সকাল বেলাটা। এমন সময় ষ্টেশন থেকে রিকশা করে আমার স্ত্রী এসে নিঃশব্দে নামলেন। মুখে তদন্তকারীর ভঙ্গী। ওর বেসিক এখন পাঁচশো আশি। ডি এ, হাউস রেণ্ট, সিটি কমপেনসেটরি ধরলে আরও শ'তিনেক। তাছাড়া আরও যেন কি পায়। দোষ দিতে পারি না। হাজার হোক আমি তো ওঁর বিবাহিত স্বামী। আমি কেন কলকাতায় ফিরছি না তা দেখতে এসেছে। আমি জানি ও অ্যাডভান্স টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে ভালবাসে। কবে কফির কৌটো কিনলে কাচের গ্লাস ফ্রি পাওয়া যায় তা ওর নখদর্পণে। কেরোসিন দিয়ে মেঝে মোছায়—ভিম দিয়ে প্লেট। কাঠের আলমারিতে বছরে দু'বার ন্যাপথলিন দেয়। বিয়ের নেমন্তন্ন পড়লে আজও দু'ঘণ্টা ধরে ফল্‌স খোঁপা বাঁধায়। বাঁচতে গেলে এসব নাকি প্রয়োজন। কথায় কথা বাড়ে বলে আমি আর ঘাঁটাই নি।

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠেই ও আমাদের পুরো ব্যাচটার দিকে কটকট করে তাকালো। আমার শরীরের ভেতরের হাড়ের ওপর দিয়ে পুরনো ব্লেড ঘষলেও এতটা সিরসির করে উঠত না। ওরা সবাই এক সঙ্গে 'মা!' বলে উবু হয়ে দূর থেকেই প্রণাম করল।

আমার স্ত্রী—ওর একটা নাম ছিল—আমার এখন মনে পড়ছে না—'মরণ!' বলে ঠকাস করে ঘরে ঢুকে গেল।

গণেশ হো হো করে হেসে উঠল। বউ ঘুরে দাঁড়াল।

ওঃ! সে ভাগ্যি কি হবে মা আমাদের! গণেশ হাসছে আর বলছে। কথার বাঁধুনি শ্যামা সঙ্গীতের মতো। বাবু যেদিন মারা যাবে সেদিন কি হইচই, আনন্দ হবে একবার ভাবুন মা। আমরা কাঁধে করে রাজপুরের ঘাটে নিয়ে যাব। কত লোক হবে। তিনখানা পদ চাই সেদিন। লুচি, নেডিকিনি, আলুর দম। বাবু, তুমি আগে থেকে অফিসের টাকা তুলে মায়ের হাতে দিয়ে রেখো। অসময়ে কার কাছে চাইতে যাবে?

নাড়ুদা নতুন ভাঁড় থেকে আমায় এক গ্লাস দিল। খেতে খেতে বুঝলাম, গণেশ আমার কি ক্ষতি করে দিল আজ। ততক্ষনে আমার ধর্মপত্নী ঘরে ঢুকে গেছেন। ওরা গেল দেড়টা নাগাদ। বেশি বেলায় ভাঁড় কোথায় আর ফেরত দেবে। ও বেলা পাঠিয়ে দেবে বলে ওরা রোজ বারান্দার নিচে বোগেনভেলিয়ার ঝাঁকড়া ছায়ালো শেকড়ের কোণে লুকিয়ে রেখে যায়। বিকেলে আমার ঘুম ভাঙলো দেরিতে। ওরা চলে যেতে আমি আমার স্ত্রীর যত্নআত্তির জন্যে ঠাকুরকে ধমকে ছিলাম মনে আছে। ঠাকুর নারায়ণ পুজো সেরে আমায় কিছু চালকলার প্রসাদ দিয়েছিল। আমি খেয়েছিলাম। ঠাকুর ওকে পরিবেশন করার সময় আমি পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। ও বলেছিল, যাও—দয়া করে চানটা করে এসে খেতে বস। আমি ঠাকুরকে বলেছিলাম, মাছের মুড়োটা দিলে না মাকে। ও বলল, আর ভালবাসতে হবে না!

সুন্দর বাতাস দিচ্ছিল বাইরে। নার্সারি থেকে আনিয়ে গত বর্ষায় ও আটটা বোগেনভেলিয়া বসিয়েছিল বারান্দার চারদিকে। তার ভেতর পাঁচটাই এখন মৃত। ডেকে বলল, তোমার লোকজন যেভাবে ভাঁড় রেখে যায় তাতে তো একটা গাছও থাকবে না।

আমি তাকিয়ে আছি দেখে বলল, ঠাকুর বলছিল—ফাঁকা ভাঁড়ের তলানি খেতে ধেড়ে ইঁদুর আসে। এসে এমন সুন্দর দামী গাছের গোড়া কেটে দিয়ে যায়।

সন্ধ্যে নাগাদ ওদের আরও ত্রুটি বেরোলো। এসব ত্রুটি আমি গায়ে মাখি না। কিন্তু ও তো না মেখে পারে না।

খুঁজে খুঁজে দেখে বলল, দু'জোড়া পুরনো স্যাণ্ডেল, পাঁচটা কাঁচের গ্লাস, একখানা কোদাল, দু'খানা বিছানার চাদর, একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ আর একটা টাইমপিস এই ক'মাসে বাড়ি থেকে হাবিস হয়ে গেছে। ঠাকুর বলল, ওসব এই গণেশ নাড়ু আর হাজরার হাতের কাজ।

ও বলল, রাগে আমার ঘেন্না করে। তুমি তবু এখানে পড়ে থাকবে? ওদের নিয়ে আসর জাঁকাবে ফি সকালে?

জানি এসব প্রশ্ন আমার বিবেক জাগানোর জন্যে। টাইমপিস, কাঁচের গ্লাসের চেয়ে আমি যে ওর কাছে অনেক দামী তা আমি জানি। আমার দুঃখ—আমিও তো এসব জানি। কিন্তু মাথা ঘামাই না। ওদের একটু আধটু

হাতটান আছে—তাতো জানিই। ওসব জিনিস ওদের নেই—তাই হাত দেয়। কিন্তু তার বদলে আমি যে ওদের কাছে কত কি পাই—তা কি ও জানে!

গণেশের হাসি। দোষ করে উল্টে আমাকেই বকুনিদান। চাঁদের দিকে তাকিয়ে পূর্ণিমার সন্ধ্যায় আমার বারান্দায় বসে গাঁয়ের সবচেয়ে বড় সুদখোর কেষ্ট মিস্ত্রীর জীবনী শোনায় যখন—তখন তো গণেশকে আমার সবচেয়ে বড় পোয়েট, নভেলিস্ট লাগে।

হাজরা যখন বলে, কেমন করে গণেশের বিয়ে-পাগলা বড় ভাই কোনোকে অষ্টমবার বিয়ের বেলায় পাড়ার ছেলেরা আওটি বোতাম কেড়ে নিয়ে জোর করে একটা কলাগাছের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল—তখন তো মনে হয়, রামায়ণ মহাভারতের পরেই আমি ভারতের তৃতীয় মহাকাব্যের কুশীলবের সঙ্গে বসে খেলাধুলো করছি। এ কি কম ভাগ্যের!

তাও তো ও এখনো জানে না, আমার হাতঘড়িটা কোথায়। কিশোরীর বড় মেয়ে পরীর বিয়েতে দিয়েছি। স্টেশনে ঘড়ি, রেডিওতে ঘন ঘন ঘড়ির টাইম অ্যানাউন্স করে, কলকাতায় মোড়ে মোড়ে ঘড়ি—তার পরেও আরও ঘড়ি চাই? অফিসে ঘড়ি—লোকের হাতে হাতে তো ঘড়ি আছেই।

যাবার সময় বলল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

আমি চুপ করে থাকলাম। রাত আটটার ট্রেনে চা খেয়ে চলে গেল। কাল ভোরে ওর অফিসে ইন্সপেকশন আছে। হাজার হোক বউ তো। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। আজ অনেকদিন পরে ওর কঠিন মুখে সুন্দর একটা ছায়া পড়েছিল। বিকেলের দিকে।

সেদিন রাতেই ওরা গোলমালটা পাকালো বেশী করে। ধর্মপত্নীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে খানিকক্ষণ আমি স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে গল্প করে ফিরছিলাম। গল্পের মাঝে মাঝে ওর কথা মনে করে মন খারাপ হচ্ছিল। একা ফাঁকা ফ্ল্যাটে থাকে কি করে! ছেলে দু'টোও যদি মাঝে মাঝে ওদের মায়ের কাছে যায় তো কত ভাল হয়। আমার কাছে তো আসেই না। আমি বাবা। আগে ওদের কত কোলে নিয়েছি। এখন কেমন পর পর হয়ে গেলাম সবাই। আগে কোনদিন ভাবিনি—আমি এমন নিঃসঙ্গ হয়ে যাব আস্তে আস্তে। এখন আমার একমাত্র সঙ্গী গণেশ ওরা। একমাত্র উৎসাহ—সকালবেলার রোদ ঝলমলানো নানা রঙের গাছপালা, ফুল—রাতের জ্যোৎস্না—কিংবা ঘোর অন্ধকার। আমি এখন এসবের সঙ্গে প্রায় কথা

বলতে পারি।

বাবু।

পেছনে ফিরে দেখি ভাসা। ভবেনের বড় ব্যাটা ভাসা নস্কর। এ তল্লাট যেবার জলে ডুবে যায়—সেবার ভাসার জন্ম। ভাসার বাবা ভবেন আর গণেশের বাপ কানাই যৌবনে আস্ত কাঁকড়া আধপোড়া করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলত। সঙ্গে কঞ্চির রস মেশানো তাড়ি। তাতে মাথায় আগুন ধরে যায়।

বাবু একটু এদিকে চল।

আমি এখন কোথাও যেতে পারব না।

চল না। মজার ব্যাপার একটা হয়ে গেল।

প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিক দিয়ে চলতে লাগলাম। অল্প বয়সে হুইস্কি খেয়েছি। এখন মনে হয়, ওসব আসলে বউবাজারের ফার্নিচার পালিশের ঝাঁঝালো আরক স্রেফ। তাড়ির মত এমন নির্দোষ, নিষ্পাপ বন্ধু নয়। নেশা হয়। নেশা চলে যায়। ফিকে একটা ছাপ পড়ে থাকে শুধু।

কোথায় চললি ?

চল না। দেখবে এখন।

ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছাকাছি এসে সবাইকে পেলাম। সবাই আছে। সঙ্গে একটা হ্যারিকেন। হাজরার ভাই বজরা শুধু গম্ভীর হয়ে রেলের পাটিতে বসে। অন্যরা হাসিখুশি। গাঁজার কলকেটা হাতে হাতে ঘুরছে। রেললাইনের পাশে একখানা বাঁশে একটি বউমত মেয়েকে নারকেলদড়ি দিয়ে আচ্ছাসে বেঁধেছে। মাটিতে শোয়ানো। সেখানে বিশেষ ঘাস নেই। মাথার কালো চুলে ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালের লাল আলো পড়ে চকচক করছিল।

দু' ভাঁজ করে ধুতি পড়েছে গণেশ। গায়ে একটা শার্ট। আমারই। হাতে বিড়ি। বলল, বাবু, তোমাকে যেতে হবে।

আমি এখন কোথাও যাচ্ছি না।

না গেলে উপায় নেই বাবু।

তোরা মাসে একজন করে বিষ খাবি আর আমায় ছুটতে হবে? ওর মধ্যে আমি নেই বাবা—

কে খেয়েছে বুঝতে পারিনি ঠিক। ওরা বলল, বজরার বউ। তাই ভাসুর বলে হাজরা আসেনি। বজরার মুখখানা গম্ভীর। এই তো সেদিন কোন্ আঁটকুড়ের কচি বউ ভাগিয়ে এনে বিয়ে করল। সেই মেয়েটাও

শেষে—

বনিবনা হচ্ছিল না নাকি। বজরা আগে তার কাটতো। কিছু দিন ভেড়িওয়ালার হয়ে জলকর পাহারা দিয়ে কিছু টাকা পেয়েছিল। তাই দিয়ে বারুইপুরে চৌধুরীবাজারে খারাপ বাড়ি যেত। ওরাই একদিন বলছিল, বজরার শরীরে কোন্ অঙ্গ নাকি দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটা আজ সকালে ভাল করে তেল দিয়েছে মাথায়। নতুন শাড়ি ব্লাউজ পরেছে। তারপর বাজার থেকে আলুর চপ আনিয়ে তাতে ধানের পোকা মারার গুঁড়ো বিষ মিশিয়ে নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছে।

মরেছে দুপুরে। বজরা খবর দিয়েছে সন্ধ্যেবেলা। রাতে বাঁশ কাটতে নেই। তাই আগের কাটা একখানা বাঁশেই মেয়েটাকে যেমন তেমন করে বেঁধে স্টেশনে এনেছে। স্টেশনমাষ্টার ট্রেনে তুলতে দিতে রাজী নয়। মড়ার টিকিটের দাম এক শো বিশ টাকা। গণেশ বলল, বাবু, এক শো বিশ টাকায় তো নতুন করে একটা বিয়ে হয়ে যায়। কোথায় পাব! তুমি আমাদের সঙ্গে চল। বজরার হাতে হাতখরচাও নেই।

আমি এই রাতে খোঁড়া পায়ে রেললাইন ধরে এখন ছ' মাইল রাস্তা যেতে পারব না। তোরা হরিবোল দিয়ে রওনা দে। হ্যারিকেনটা ধরিয়ে নে।

প্রথম হরিবোল আমিই দিলাম। ওদের গলা দিয়ে বিশেষ আওয়াজ বেরোলো না। এক বাঁশে ঝোলানো বজরার বউ দড়ি আলগা পেয়ে কোথাও কোথাও ঝুলে পড়েছে। বললাম, ভাল করে বেঁধে নে। নামা শালারা। নামিয়ে ফিরে বেঁধে নে।

নামিয়ে, বেঁধে ওরা আর এগোতে চায় না। বলে, সঙ্গে চল তুমি বাবু। হ্যারিকেনটা বাঁশের মাথায় আটকানো! ভাসার হাতের কলকে বজরার হাত ঘুরে গণেশের কাছে গেল। গণেশ বলল, আউলিয়াপুরের মাঠের পাশ দিয়ে আমরা যেতে পারব না বাবু। গাছটা ভাল নয়। সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ চাই। তুমি আছো—তুমি চল।

রাগে গা জলছিল। গজ গজ করে গালাগালি করে রাত এগারোটা নাগাদ বাড়ি চলে এলাম। তোদের মড়া তোরা সামলা।

ভোর না হতেই হাজরা ঘুম ভাঙালো। বাসী মড়া রেললাইনের পাশে পড়ে আছে বাবু। তুমি চল। পথে সোনারপুর থানা পড়বে। তুমি না গেলে চলবে না।

যেতে হল। বিশেষ করে আমার যাওয়ার দরকার ছিল। কোনো ডাক্তার ডেথ্ সার্টিফিকেট দেয়নি। কারণ, বজরার হাতে পয়সা নেই। থানায় বজরার ঢোকার উপায় নেই। পুরনো তিনটে কেস আছে। পেলেই লকআপে পুরে রাখবে। অঞ্চলপ্রধানকে একবার মেরেছিল বলে, সেও কোন চিঠি দেয়নি।

হাজরাকে সঙ্গে নিয়ে ও-সি'র কাছে গিয়ে সব বললাম। ভদ্রলোক দয়ালু। টেবিলে কালীর ছবি। বললেন, রেখে যান। আমাদের গাড়িই পোস্ট মর্টেমে নিয়ে যাবে। আমাদের লোকই পুড়িয়ে দেবে।

থানা থেকে বেরিয়ে রেলস্টেশনে আসতেই বজরা ইস্তক সবাই আমাকে ধন্য ধন্য করল। তুমি না থাকলে আজ আমরা সবাই জেলে পচতাম। ওদের দিকে তাকালুম। লাল চোখ, মুখে গাঁজার কি একটা মিষ্টি গন্ধ। কাল সারারাত রেললাইনের ধারে মড়া আগলে বসে জেগে থাকতে হয়েছে। ডায়মণ্ডহারবার লোকাল থেকে একজন ঘুগনিওয়ালা নামতেই বজরা ছুটে গিয়ে দশ পয়সার কিনল—শালপাতায় জিভ ঝুলিয়ে দিয়ে চাটতে লাগল। ওর বউ এখন একশো গজের ভেতর থানা কম্পাউণ্ডে বাঁশে ঝোলানো অবস্থায় পড়ে আছে। মেয়েটির আগের সংসারের স্বামী লোকটাও জীবিত শুনেছি।

স্টেশনের বাইরেই রেলের বড় ইয়ার্ডের পারে লাল বাড়িটার ওপর সিমেণ্টে লেখা নাইন্টিন টোয়েন্টিওয়ান। জটার ঝোপে সামনের মাঠটা ঢাকা। রেল লাইনের গায়ে ঢিবি মাটিতে ফাঁকা ফাঁকা ঘাসের মাথায় বড় ডেঁয়ো পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৃষ্টি নামবে।

বিকেল থেকেই বৃষ্টি নামল। রাত আটটার ট্রেন চলে যাবার পর বাতাস চারদিকে দাপাতে লাগল। দু'দিনেও থামল না বৃষ্টি। জানলা দিয়ে দেখি, সামনের মাঠ, শরৎ ঘোষের ইটখোলার পুকুর জলে জলে সাদা হয়ে গেছে। তিনদিনের দিন মেঘলা আকাশের নিচে গণেশের সঙ্গে দুপুরে দেখা হল। সঙ্গে পাঁচ ছ'বছরের একটা ল্যাংটা ছেলে। হাতে জাল। মুখে ফুর্তির হাসি।

কারণ আর কিছু নয়। বৃষ্টিতে চারদিকের পুকুরের মাছ ভেসে গিয়ে খালে পড়েছে। ফোঁটা বৃষ্টিতে ট্যাংরা মাছ ভাসছে। গণেশ সেগুলো ধরবে। এই তার ইচ্ছে। এই তার লক্ষ্য। এই তার ফুর্তি। আমি জানি, আকাশের নীচে যা কিছু কুড়িয়ে পাওয়া যায়—তাই যোগাড়যন্ত্র করে সংগ্রহ

করতে ওর সবচেয়ে আনন্দ। যেমন, মাছ। বেওয়ারিশ মানকচু গাছের কচুটুকু। ফাঁকা বাড়ির উঠোনে হলুদ জঙ্গল উপড়ে হলুদ তুলতে ওর খুব সুখ। ফলপাকুড়, টিনের কৌটো, সারের বস্তা, জুতো রাখবার পিচবোর্ডের বাক্সও যদি এমনি পায় তো আর কথাই নেই। স্বর্গসুখ। আমায় দেখে বলল, ডেড়টা শ টাকা বাবু এবার পাবই।

কি করে পাবি।

শুধু ট্যাংরা বেচে।

কিছু বললাম না। আগেও এরকম অনেকবার ভবিষ্যদ্বাণী করে শেষ পর্যন্ত গণেশ সতের আঠারো টাকার বেশী কোন দিন পায়নি। তবু ও সবসময় আশা করতে ভালবাসে। আশা করতে পারে। এত আশা যে ও কোত্থেকে পায়। বললাম, কাল রাতে কোথায় ছিলি?

কেন? এই খালপাড়ে।

ছেলেটাকে নিয়ে?

হাঁ বাবু। ওকে তো সব শেখাতে হবে। নাহলি জীবনে পারবে কি করে?

কি খেলি তোরা রাতে?

ঠাণ্ডা খেলাম বাবু।

পেটে কিল দিয়ে মাছ ধরলি সারারাত?

একটাও পাইনি বাবু। অন্ধকারে মনে হয়—সব জায়গাতেই মাছ আছে। কিন্তু একটাও পাইনি বাবু। তোমার টর্চটা দেবে আজ রাতে?

ব্যাটারি পোড়াবি? দাম দেবে কে?

তোমার তো আছে।

অনেকেরই আছে এই গাঁয়ে। তাদের কাছ থেকে নে।

তারা দেয় না। চাইলে মারতে আসবে।

খালে জল বেড়েছে। গাছপালা সব ভিজে। পিঁপড়ের বাসা দু'একখানা ভেসে গেল। তালগাছের মাথা থেকে বাসাসুদ্ধ শালিকছানা নিচে ঝোপের মাথায় পড়ে বেঁচে গেছে। গণেশের ল্যাংটা ছেলেটার নরম মুঠোয় পাখির ছানাটা এখন চেঁচাচ্ছে।

কোন গাছে ভাল রস ছিল না। টুপটুপ করে জলের ফোঁটা পড়ে রস ঢিলে করে দিয়েছে। ওরই ভেতর গণেশ সন্ধ্যেবেলা শশীদের বাড়ি থেকে

এক ভাঁড় নিয়ে এল। ওরা ভাইরা চাষ করে, রস বেচে, বি এ বি এসসি পড়ে। শশীদের রসের কারবার অনেকদিনের। কলকাতায় আশিটা তাড়িখানায় এ তল্লাট থেকে পিপে পিপে তাড়ি ট্রেনে বোঝাই দিয়ে যায় রোজ সকালে।

জিনিসটা বাসি ছিল। গণেশ একটু নুন এনে ফেলে দিতেই স্বাদ ফিরে গেল। রান্নাঘর থেকে নুন আনতে হয়েছে বলে রান্নাঘরের মালিক—ঠাকুরকেও খানিকটা দিতে হল। আজকাল ও আর আমায় ভয় পায় না। বন্ধুর মত পরামর্শ দেয় মাঝে মাঝে। বলে, মাকে এখানে নিয়ে আসুন। এখন একটু আড়াল করে তাড়িটুকু খেয়ে নিচ্ছে। বৃষ্টিতে ঘর থেকে বেরোতে পারেনি বলে আমায় নিজের গাঁজা সেজে দিয়েছে।

পাঁচ মাসের মাথায় দেশের জন্যে গর্বে আমার বুক ভরে গেলো। আমাদের দেশে এত সুন্দর রস আছে—অথচ আমরা কিছু জুতো পায়ে দেওয়া বাবু ফার্নিচার রং করার আরক খাচ্ছি কতকাল। হায় স্বদেশ। লায়েক হবার পর গত তিরিশ বছরে আমি একাই অন্তত কয়েক হাজার টাকার হুইস্কি খেয়েছি। স্রেফ জলে দিয়েছি টাকাটা। আসলে যা-ই খাই—সেই ঠোঁটের নিচে গালের একটা দিক আচমকা কেঁপে উঠবে—আমার চোখ কিছুতেই সেখানটা দেখতে পায় না—মনে হবে স্লোমোশন পিকচারের রেসের ঘোড়াটার কায়দায় আলগোছে মাটিতে পা ফেলেছি—আর আমার গালের সেই জায়গাটা নিহত কচ্ছপের বিচ্ছিন্ন হৃদ্‌পিণ্ডের মত আচমকা কেঁপে কেঁপে উঠবে—আরাম লাগবে—এরই নাম তো নেশা—অর্থাৎ যুক্তিমুক্ত। তা সে তাড়িতে তো খারাপ হয় না। উপরন্তু জিনিসটা লিভারের অত ক্ষতিও করে না। না জেনে শুনে কতকাল যে বউবাজারের ফার্নিচার পালিশের ঝাঁঝালো জিনিসটা খেয়ে এসেছি। সব দাম যোগ দিলে অনেক টাকা হবে।

এবার একটা বিয়ে কর গণেশদা।

খাওয়াব কি! তুমি তো কোন চাকরি দিলে না।

তোকে কে চাকরি দেবে?

সত্যি কিছু শিখলাম না বাবু। তারপর হাসি মুখ করে বলল, এবার যা মাছ হবে খালে—দেখবেন'খন।

গাদা গাদা মেঘ গুঁতিয়ে চাঁদ একটু জায়গা পেয়েছিল আকাশে। বেশিক্ষণ

টিঁকতে পারল না।

তোর সেই বউকেই ঘরে ফিরিয়ে আন।

না।

কোথাও বিয়ে বসেছে?

না।

জানলি কি করে?

হলে খবর পেতাম। ওর ছোট ভাই তো আমার দোস্ত। তারপর বলল, আগে পোমিলার বিয়ে দেব বাবু। পোমিলা মানে প্রমীলা। গণেশদের একমাত্র বোন। মেয়েটিকে আমি দেখেছি। খাল পেরিয়ে বাদা দিয়ে যাবার সময় প্রথম দেখি। কানাই মিস্ত্রী অসাড় হয়ে দাওয়ায় পড়ে ছিল। গোয়ালে গাই তুইছিল মেয়েটা। দেখে বোঝাই যায়, শাড়ি ধরেছে অল্প দিন। গণেশ তখন গমক্ষেতে টিনে করে জল ছেঁচে দিচ্ছিল। সাত কাঠা জায়গার জন্যে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে অ্যামোনিয়ম সালফেট কিনেছিল। তাই জানতাম সব। শুঁটকো শুঁটকো গমচারায় মহানন্দে জল ঢালছিল গণেশ। আমায় দেখে হেসে এগিয়ে এসেছিল। একটু বসে যাও বাবু। পোমিলা একটা পান সেজে দে।

অন্ধকারে আমরা কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। গণেশের ল্যাংটা ছেলেটা কোত্থেকে উঠে এসে আমার দেশলাইটা খস করে ধরালো, একটা বিয়ে কর বাবু। একটা বিয়ে কর—

গণেশ তাকে ধমকে থামাল।

কিছুকাল পরে গণেশের সে সুযোগ এল। কিন্তু হাতে টাকা নেই। আমি যোগাড় করে দেব বললাম। বেগমপুরের একটা ছেলে সাইকেলে বাদার রাস্তা দিয়ে বেড়াতে যায় প্রায়ই। প্রমীলাকে তার মনে ধরেছে। গণেশ বলল, বি-এ পড়ে বাবু। আমি তো জানি, টুকে পাস করা মাল। কিন্তু গণেশ বি-এ পড়ুয়াকে যেভাবে শ্রদ্ধা সম্মান করছে তা দেখে সত্যি কথা বলতে আমার মন সরলো না।

কিন্তু অত টাকা তুই পাবি কোথায় গণেশদা?

সাইকেল, ঘড়ি, আঙটি ছেলের মা চেয়েছে। মহা খাণ্ডারনী। আমি কথা বলতে গিয়েই বুঝেছি। তারও গণেশদেরই মত হাল। হাঁড়ি চড়ে না। কিন্তু গণেশরা একদম হেলে চাষা ঘরের লোক বলে বি-এ পড়ুয়ার

ছবিটা ওদের মনে খুব ধরেছে। কিছু বলতে পারলাম না।

গণেশ বলল, বাপেকেলে দেড় বিঘে জমি আছে বাবু। তুমি কিনে নিয়ে টাকাটা দাও।

গাঁয়ের কেউ ওকে টাকা দেবে না। সবাই বলল, কলেজের পাশ দেওয়া ছেলে ধরেছে বোনের জন্যে। এবার ব্যাটা ঘোড়া রোগে মরবে।

ক' বছর হল সারা গাঁ নানারকম ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। কেউ কংগ্রেস। কেউ কম্যুনিস্ট। আসলে কিন্তু কেউ কিছু না। গাঁয়ের লোক সেই গাঁয়ের লোকই আছে। দয়ালু, অতিথিপরায়ণ, স্বার্থভোগী, লোভী। খুড়ো কংগ্রেস,—তাই ভাইপো কম্যুনিস্ট, কেননা এজমালি পুকুরের শরিকানি নিয়ে ঝগড়া। আসলে পার্টিগুলো ওদের কিছু করতে পারেনি। নিজের নিজের প্রয়োজনমত ওরা পার্টিকে কাজে লাগাচ্ছে। নইলে ওরা যা ছিল তাই আছে।

গণেশ কবে কোন্ দলের হয়ে পাইপগান ধরেছিল—সেই অজুহাত দিয়ে সুদেও কেউ টাকা দিতে রাজী হল না।

শেষে আমাকে ও ঠেলে কলকাতা পাঠাল। বালিগঞ্জ স্টেশনে লেভেল-ক্রসিংয়ে করপোরেশনের লরি ময়লা তুলছিল। পাশেই পাউডার-মাখা একটা মেয়ে দর করে গোড়ের মালা কিনল। বাড়ি যেতে বউ আমাকে সোফায় বসিয়ে চা খাওয়াল, মিষ্টি দিল। আমার তো আর নগদ টাকা নেই। বছর ঘুরতে চলল, আমি উইদাউট পে-তে আছি। সব শুনে বলল, তোমার শখ মেটাতে আমি এখন ব্যাংক থেকে টাকা তুলে দিতে পারব না। রাতে থাকবে কিনা বল—তা হলে বাজারে পাঠাই।

কাজের লোক এক ছোকরা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে সিগারেট আনতে পাঠিয়ে দূরে সরিয়ে দিলাম, তুমি আজ চল না আমার সঙ্গে।

খেপেছো! আমার টিকিট কাটা আছে ছ'টার শোয়ের।

কার সঙ্গে যাবে?

আমাদের ডেসপ্যাচের শেফালীদির সঙ্গে। তুমি যাবে? তা হলে ব্ল্যাকে একটা টিকিট কেটে নেব।

না। তুমি যে আমায় রাতে থাকতে বলছিলে।

ন'টার সময় তো ফিরেই আসতাম।

যাক। বড় খোকার চিঠি পেয়েছ?

পেয়েছি। হোস্টেলের টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছি।

চলে আসার সময় আমার বউ আমাকে একখানা দশ টাকার নোট দিল।

পথে বেরিয়ে বুঝলাম, কলকাতায় কোন বন নেই। এই শহরের গায়ে একটা নদী আছে অবশ্য।

কিন্তু সেই পর্যন্তই।

চৌকি, আলনা, বাবার আমলের আলমারি বেচে দিয়ে গণেশকে সওয়া দু'শো টাকা দিলাম। নিজের জন্যে রাখলাম তিরিশ টাকা। এই আলমারিতে মা আচারের বয়ম সরিয়ে রাখত আমার ভয়ে।

বিয়ের রাতে গোলমাল লাগল। গণেশ পুকুর ছেঁচে চারশো চারাপোনা পেয়েছিল। দু'ভাগ করে আটশো পিস করেছে। গাইয়ের দুধ আর পাটালির ব্যবস্থা করেছে দই-রসগোল্লার বদলে। কিন্তু ছেলের মামা বেঁকে বসেছে। ছেলেকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে দেবে না। গণেশ সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড সাইকেল দিয়েছে। কিন্তু তাতে চেন নেই। মামার দাবি—সেজন্যে নগদ টাকা ধরে দিতে হবে।

ওদিকে গাঁয়ের লোকজন খেতে বসে গেছে। গণেশ পরিবেশন দেখছিল। আমি ডাকতেই ঘুরে দাঁড়াল। হ্যাজাকের আলোয় সোজা হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে। চোখ ঘোলাটে। ক্লান্ত, অবসন্ন। বলল, নগদ টাকা তো আর নেই।

আমি ওর পেছন পেছন গোয়ালঘরের পাশেই অন্ধকার মাটির ঘরটায় ঢুকলাম। পরামর্শ করব। আমার পা ভাল করে সারেনি। একটা হোঁচট খেয়ে ল্যাংচাচ্ছিলাম। ঘরে ঢুকে গণেশ আমার মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। আমিও ওর মুখ দেখতে পাইনি। পরামর্শ আর কি করব! পকেট থেকে চোদ্দটা টাকা বের করে বললাম, ছেলের মামার হাতে দিয়ে আয়। আমি কিন্তু সব টাকা ধান থেকে কেটে রাখব। আশ্চর্য্য! মাত্র চোদ্দ টাকায় জীবনের এত বড় একটা ব্যাপারের ফয়সালা করা যায়। এখানে এক টাকার ভ্যালু একশো টাকা।

গণেশ জবাব দেবার আগেই একটা গোঙানি শুনলাম।

কি ব্যাপার?

ও আছে বাবু—

তার মানে? দেশলাই জ্বেলে দেখি, অন্ধকার কোণে একটা বিশ বাইশ

বছরের ছেলে—খালি গা। আবার দেশলাই ধরালাম। কাছে গিয়ে দেখি সারা গায়ে শুকনো শুকনো হলুদ মাখানো। হাত দু'খানা পিঠমোড়া করে বেঁধে দড়িটা ঘরের খুঁটির গোড়ায় শক্ত করে লটকানো।

কি ব্যাপার গণেশদা?

বাইরে বেরিয়ে এসে গণেশ বলল, হাতের কাছে ছেলেটাকে গায়ে হলুদ দিয়ে তৈরি রেখেছি সকাল থেকে। যদি বেগমপুরের ছেলে ফসকায় বোনের বিয়ে তো দিতে হবে বাবু।

তাই বলে বেঁধে রেখেছিস?

পালাচ্ছিল বাবু। নইলে কি বাঁধি? কাল বিকেলেই তো ভুলিয়ে-ভালিয়ে এদিকে নিয়ে আসি—

প্রমীলা জানে?

আগে ভাব ছিল। ছেলেটাই ইদিকে আসতো আগে। চাকবেড়ে গাঁয়ে ওদের মুদি দোকান আছে।

খেতে দিয়েছিস সারাদিনে?

দু'বার দিলাম তো। খায় না কিছু।

ছেড়ে দে তাড়াতাড়ি। এবার ছেড়ে দে—

হ্যাঁ। দিই এবার বাবু। কোমরে টাকা গুঁজে গণেশ ঘরে ঢুকলো। একটা ঝটাপটি আওয়াজ হল। ছেলেটা হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে যাচ্ছিল। গণেশ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ধাঁ করে এক লাথি কষালো। পালা! এবার ছোট্ যত পারিস—বলেই হো হো করে হাসতে লাগল বসে পড়ে। ও—হো —হো—বাবু! হো—হো—

উঠোন ভর্তি লোক। গোয়ালে গরু চাবড় চাবড় করে খড়ের জাব খাচ্ছে। কালো নাকে হ্যাজাকের আলো পড়ে চক চক করছিল। বেঁকে দাঁড়ানো ছেলের মামা উঠোন মাত করে চেঁচাচ্ছিল। তাই এদিকে কারও নজর পড়ল না। হলুদ মাখানো ছেলেটা জ্যোৎস্নায় ভাসানো বাদা দিয়ে দৌড়চ্ছে।

তোর আর কোন ব্যাপারে আমি থাকব না গণেশদা।

না খেয়ে একা একা ফিরে এলাম। বাড়ি পৌঁছতেই ঠাকুর গণেশদের বাড়ি রওনা দিল। আজ ওরও নেমন্তন্ন। বাড়িতে রান্না হয়নি।

বারান্দায় বসে রইলাম। আমার বাবা নেই। মা নেই। ছোটবেলায়

কত ভালবাসায় বড় হয়েছি। কত ভালবাসায় বিয়ে হয়েছিল। একে একে ছেলেরা হল। এখন তাদের ভারি জুলফি। ভারি গোঁফ। আমার অনেক-আশার জীবন থেকে সবাই একটু একটু করে খসে গেল। আমি এখন শুধু আমার কাছে একা আছি। তারপর আমার কাছ থেকেও আমি চলে যাব। এখন তালগাছের মোছ কাটা হয়েছে। ভাঁড়ে ভাঁড়ে টুপ টুপ শব্দ করে রস পড়ছে। কাল সকাল ন'টা নাগাদ পুরনো ফেনার সঙ্গে রোদের তাত লেগে সবটুকু গেঁজে উঠবে। তখন আমি পৃথিবীর আলো, মাটির রস, গাছের বয়স মাখানো সবটুকু অভিজ্ঞতা পাঁচ কি ছ' গ্লাসের ভেতর দিয়ে শরীরে নেব। পৃথিবীতে এতও আনন্দ থাকে। আগে যদি জানিতাম!

চোখ ছল ছল করে এল। কেন আসে জানি না। যারা আমাকে বড় করেছিল—সেই মা বাবা আর পৃথিবীতে নেই। আমার বউ ব্ল্যাকে আমার জন্যে সেদিন সিনেমার টিকিট কিনতে রেডি ছিল। এক-গাড়ি লোকসুদ্ধ আলো জ্বালিয়ে একটা ট্রেন কলকাতা গেল। খালপাড়ে বাবার বসানো চারা গাছগুলো এতদিনে দিব্যি বড়সড় হয়ে ডালপালা ছড়িয়েছে। আমি জানতাম না—এইখানে একদিন পঞ্চাশ বছর বয়সে আমার পৃথিবীকে খুঁজে পাব। এ জায়গাটা আমারই। একেবারে আমার।

ধান পাকলো। ধান তোলা হল। গণেশদের বড় অভাব। টাকা কাটা গেল না।

আমি এখন আর গণেশের কোন কিছুতেই নেই। ও দু'চারবার এসেছে। পাত্তা দিইনি। হেসে চলে গেছে। আমারই বাড়ির সামনে দিয়ে গান গেয়ে সন্ধ্যেরাতে বাড়ি ফেরে। তবে সন্দেহ করি মাঝে মধ্যে ঠাকুরের সঙ্গে একসঙ্গে বসে গাঁজাটা আসটা টানে। আমাকে দেখলেই উঠে পালায়। কিছু বলি না।

অফিস একখানা চিঠি দিয়েছে। অমুক তারিখের ভেতরে এসে জয়েন কর। তোমার এতদিনকার চাকরি—সুনামের সঙ্গেই তুমি করে এসেছ। অফিসের কাজে টুরে গিয়ে পা ভেঙেছিলে বলেই আমরা এতদিন তোমার চাকরিটা রেখেছি। নতুবা তোমার জন্যে এই বাজারে আমাদের এতখানি চিন্তা করার কথা নয়। যদি না জয়েন কর তবে ওই তারিখ থেকেই তোমার চাকরি আর নেই বলেই ধরা হবে। তখন তোমার পাওনাগণ্ডা হিসেব করে অফিসই চিঠি দেবে। যদি না আসতে পার তবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তবু

আমরা আরেকবার অনুরোধ করছি—তুমি এসে জয়েন কর। পুরনো কর্মীদের জন্যে অফিস সর্বদাই চিন্তা করে থাকে। পুনশ্চ, তোমার শেষবারের চিঠিতে কোন মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পাঠাওনি কেন? এ্যাজ আর্লি এ্যাজ পসিবল পাঠিয়ে দাও।

সকালবেলায় চিঠিখানা ঘরের মেঝেতে উড়ে বেড়াচ্ছিল। আমার বউ রিডাইরেক্ট করে এখানকার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছিল।

আমার এখন এসব বিষয়ে মন দেবার মত সময় ছিল না। আমি আজ সকাল থেকেই সবখানি মন একত্র করে বার বার মনে করবার চেষ্টা করছিলাম—আমার এখনকার গোঁফদাড়িওয়ালা ছেলে দু'টোকে ওদের ছোটবেলায় কেমনভাবে কোলে নিতাম। ছোটজন আমাকে অনেকদিন পর্যন্ত বাবু বলে ডেকেছে। হামাগুড়ি দেবার সময় ও বাঁ দিকে হেলে পড়ত।

কলকাতা থেকে মাত্র পনেরো মাইল। আমার জন্যে এই পৃথিবীটুকু আলাদা করা ছিল। ইস্, জীবনের কতখানি ব্যয় করার পর তবে আমি এখানে এলাম। আগে যদি জানতাম—সবাই একে একে খসে যাবে! শেষ অবধি ওই শিরীষ গাছের ছায়াটুকুই এত আপন মনে হবে! খালের গা দিয়ে অনেকখানি পাড় হাঁ করে পড়ে আছে। তাতে বনঝালের জঙ্গল—জলের ওপারে বঁইচি গাছের ঝোপ। খুদে খুদে ফলের লোভে এক ঝাঁক পাখি। ওই একরত্তি পাখিটাই বোধহয় কাল সকালে আমার জানলার পাশে পেঁপেগাছটায় বসে ছিল। রোদ পড়ে পেঁপের ডাঁটিতে সবুজ আভা দিচ্ছিল। তাতে কালো পাখিটা বসছিল। ফুল ঠোকরাচ্ছিল। কত রঙ তাতে—

কাঠের পোলের কাছে এসে বাসে উঠে পড়লাম। গুড়ের কলসি, সবজির ঝাঁকা, কেরোসিনের টিন, মাছের আঁশটে গন্ধের সঙ্গে প্যাসেঞ্জার মাখিয়ে বাসটা কখন সীতাকুণ্ডুর মোড়ে ব্লক খামার পার হয়ে এসেছে টেরও পাইনি। এখানেই আমি একটা সিট পেলাম। কোথায় যাব জানি না। জানলা দিয়ে লাউমাচা, খড়ের চাল, ধানের গাদা, পুকুর থেকে উঠে আসা পাতিহাঁসের লাইন দেখতে দেখতে বাসের ভেতরে চোখ ফেরাতেই থমকে গেলাম।

মাথার চুল সিঁথি কেটে পরিপাটি আঁচড়ানো। আমার দেওয়া শার্টটা কেচে গায়ে দিয়েছে। পায়ে আমারই স্যাণ্ডেল। গণেশ মিটিমিটি হাসছে।

কোথায় চললি?

এসতোফা দিতি। ধোসারহাট—নগদ পাঁচ টাকা আর জলখাবার দেবে।

এসতোফা?

কি বলল শুনতে পেলাম না। শেষে বলল, চল না বাবু। একজন সাক্ষী লাগবে। চাই কি তোমাকেও টাকা দেবে। সন্ধ্যে সন্ধ্যে ফিরে আসব।

আমি ভাবছিলাম—এসতোফা কি জিনিস রে বাবা! আগে তো শুনিনি।

চল না বাবু।

যাব? মনে মনে বললাম, গণেশদার সঙ্গে তো কোথাও কোন দিন বেড়াতে যাইনি। গেলে হয়।

গণেশ আনন্দে একগাল হেসে উঠে এসে আমার কাছে দাঁড়াল। চল—

ধোসারহাট। সে কি এখানে! বেলা দশটা নাগাদ গিয়ে নামলাম। মাঠের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে এসতোফা কি তাই বুঝিয়ে বলল গণেশ।

বউকে ইস্তফা দিতে চলেছে। বউই খবর দিয়েছে। সে এখন নতুন বর পেয়েছে। সেখানে বিয়ে বসার আগে একটা ইস্তফা চাই গণেশের। নতুন বরই এ ব্যাপারে উদ্যোগী। তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গণেশের পুরনো বউ গণেশকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছে। যেও কিন্তুক! নইলে বিয়েটা ভেঙে যাবে। নতুন ছেলের গাঁয়ে দেশের পাঁচজনের সামনে পুরনো বউকে গণেশের ইস্তফা দিতে হবে। পারলে গাঁয়ের এক দু'জন সাক্ষী যেন নিয়ে যায়। তাহলে খুব ভাল হয়। মান থাকে। বিয়ে করা ইস্তক তো কোন অনুরোধ রাখেনি। এই শেষ অনুরোধটা যেন না ফেলে। সাক্ষীর গাড়িভাড়া, জলখাবারের ব্যবস্থা থাকবে। কোন চিন্তা নেই। নতুন বর একজন মেয়েছেলে পাঠিয়ে গণেশকে তার পুরনো বউয়ের মনের কথা জানিয়েছে। সঙ্গে টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছে দু'টো। ধোসারহাটে বউ, বউয়ের ভাইও উপস্থিত থাকবে।

বুঝলাম গণেশদার শালাও ভালো টাকা পিটবে। গণেশেরই এককালের দোস্ত। আসলে বউটাকে দেখে এই নতুন ছেলের চোখে পোকা পড়েছে। গণেশের কাছ থেকে মুক্তি চায় মেয়েটা। একটা আস্ত মাগী। গণেশদা ডাইভোর্স করলেই তার জন্যে এক হাতের ভেতর সুখ, আহ্লাদ দাঁড়িয়ে আছে। বেড়ে মজা!

মাঠের আল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গণেশ বলছিল। রোদের তাত বাড়ছে। চ্যাটালো বুকের ওপর সিধে ঘাড়ে একখানা হাসিখুশি মুখ বসানো। পাতা কেটে চুল আঁচড়িয়েছে। চোখ ঘুম-ঘুম মোলায়েম। যেন অন্য কারও কথা বলছে গণেশদা।

চুপ কর শালা! বাপের বে-র গল্প বলছিস বাঞ্চোৎ। লজ্জা করে না?

লজ্জা করবে কেন বাবু? আহ্লাদ হয়েছে—তাই ফিরে বে করবে। আমি বাধা দিয়ে পাতকী হই কেন!

মুখে কিছু এলো না। মনে মনে বললাম, ভালো রে!

গাঁয়ের রাস্তায় ছেলে স্বয়ং দাঁড়িয়ে ছিল। একটা বড় ঝাঁকড়া গাছের ছায়া থেকে আমাদের ধরে নিয়ে গেল। আমার এতখানি হাঁটার অভ্যেস নেই কখনো। তাই ল্যাংচাচ্ছিলাম। ডাব এসে গেল। পাটালি। শশা। কত কি!

মাটির লম্বা দাওয়া। একজন হুঁকো এগিয়ে দিল। যেন পাত্রী দেখতে এসেছি। আমিই ছেলের বাপ!

বাড়ির ভেতরে ছ্যাকছোঁক রান্না হচ্ছে। মাছ ধুয়ে নিয়ে গেল পুকুর থেকে।

খানিক বাদে তেল, গামছা এল। চান করতে হবে। ক্রমে ক্রমে সব শুনলাম। ছেলে এক দাগে বত্রিশ বিঘে ধানী জমির মালিক। বাপ নেই। মা নেই। খবর শুনে পিসী গৃহত্যাগী হয়েছে তিন দিন। গাঁয়েরই আরেক বাড়িতে গণেশদার বউ অবস্থান করছে। শালাবাবু এসে পুরনো ভগ্নীপতির সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলছে। হবু ভগ্নীপতিকে দেখলেই একটু আলগা দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। হাজার হোক চক্ষুলজ্জা আছে একটা।

ছোকরা দেখলাম, গণেশের চেয়েও ছোট। চোখে পোকা পড়েছে নির্ঘাত। বিকেলের দিকে সব হয়ে গেল। বুঝলাম, পয়সায় সব হয়। গাঁয়ের যত ওঁছা বুড়ো এই পয়সাওয়ালা ধানীপানি ছেলেটির কথায় একত্র হয়েছে। ভাবখানা, আমরাই গাঁয়ের পঞ্চায়েত। আজ দুপুরে এদের ভুরিভোজের ব্যবস্থা ছিল। রাতেও হয়তো এক পেট খেতে পাবে। তার বদলে গণেশের এসতোফা-পত্রে ওরা সই দেবে। টিপছাপ দেবে।

বড় এক দোয়াত কালি মজুত। গণেশ বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল চেপে ধরে ডেমি কাগজে ধ্যাবড়া করে টিপছাপ দিল। মুহুরি রেডি ছিল। তিন

পাতার এসতোফা পত্রখানা সঙ্গে সঙ্গে লাল সুতো দিয়ে সাজিয়ে গেঁথে ফেলল। সামনের কলাবাগানের ভেতর দিয়ে একটা কালো পাখি উড়ে বেরিয়ে গেল।

গণেশের বউ একখানা নতুন শাড়ি পরে এসে দাঁড়িয়েছিল। দলিলের কানাচে সেও সই করল। গালের পাশ দিয়ে ডান দিকের দিঘল চোখটার আধখানা ঘোমটার বর্ডারে বেরিয়ে পড়েছে। আমাকে চেনে না। এমন ভদ্রলোককে গণেশ কোত্থেকে সাক্ষী হিসেবে পেল? তাই ভেবেই বোধহয় আমাকে দেখছিল মাগী। গণেশ ঠোঁট চেপে গভীরভাবে লাল সুরকির রাস্তার দিকে তাকিয়ে। বিকেলের আলোয় কোন জোর ছিল না। তবু তা ওর ঘাড়ে, গলায় পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল। আমার মনে পড়ল, আজ সকালেও তো ভাবিনি—আজই বিকেলে আমি এমন অপরিচিত মাঠে সন্ধ্যেবেলায় দাঁড়িয়ে থাকব।

ঘণ্টাখানেক পরে—আমরা তখন সন্ধ্যেরাতের ফিরতি বাসে ঝাঁকুনির চোটে সিটে বসেও দুলছি—গণেশ কুমড়োফুলের ঝরে যাওয়া বন্ধ করে কিভাবে কুমড়ো ফলাতে হয়—তাই খুব মন দিয়ে বোঝাচ্ছিল।

ওর চোখ আগের মতই উজ্জ্বল। ঠোঁট ফাঁক হলে আগের মতই হাসি। বাতাসে মাথার চুল এলোমেলো।

বললাম, সাক্ষীর পয়সাটা তো নেওয়া হয়নি গণেশদা।

ওই যাঃ! বলেই গণেশ আবার কুমড়োফুলে টোটকা করার কথা বলতে লাগল।

রাখাল কড়াই

চাকবেড়ের মোড় থেকে বাস চন্দনেশ্বরের বাজারের দিকে ঘুরে গেল। ভাঙ্গড় যাবে। চারদিকে ধানক্ষেত। তার ভেতর রোগা পিচরাস্তা বেয়ে চার চাকার রাজহাঁস ছুটে যাচ্ছে। ক্ষীরোদ পাকড়াশি বাস-রাস্তা থেকে নেমে খাল পাড়ে উঠে হন হন করে হাঁটা ধরল। হাতে পাকানো বাসের টিকিট। এখন বিদ্যেধরীর বাদা মাড়িয়ে গরাণবেড়ে পৌঁছে দুপুরের আগেই লোকজন ডাকতে হবে।

খবর যতদূর, জিনিস নাকি সরেস—ঘরে রেখে রস মেরে নিলে পিঁড়ি চাই পিঁড়ি, জানলা দরজা কপাট সব হবে। বাদার গাছ, চার মানুষেও বেড় পায় না—হোক না তেঁতুল। সাল সেগুনের কারবারে কে দাঁড়াবে? বৌবাজার, শেয়ালদার ক'খানা বাছাই ঘর বাদে সব দোকানই জাম-জামরুল-তেঁতুলে ছেয়ে গেছে। ভাল পালিশের চেকনাইয়ে কত মিটসেফ, আলনা, আলমারি, ইজিচেয়ার দিব্যি বাজারে চলে যাচ্ছে। এই ডামাডোলে ক্ষীরোদ এমন সরেস তেঁতুল কাঠের খোঁজ পেয়ে লোভ সামলাতে পারেনি। লোকজনের ভরসা না করে নিজেই বেরিয়ে পড়েছে। শ্রীমানি মার্কেটের ধারে ধারে ক'ঘর কবিরাজের দোকান। নানান জায়গার লোক শেকড়বাকড়, লতা-পাতা বেচতে আসে। হরনাথ তর্কভূষণ বৃহৎ গুগ্‌গুল ও চ্যবন-প্রাশের বয়ম রাখবে বলে গত শ্রাবণে জাব্দামত পাঁচ তাকের এক আলমারি নিয়েছিল। পরশু সেই টাকার তাগাদায় গিয়ে এই গাছের সন্ধান।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ওপর বাপকেলে দোকান। তর্কভূষণ ইলেকট্রিকের ধার ধারে না। হ্যারিকেনের সামনে বাঁদুরে টুপি কম্ফটার বালাপোষ চাপিয়ে দশাসই লাশ একেবারে সাক্ষাৎ যম সেজে বসে। চার কিস্তিতে আলমারির দাম শোধ হওয়ার কথা—দশ বারেও অর্ধেক উঠিয়ে আনতে

পারেনি ক্ষীরোদ। শিষ উঠে হ্যারিকেন কেবল কালি ওগলাচ্ছে। কম্ফটারের আলগা গেরোর ভেতর দিয়ে এক খাবলা পাকা দাড়ির সাদা ছোপ। আধ ঘণ্টা বসেও টাকার কথাটা পাড়তে পারেনি। পা নামাতেই মেঝের ড্যাম্প কোমর অবধি উঠে এসেছিল পরশু। ভাল জ্বালা! এই ড্যাম্পের হাত থেকে ভাল ভাল বটিকা, পাঁচন বাঁচানোর জন্যেই হরনাথ হাত ধরে আলমারি চেয়েছিল একটা। এখন টাকার কথা তুললেই বলে, শীতটা ভাল করে পাকুক—শ্লেষ্মা ধাতের সব রুগী এই তর্কভূষণের দোরে এসে লাইন দেবে। তখন নাকি আলমারির দাম শুধে আগাম সুদ্ধ চার পেয়ার চেয়ারের অর্ডার দেবে হরনাথ।

আগের অবস্থা থাকলে ক্ষীরোদ দু'খানা চেয়ার অমনি করে দিত কবিরাজকে। বুড়ো আর বেশীদিন নেই। ঠিক তখনই ফুটপাত থেকে মুসকো মত একটা লোক সোজা হ্যারিকেনের সামনে উঠে এসেছিল। গায়ে জড়ানো কাপড়ের খুঁট টেবিলে আলগা করে দিল লোকটা। দেড়পো আধসের ট্যাংরার চেয়েও লম্বা লম্বা তেঁতুল, 'এনেছি—এ কটার বেশি হল না—'

হাত পাঁচেক লম্বা, মাথার চুল অনেকটাই শাদা, কুঁজো হয়ে দাঁড়ানোয় পেটের খোঁদলে দিব্যি একটা ধামা বসিয়ে দেওয়া যায়।

তর্কভূষণ টুপির ভেতর থেকেই বলল, 'এর চেয়ে বড় পেলে না?'

'থাকবে না কেন? পাবার যো আছে—গাছতলায় পড়তেই বেদেদের শোর এসে চেঁচে পুঁছে খেয়ে যাবে—'

একটা তেঁতুল হ্যারিকেনের সামনে তুলে ধরে কবিরাজ গন্ধ নিল নাকে, 'বাড়ন কমে গেছে বোধহয়—'

'তোমার বাপের আমল থেকে দে যাচ্ছি—কতকেলে গাছ, এবারে ছোট হয়ে আসছে।'

ক্ষীরোদ আর থাকতে পারেনি, 'কত কালের গাছ?'

'তা ধরুন আমাদের সাত পুরুষ ওর ডালে পুড়েছে—এখন জুড়ে দেখুন।'

মনে মনে হিসেব করতে যাচ্ছিল ক্ষীরোদ। লোকটা সব গুলিয়ে দিল, 'এ তেঁতুল তো খেতি পারিনে আমরা—বিষ! একবার খেলিই জ্বর—তারপর ভুল বকে কালঘুম—একদম ঢলে পড়তি হবেনে!'

হরনাথ একটা তেঁতুল ভেঙ্গে তখনও গন্ধ শুঁকছে।

ক্ষীরোদের মুখ দেখে কী দয়া হল লোকটার। বলল, 'এ আপনার জঙ্গলে তেঁতুল। ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার বাপ জঙ্গল হাসিল করে গরাণবেড়ের মুলুক বসায়—সেই ইস্তক গাছটা আছে। কী শোভা ছিল আগে—ছোটবেলায় গা ভরে এমন ঝুলে থাকত—'

'না গায়েন, রস কষে গেছে—এ তেঁতুলে আমার হবে না। ও তুমি নিয়ে যাও—'

লোকটা হ্যারিকেন বরাবর সিধে দাঁড়িয়ে গেল, 'তা হবে না কবিরাজ। কত আজে বাজে লতা পাতা কিনছ দিনভর—আর গাছের এমন আদত ফল নে ফিরে যেতি হবে?'

'দরকার না থাকলে যেতে হবে।'

'এতটা পথ ভেঙ্গে এলুম'—

'সে তুমি ফি বারই বল। দরকার না থাকলে কাহাতক কিনি বলতো গায়েন? এমন নয় যে, ঘরে রেখে টক রেঁধে খাব!'

'পোকায় এবার ধান পাট সব শুকিয়ে পুড়িয়ে জেরবার করেছে। নয়ত আসতুম না—নাও রেখে দাও, খরার দিন কাজে দেবে—'

লোকটা নিজে নিজেই সামনের আলমারির খোলা তাকে একটা করে তেঁতুল তুলে সাজিয়ে রাখছিল।

'নোংরা করো না। ঝামেলা ভাল লাগে না গায়েন—' হরনাথ উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার চেয়ারে বসল। গায়েন কাপড়ের খুঁটে তেঁতুল তুলে নিয়ে ফুটপাথে নেমে গেল।

ভীষণ শীত পড়েছে, মুলোর দর এখনও নামছে না—এইসব ধানাই পানাই বলে টাকার কথা না পেড়েই কোন গতিকে ক্ষীরোদ রাস্তায় নেমে পড়ল। তেঁতুল নিয়ে দু' দুটো হুমদো বুড়ো যা করছিল, চোখে দেখা যায় না। ফুটপাথের তেলেভাজা দোকানীর তোলা উহুনের ধোঁয়া ফুঁড়ে শাদা রঙের লম্বাই চওড়াই গায়েন হুস হাস এগোচ্ছে। পরনের কাপড়ের খানিকটা গায়ে। ক্ষীরোদ একরকম দৌড়েই ধরে ফেলল, 'কতদূর যাওয়া হবে?'

রাস টেনে দাঁড়াল লোকটা, 'কোথায় দেখিচি বলুন তো?'

'কবিরাজের দোকানে—এই মাত্তর!'

দুই থাবা দিয়ে ক্ষীরোদের হাত ধরল। জানলার রডের পারা আঙুলগুলো আর একটু লম্বা হলে তার কনুই ধরে ফেলত।

'বুড়োর বাপ থাকতে তেঁতুল, অর্জুন ছাল কত কি দে আসতুম—' একটু থেমে বলল, 'আগে কত রুগী বসে থাকত—হরনাথই বা করবে কি!'

ক্ষীরোদের হাত ছেড়ে দিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ক্ষীরোদ দৌড়তে লাগল। 'ন'টা আটান্ন না ধরলে বাস পাব নি। এত আঁধার —এখন আর দু' কোশ একা হাঁটতি ভাল লাগে না।'

ক্ষীরোদ আর ভূমিকা করার সময় পেলে না, 'অনেকদিনের গাছ—'

দমকে বেরিয়ে যাবার আগে গায়েন আবার থামল, 'কোন গাছ?'

ফুটপাথে কথা বলা যায় না। লোকজন বন্ধ নেই কোন সময়, 'তাই তো বলছিলেন গায়েন মশায়—সাতপুরুষের—'

একদম থেমে গেল গায়েন, 'ওঃ! আমাগে গড়াণবেড়ের—সে মশায় বড় অগড়ের গাছ—তার অগড়ের কথা কত বলব—'

'যদি বলেন তো একবার দেখে আসি—'

'যাবেন? গড়াণবেড়ে যাবেন?'

'খুব! সকাল সকাল গিয়ে ঘুরে আসব। কালই সকালে—'

'কাল নয়—আট গাড়ি খড় নে খালিশপুর যেতি হবে—পরশু আসুন—ভোরের ট্রেনে চড়ে বাসুলিডেঙ্গা নাববেন, চাকবেড়ের মোড়ে আমায় পাবেন —না দেখলি হাঁক পাড়বেন নীলাম্বর গায়েন বলে—'

পরশু আর কথা বলতে পারেনি গায়েন। না ছুটলে ন'টা আটান্নো মস্ হয়ে যেতো।

সে রাতেই গোলায় ফিরে ক্ষীরোদ তিনখানা বড় করাত ভাড়া নিয়েছে। গরাণবেড়ের লোকজন লাগিয়ে তিনদিনে কুড়োলে কুড়োলে পুরো গাছটা খানকয়েক গরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিতে হবে। বাসুলিডাঙ্গা থেকে রেল বুক করে দিলে পরদিনই চিৎপুর ইয়ার্ডে মাল ডেলিভারি। তারপর কয়েক ক্ষেপে লরিতে পুরো গাছটা গোলায়। তখন ভাড়ার করাতে চেরাই, প্লেন, পালিশ। অতকেলে গাছ—মোদ্দা কত হাজার সি এফটিতে দাঁড়াবে! মনে মনে হিসেব কষতে গিয়ে সব অঙ্ক গুলিয়ে গেছে। এসব কাগজ-কলম ছাড়া জুৎ হয় না। হাঁক দিতে হল না—বরং কানের কাছে গিয়ে আস্তে ডাক দিল ক্ষীরোদ, '—গায়েন মশাই, ও নীলাম্বর গায়েন—'

একটু নড়ে চড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। খালপাড় থেকেই দেখতে পেয়েছে ক্ষীরোদ। পুকুরপাড়ে তুলে দেওয়া শুকনো কচুরিপানার ডাই

জুড়ে মা-সুদ্ধ পাঁচ-ছ'টা কুকুরছানা রোদ পোহাচ্ছে। তাদেরই দু'টোকে কোলে নিয়ে গায়েন ঝিম মেরে বসে।

'এসে গেছেন। ভাবলুম বেলাবেলি বেইরি আসতে দেরি হবে আপনার, তাই অঘোরের ঘরে বসতিই এই কাণ্ড—।' ভগ্ ভগ্ করে গন্ধ আসছে। সারা মুখে জোর গোটা আটেক দাঁত। তার ভেতর দিয়েই হেসে বলল গায়েন, 'অঘোর বেটে মুকুজ্যেদের চর-হাসিল দশ বিঘে খালি জমি কিনল। ওদের হয়ে অনেক খুনখারাবি করেছি—মুকুজ্যেরা তাই আমাকে দেখেই তিন হাজারের ভেতর সবটা জায়গা অঘোরকে লিখে দিলে। বেটে অঘোর সকালবেলাই তাই এসব ছাইপাশ গিলিয়ে দিলে—'

আল ধরে ধরে গায়েন এগোচ্ছে—ক্ষীরোদ খানিক দৌড়ে তাকে ধরল। দুই ছেলে নিয়ে এক চাষী পাল্লা পেড়ে বসেছে। একটা উঁচু ঢিবিতে পাল্লা খাটিয়ে মাঠের ধান মাঠেই বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। সেকথা বলতে গায়েন তিরিক্ষি হয়ে উঠল, 'লিভির ভয়ে পিচ রাস্তায় ধান নে যাবার পথ নেই—চৌকি বসেছে—'

খানিক জায়গা জুড়ে ধানগাছ সব খাক্। এসব জায়গায় বর্ষার মুখে মুখে বিষপোকার ঝাঁক উড়ে গেছে—ধান দূরে থাক, ভাল খড়ও পাওয়া যাবে না।

পথ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে গায়েন নিচু হয়ে ঘাসের চেয়েও সবুজ খুদে খুদে বরবটি তুলে ক্ষীরোদের হাতে দিল, 'ভেঙ্গে মুখে দিন—রাখাল কড়াই, বয়েসকালে গরু চরাতে এসে ক্ষিধের চোটে এসব কত খেয়েছি—শুকিয়ে নিলি ভাল ডাল হয়—'

'গরু ছিল বুঝি—'

'হেলে গরুই বেশি—একাই বিঘেটাক দিন ভরে চষে ফেলেছি কত। সন্ধ্যেবেলা চরানির মাঠ ঢেকে রেখে দিতুম—রাত থাকতি জোচ্ছনায় সেখানে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতুম, ভোর হলিই হালে জুতে—'

'সাপটাপ—'

'কোথায়? আজকাল আর দেখিনে—'

ক্ষীরোদ কিন্তু সাবধানে পা ফেলে এগোতে লাগল। এমন দশ বিশ হাজার বিঘের মাঠে যে কোন জায়গা থেকেই সাপ উঠে আসতে পারে।

'আছে দু'একটা—খুব রাত না হলি বেরোয় না। ভয়ানক বিষধর।

তবে, আগে অনেক ছেল। সত্তর আশিটে কেউটে আমিই সাবাড় করিছি—'

'লাঠি দিয়ে—'

'লাঠি কোথায় ! এই হাত দে—' গায়েন দাঁড়িয়ে গেল।

আর কত দূর গরাণবেড়ে। অনেকক্ষণ বসতবাড়ির পরিষ্কার চিহ্ন জায়গায় দাঁড়ানো হয়নি। নিশ্চয় সেখানে সাপ থাকে না।

'এখন যেখানে দাঁড়িয়ে—তার মাথায় অন্তত ষাট হাত জল ছেল—বিদ্যেধরীর জল, নৌকো এ জায়গায় এলি পয়সা ছুঁড়ে দিতুম—'

'এখানে? নদী?'

'এ জায়গা তো মধ্যিখান—তিন মাইল চওড়া বুক ছেল, আমিই চাল বোঝাই দে ধোসারহাট ঘুরে চেতলার আঢ্যিদের গোলায় কালীগঙ্গা ধরে নৌকো পৌঁছে দিতুম। ওই যে বাবলার ঝাড়—রশি দশেক হবে, ওসব গাছ ত বছর সাতের—নদী ফুরে আসার মুখি পাখিদের কাণ্ড।'

ক্ষীরোদের আর কিছু বলতে হল না অনেকক্ষণ। নীলাম্বর আগে আগে হাঁটছে। পেছনে ক্ষীরোদ, সামনে কেউ নেই। সেই ফাঁকার দিকে তাকিয়ে নীলাম্বর কথা বলছে। উলটো দিক থেকে বাতাস এসে তার কিছু শব্দ তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে। ক্ষীরোদ খানিকটা শুনতে পেল—তাকেও পথ দেখে পা চালাতে হচ্ছে।

'বিদ্যেধরীর বুক জেগে উঠতি দু'পাশে লাঠালাঠি শুরু হয়ে গেল। যার জমির লাগোয়া চর ওঠে সেই রাজা—দুশো-পাঁচশো বিঘে হামেশাই অনেকের ক্ষেতের গা দিয়ে জেগে গেল। কিন্তু দখলে রাখা চাই। আর লাঠালাঠি!' এখানটায় থেমে গায়েন দু'হাতে তালি দিয়ে হেসে উঠল।

ক্ষীরোদ মানে না বুঝেও সঙ্গে সঙ্গে হাসল। গাছটা নীলাম্বরদের।

'আমি তখন বড় গুণ্ডো। বুকে বুকে খাড়াই গুতো মেরে মাল খেলি—যার লাগে তার চড়চড় করে আওয়াজ হয়—আমি দাঁড়াইনে, ফেড়ে বেইরে যাই। মুকুজ্যেদের বড় তরফ ডেকে নে বললে, নারাণপুরের কাছে পাঁচ হাজার বিঘের চরটা দখল করে দিলি একশো বিঘে জায়গা লিখে দেবে—

'তা দেছেলে—হোসেনপুরের মোড়লদের বড় ছেলেটাকে কেটে ফেললাম। জোয়ান বয়েস, রক্তের রঙ কী—জমি দখলে এমন কত হত—' গায়েন থেমে থেকে মাঠের মাঝখানে এক জায়গায় আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই যে রূপশাল ধান দেখিছেন ওখানটায়—ঠিক ওই থাক্ মত জায়গাটায়

খুনটো করি—'

ধান আছে—ভেতরের দুধ পোকার বিষে শুকিয়ে থাক্। এতক্ষণ দু'জনে গরুর গাড়ির লিক্ ধরে এগোচ্ছিল। এবারে গাঁয়েনের সঙ্গে মাঠে নামল ক্ষীরোদ।

'খুনটা হয়ে যাওয়ার পর মন মুষড়ে গেল—কিন্তু তখন ছেলেরা ছোট, আমার ফাঁসি হলে ওদের দেখতো কে? মাঠের মধ্যি বসেই মোড়লদের, ছেলেটাকে ল্যাজা দে এতটুকুন টুকরো টুকরো করে চৌদিক ছড়িয়ে দেলাম —আর কী শকুন! তিন দিনের ভেতর—সব সাফ!

'তারপর একশো বিঘে নে কি করব? আর কি মাটি! ধান ছড়িয়ে দি তো ধান বেরোয়—এই তার গোছ—কিন্তু মুসকিল দেখা দেল সাপ নে। যেখানে কোপাও নরম মাটি পেয়ে সাতদিনের ভেতর গোখরো তার ছানা পোনা নে হাজির। গোটা কয়েক মারার পর আমাকে দেখলি ওরা গর্তে গিয়ে লুকোতো। আমি লেজ ধরে টানতুম—উল্টো টানে গায়ের মাংস খাবলা খাবলা উঠি যেত। সে অবস্থায় মাথার ওপর পাক দে ছুড়ে দিতুম—তারপর বাচ্চারাই পিটে মারত।'

'গরাণবেড়ে আর কতদূর?'

'এসে গিছি।'

নদীর বুকের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আগেকার পাড়ে এসে উঠতে আরও আধ ঘণ্টা লাগল। সেখানেই মার খাওয়া নদীটাকে পাওয়া গেল। খানা কেটে দেওয়া ড্রেনের চেয়েও সরু—জলের ছিটে ফোঁটাও নেই, দু'ধারে কিছু বুনো ফুল ফোটে।

'এই নদী গিয়েই আমাদের সব্বনাশের শুরু। নদীও গেল—মাছ গেল, ব্যবসা গেল—'

এত গাছ, আড়াল আবডাল নেই—শুধু মাঠ, হামেশাই দশ বিশ বিঘের দিঘি—তাতে পলক পড়ে না এমন শালুকের পুরু চাদর, বাতাস একটু থামতেই শুকনো বকুলের ভারি গন্ধ। ক্ষীরোদ একটিপ নস্যি নিয়ে ফেলল।

'দেখতি পাচ্ছেন?'

দক্ষিণে তাকিয়ে ক্ষীরোদ থমকে দাঁড়াল। আকাশের সবখানি জুড়ে সবুজ একটা মাথা উঠে গেছে। পাতার চেহারা অন্য তেঁতুলের চেয়ে কিছু আলাদা। এক একখানা ডালে শেয়ালদার আধখানা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে যাবে।

এ কেটে নিয়ে গরুর গাড়িতে চাপাতে কম করেও মাস খানেক চলে যাবে।

'পিঁপড়ে হয়নি গাছে? পোকা?'

'নালসের ডিম আছে ঝুড়ি ঝুড়ি। পোকামাকড় নেই একদম। একটুও ঘুণ ধরেনি—'

গাছের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্ষীরোদ নীলাম্বরের সঙ্গে এক উঠোন লোকের মধ্যে এসে পড়ল। জনা ষোল ধান ঝাড়ছে। ইঁটের চেয়েও কঠিন মাটির দাওয়ায় এক তে-মাথা বুড়োর পাশে খেজুর পাতার চ্যাটাইতে বসতে হল। পরামাণিক বুড়োর গালে ফটকিরি বুলিয়ে ক্ষীরোদের থুতনী ধরে ফেলল।

'কামিয়ে নিন্—আপনারা শহরগঞ্জের মানুষ—' নীলাম্বর নিজেই পরামাণিকের বাক্স এগিয়ে দিল।

গাল বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষীরোদ সামনেই আবার তেঁতুলগাছটা দেখতে পেল। গোড়ায় একটা ভাঙ্গা টিউবওয়েল।

'জল ওঠে না?'

'অনেক টাকা দে বসাই। দু'বছর না ঘুরতি বালি ঢুকে বন্ধ হয়ে গেল—'

'কত ফুট?'

'সাতশো সাড়ে সাতশো—জল এখানে অনেক নীচে—' সেই বুড়ো এক লাফে মাটিতে নেমে বলল, 'সোঁদরবনের মাটি তো—'

'তাই বুঝি।'

'লোলাম্বর তখন ছোট। ওর বাপ আর আমি দেখিছি—আমাদের খুড়ো মশাই লাঙল টানতে পারতেন না। লাঙ্গলের ফলা মাটিতে ঢোকেই না। ঢুকলিও গুচ্ছের শেকড়বাকড় আটকে যায়—'

'কী রকম?'

'তল্লাট ভরে তো শুধু গাছই ছেল। খুড়োমশাইর বাপ কত গাছ সাবাড় করে লোকজন বসায়। ওই লাউ মাচার নীচি রোজ সন্ধ্যেবেলা বাঘ এসে বসি থাকত। পুকুর দেখিছেন—ওর ভিতর থিকি ওই ঘরের সামনে গাছের গুঁড়ি বেইরেছে—আঁধারের চেয়েও কালো।'

'বাঘ লোক খেত না?'

'খেত। তবে আমাদের কাউকি খায়নি। খুড়োমশায়ের বাপের জন্যি—'

এক গাল কামানো হয়ে গেছে ক্ষীরোদের। এমন সময় গাঁয়ের চৌকিদার এল। খালি গায়ে লুঙ্গির ওপর পেতলের তকমা বেল্ট্ ঝুলছে। চেঁচিয়ে বলে গেল, দশদিনের ভেতর 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' শ্রেণীর রেশন কার্ডের জন্য নাম লেখাতে হবে।

নীলাম্বর বুড়োকে দেখিয়ে বলল, 'খুড়োমশায়ের বিয়ের পর রেল লাইন বসিছে ইদিকে। ওনাদের খুড়োর বাপ বড় তেজি ছেলেন। বাঘ টাঘ তারি সমঝে চলত—'

ক্ষীরোদ পরামাণিকের হাত থেকে মুখখানা বাইরে এনে নীলাম্বরের খুড়োর দিকে তাকাল। বুড়ো খুড়ো এবারে সব ভেঙ্গে বলল, 'আমাদের খুড়োমশায়ের বাপের লেজ ছেল—'

নীলাম্বর বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি ছেল। তিনি এ গাছ থিকি ও গাছে লাফাতি পারতেন—নিজিরই শোরের খোয়াড় ছেল। পাকাবাড়ির মেঝেয় চড় মেরে দাওয়া ফাটিয়ে দেতেন। শেষ বয়সে দাঁত পড়ে যাওয়ায় কড়া চাপানোই থাকত। আধপোড়া শোরের মাংস গিলি গিলি খেতেন।

—লাউ মাচার নীচে একবার এক বাঘ এসি ওনার হাতে প্রাণটা দেলে। এক মুগুরের ঘায়ে বাঘের মাথা ফাঁক—'

'কতদিন বেঁচে ছিলেন—'

'লোকে বলে দু'শো বছর—তবে অত নয়'—একটু থেমে নীলাম্বর বলল, 'তিনি কবে মরলেন কেউ তা দেখেনি।'

'মানে ?'

'শেষ বয়সে নাকি একা একাই করাতি নদী পার হয়ে সোঁদরবনের দিকে হেঁটে চলে গেছেন—আর ফেরেননি।'

নীলাম্বরের খুড়ো বলল, 'আমরা তখন ছোট। লোলাম্বরের বাপ ওই তেঁতুলগাছের একখানা বড় ডাল কেটে গুছিয়ে রেখিছে। খুড়োমশায়ের বাপের শরীরটা হেলে গেছে কিছুকাল। মরলিই লাস চিতেয় দিতে হবে। ছেলে পেলে নাগ কবে কাবার হয়ে গেছে। মুয়ে আগুন দেবার জন্যি আমরা, নাতিরা টিঁকে আছি—একদিন সকালে উঠি দেখি আর নেই। দুপুরের দিকি দূর গাঁয়ের রাখালরা খবরটা দেলে, পোড়ো গায়েনকে তারা ডোঙ্গায় চাপি সোঁদরবনের খাল ধরি এগুতে দেখিছে—সেই শেষ খবর।'

একটা ডাব কেটে নীলাম্বর ক্ষীরোদের হাতে তুলে দিল, 'এই আমাগে

অগড়ের তেঁতুলগাছ। খুড়ো মশায়দের খুড়োর বাপ ছাড়া সবাই ও গাছের ডালে পুড়িছে। আমার মেজদি পুড়িছে, শৈলাদি পুড়িছে—আজকাল পাখিরা আর বসে না, আগে ঝাঁক ধরে ওই তেঁতুল ঠুকরে তলায় ঢলে পড়ি থাকত।'

যাকে নিয়ে এত কথা, ক্ষীরোদ দেখল, এমন বাতাসে মগডালে তার কিছু পাতা শুধু কাঁপছে। ধানকাটা মাঠে নীলাম্বরের বড় ছেলে লাঙল দিচ্ছে। কড়াই বুনবে। দূর রাস্তা দিয়ে বাস যাচ্ছে, গাছপালা বলে দেখা গেল না, ক্ষীরোদ শব্দ শুনতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল, 'এমন অমঙ্গুলে গাছ রেখে কি করবে গায়েন—যদি দিতে, নিয়ে যেতাম'—কথাটা গোড়াতেই এর চেয়ে আর খোলসা করে বলা যায় না।

'এত বড় গাছ কি প্রকারে নেবেন'—কিছু অবাক হয়েছে নীলাম্বরের খুড়ো, 'আমার এই বয়সে কত ঝড় দেখলাম ওকে নিতে এল—নড়াতিই পারলো না।'

'লোকজন এসে নিয়ে যাবে। দশটা কুড়োল লাগালেই ভাগে ভাগে মাটিতে শুয়ে পড়বে। নায্য দর যা তাই দেব।'

'আপনি কেটে নে যাবেন?' খুড়োর মাঝখান থেকেই নীলাম্বর জানতে চাইল, 'দর কী রকম—'

'বাজার যা তাই—একটা পয়সাও ঠকাবো না। তবে গাছও কতকালের দেখতে হবে—ওতে কি আর কিছু আছে!' এ কথাটা একেবারে মিথ্যে—কেননা, অমন কাঠে কিছু না থাকলে কোথায় আছে—তাই ক্ষীরোদের গলা একটু কেঁপে গেল।

'আপনার কী কাজে লাগবে?'

'বিশেষ কোন কাজে নয়—তবে, আপত্তি না থাকলে চেরাই করে নিমতলার গোলায় পাঠিয়ে দিতাম'—ক্ষীরোদের চোখের সামনে এখন দশ হাজার ইজিচেয়ার, পঞ্চাশ হাজার পিলসুজ, এক লক্ষ পিঁড়ি নাচছে।

নীলাম্বর গাছটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পরামাণিক উঠোন পেরিয়ে গেল। বুড়ো খুড়ো বলল, 'লোলাম্বর হয়নি। বিদ্যেধরীর বুক বেয়ে আমাদের খুড়ো মশায়ের বাপ কোণাকুণি পাড়ি দেতেন রেতের বেলা—তখন জোচ্ছনায় এ গাছের পেল্লয় ভরি আঁধারের দিকে চেয়ে পাড়ে ফিরি আসতেন।'

হাতের একখানা পাকানো কাগজ কথা বলতে বলতে সোজা করে ধরল, 'এই যে চৌকো ঘর দেখিছেন—এগুলো বাড়ি, এই যে রেখার মাথায় চিকে দেওয়া ছবি—এ হল বৃক্ষ—এই আমাদের তেঁতুলগাছ—'

'সেটেলমেণ্ট ম্যাপ ?'

'উনত্রিশ সনের—তখনকার সেটেলমেণ্ট সাহেবের সই দেখিছেন নীচি,' বলতে বলতে খুড়ো ধান কাটা মাঠে শুকনো বাবলার ঝাড়টা আঙ্গুল দিয়ে দেখাল, 'সোত্ কম বলে ওইখেনটায় সাহেবের বোট বাঁধা থাকতো—তিনিই আমাগে খুড়ো মশায়ের বাপের ছবি তোলেন। কত টাকা দিতি চাইল সাহেব—পোড়ো গায়েন তবু তার লেজ দেখায়নি—'

'এমনিতে পোড়ো গায়েন রাতবিরেতে রাস্তা পার হত হেসে খেলে—দিনি দিনি কিন্তু রোদ বাড়লিই কানা, ছায়া বেছে নে বসি পড়ত ওই তেঁতুল তলায়, পিঁপড়ে কামড়ালি ধরতি পারত না। ঝাঁক ধরি কামড়ালি তবে উঠে গে তেঁতুল গাছে গা ঘষত—তখন শুকনো ছালবাকল খসি পড়ত। বৃক্ষের আতুল জায়গায় কী মোলায়েম করে হাত বুলে দেত পোড়ো গায়েন তখন।'

ম্যাপখানা মেলে ধরল ক্ষীরোদের চোখের সামনে, 'কেমন চওড়া নদী ছেল দেখিছেন,' বুড়ো ম্যাপের ওপরে একটা চ্যাটালো ড্রেনের গা দিয়ে আঙ্গুল টেনে আনল। ক্ষীরোদ ধানকাটা মাঠে তাকিয়ে ফেলেছে। ঢলা রোদের আলো কাৎ হয়ে পড়ে। ন্যাড়া মাঠের এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে গরুর ছোট ছোট ছায়া। তার ভেতর দিয়ে নীলাম্বর হেঁটে আসছে। পেছনে জনা পাঁচেক লোক। তাদের দু'জনের কাঁধে দু'টো কুড়োল।

বুড়ো বলছিল, 'এই পেল্লয় নদী সাঁতরে পোড়ো গায়েন পান্তার সঙ্গে ওই তেঁতুল জল খেয়ি ঘুম লাগাতো। বেলাবেলি উঠতি চরের মাটিতে গর্ত করে ধান গুঁজে দেত, তখন ত আর লাঙ্গল চলতো না। দু' হাত শেকড়বাকড়—'

লোকজন সুদ্ধ নীলাম্বরকে ঢুকতে দেখে বুড়োর কথা কেঁপে গেল—

'ও তুমি দর ঠিক করে ফেল ক্ষীরোদবাবু—এ গাছ আমরা রাখব না—'

নীলাম্বরকে থামিয়ে দিল বুড়ো, 'বেচে দিবি ? আমায় পোড়াবি কি দিয়ে—'

'সে আরও গাছ আছে। বাবলাগুলো কি হবে ?'

'তা বলে পোড়ো গায়েনের তেঁতুলতলা থাকবে না—অমন ছায়া রোদ্দ এসে হাট করে দেবে ?'

'তা দিক্ খুড়ো। এবার তো ধানের হালচাল দেখি মাথা ঘোরে। শ্রাবণ ভাদ্রে টান ধরলি এতগুলো পেট তো আর তেঁতুল গিলে চলবে না—এবার দাঁড়ানো লোকগুলোকে ধমকালো নীলাম্বর, 'নে নে তোরা হাত লাগা—কোথায় কোপাবে দেখে দাও—'।

'দর ঠিক হোক্।'

'বেশি কথা কয়ে কাজ কি ? না হোক্ তিনশো বছরের গাছ হবে—তিনশোটা টাকা দিয়ো—'

এতক্ষণে খুড়োর মুখে কথা এল, 'আমার ভাগ আমি বেচবো না—'

'বাগড়া দিয়ো না খুড়ো—আটকুড়ো লোক তুমি, আমরাই তোমাকে দেখব—এতকাল দেখিনি ?'

নীলাম্বরের কথায় কান দিল না, 'আমার স' পাঁচ অংশ—ও আমি বেচব না।'

নীলাম্বর গোঁজ খেয়ে দাঁড়ালো। পেটের খোঁদল বাতাসে ভরে গেছে। মাঠময় গরু ফিরছে—শুকনো ধুলোয় মাটির ওপরের আধ হাত ধোঁয়া হয়ে গেছে। নীলাম্বরের বড় ছেলের বৌ হবে, একগলা ঘোমটা দিয়ে ক্ষীরোদের জন্যে ভাতের থালা নিয়ে দাঁড়ানো।

'তোমার অংশের গুষ্টি মারি। এ সোঁদরবনের গাছ—যে নেয় তার। নে নে তোরা হাত লাগা এইবেলা—।' এবার কিন্তু পাঁচজন নয়—লোক-গুলোর মোটে একজন কুড়োল কাঁধে উঠে দাঁড়ালো।

'পোড়ো গায়েন ফিরে এলি কি দেখাবি নীলাম্বর ?' গলা ঘড়ঘড় হয়ে উঠতে একদলা কাশি ফেলে দিল খুড়ো।

'তিনখানা একশো টাকার নোট ? তোমার পোড়ো গায়েন আর ফিরবে নি।' কী খেয়াল হতে নীলাম্বর হেসে উঠল, 'কোন পথ দে আসবে শুনি ? আড়াইশো তিনশো বছরের বুড়ো তো হেঁটে আসতে পারবে নি। নৌকোয় আসবে—করাতি, বিদ্যেধরীর বুক শুকিয়ে কাঠ !'

এ সব কথার ভেতর দিয়ে বুড়ো শুধু বলল, 'ঠিক ফিরে আসবে রে। সে বেলা ভুষিসনে।'

কথাটায় কী ছিল। তেঁতুল গাছটার সামনেই জুতসই একখানা হাওয়া

চৌদিকের অনেকটা ধুলো হুস্ করে শূন্যে তুলে দিয়েই ফেলে দিল। সংগে সংগে কয়েকটা বড় তেঁতুল শব্দ করে তলায় পড়ল। দাঁড়ানো লোকটা কাঁধ থেকে কুড়োল নামিয়ে ফেলেছে। সবার সঙ্গে ক্ষীরোদও গাছতলায় তাকালো। পরিষ্কার জায়গাটুকুর ওপর খানিক ঢলা-রোদ চৌকো হয়ে পড়ে। তার বাইরেটা পাতলা অন্ধকার। সেখানে গাছটা দাঁড়ানো। এতগুলো লোকের সামনে গুঁড়ি থেকে একটা কালো জিনিস নেমে এল—রোদে পড়তেই সবার আগে নীলাম্বর হেসে উঠল, 'খড়িচোচ!'

বেশ লম্বা। সাপটা তেঁতুলগুলোর ওপর দিয়ে—রোদের বাইরে নেমে এল। অবেলায় আর ভাত খেতে পারল না ক্ষীরোদ। থালা ঘেঁটে ঠেসে জল খেয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আঁচানোর জন্যেই পুকুরে যাচ্ছিল। এমন সময় নীলাম্বর বলল, 'মেয়েরা মাছ ধুতে পুকুরে নামলিই দু'টো এসে জ্বালাত রোজ। একটাকে কোঁচে গেঁথি ফেলিছি।—এইটে তাহলে গাছে উঠে বসে ছেল।'

উঠোনের কোণে দাঁড়িয়ে মুখ ধুয়ে নিল ক্ষীরোদ। খুড়ো-ভাইপোর এখন যা অবস্থা তাতে গাছের দর নিয়ে একটু চাপ দিলেই নীলাম্বর আড়াইশো কী স'দুশোয় রফা করে নিত। যোগাড়যন্তর করে ডেকে আনা পাঁচ পাঁচটা লোক কুড়োলসুদ্ধ উঠোন ছেড়ে মাঠে নেমেছে। ক্যাচকোচ করতে করতে ধানবোঝাই একটা গো-গাড়ি এসে হাজির হল। সামনের গোয়ালে বোঁয়া ধোঁয়া দিচ্ছে, মশার ঝাঁক সেখান থেকে বেরিয়ে উঠোনের মাথায় এক জায়গায় চাক বেঁধে উড়তে আরম্ভ করেছে। আজ আর গাছ কাটার কথা ভাবাই যায় না। ক্ষীরোদ ধুলো ঝেড়ে পাম্পসুতে পা গলালো। সন্ধ্যের বাতাসে গেয়োবনের নরম ডাল পালা মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। ধান মাড়ানোর বলদটার পাক খাওয়া থামেনি—খুঁটি আলগা দেখে নীলাম্বর উঠে গিয়ে এঁটে দিল।

'এখন যাবেন কি? আমরা পোড়ো গায়েনের বাড়ির লোক, জেনেশুনে আপনাকে ছাড়তি পারিনে—' বলতে বলতে নীলাম্বরের কাকা এগিয়ে এল। কালচে অন্ধকারে বুড়ো উঠোনে—ওপরের দাওয়ায় ক্ষীরোদ। খুড়ো প্রায় লুফে ধরে ফেলল তাকে। জামার নীচের ফতুয়ার ঘড়ি-পকেটে সাড়ে তিনশো টাকা গজ গজ করছে। খুড়োর মুখ দেখে ভাল বোধ হল না ক্ষীরোদের। এই গাছ, পোড়ো গায়েনের ফেলে যাওয়া বিন্ধেশ্বরীর শুকনো

বাদা, চাকা, খোলা গরুর গাড়ির ধড়—এখান থেকে বৌবাজার-শেয়ালদায় কাঠগোলায় কোনদিন ফেরা যাবে না আর। খানিক আগে তবু কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর দূর রাস্তায় বাসের হর্ন, ঘড় ঘড় আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। এইমাত্র পোড়ো গায়েন এক চড়ে সব শব্দ বন্ধ করে দিয়েছে। বাদার মাথায় পোকায় কাটা আধখানা চাঁদ উঠতেই নীলাম্বর তার খুড়োকে বোঝানো ছেড়ে দিল। এতক্ষণ কত রকমে পথে আনার চেষ্টা চলছিল ক্ষীরোদের সামনে। তিনশো টাকার মধ্যে কী বাবদ কত যাবে তার ফিরিস্তিও দিচ্ছিল নীলাম্বর। খুড়ো উল্টো দাওয়ায় ভোম্ মেরে বসে। হ্যাঁ না কিছুই বলে না। ধরা-জ্যোৎস্নায় ক্ষীরোদ শুধু পাঁচ হাত ছায়াটাকে উঠোনময় চক্কর খেতে দেখল। এতক্ষণে বাদার গর্ত থেকে লাল কাঁকড়ার কোটি ছানা বাইরের ঠাণ্ডায় উঠে এসেছে।

'তবে খুড়ো খতেন দেখাও—কার কত অংশ বুঝে নেব।'

খুড়ো দাওয়া ছেড়ে রাগে রাগে উঁচু ঘরটায় ঢুকলো, 'লম্ফ নে এসে দেখে যা—মালিক খতেনে আমার স'পাঁচ আনা অংশ—তোর বোন শৈলর ছেলেপেলেরা ভাগ বসালি ও গাছে তোর দু'আনাই নেই—'

গুলতিতে টান দিলেও এত জোরে গুরুল ছুটে যায় না। নীলাম্বর মাথায় ঠোক্কর খেতে খেতে অন্ধকার ঘরে ঢুকে গেল। তারপর খুড়োর কয়েকটা কথা বাইরের দাওয়া অব্দি পৌঁছে শুধু একটা লম্বা চীৎকার হয়ে গেল শেষে। তাও বেশিক্ষণ থাকল না। মেহগনির প্রথম পালিশেও গন্ধ উঠেই এমন উবে যায়। খুব ভারি নিঃশ্বাসে ঘরের অন্ধকার মাড়াই হচ্ছে প্রায়। কয়লা খেকো পুরনো লোকাল ইঞ্জিনটা ভোরের ট্রেন টেনে বাদুলিডাঙ্গা এসে মাড়ি, দাঁত সব টলে ফেলে নীল ধোঁয়াটে নিঃশ্বাস ফেলছিল আজ সকালে।

পাম্পসু ক্ষীরোদের পায়েই ছিল। নদীর ফেলে যাওয়া মাটি শেষবারের মত জল চুয়ে নিয়ে পাথর হয়ে আছে। জুতো জোড়া বগলে রয়েছে অনেকক্ষণ। পায়ের নীচে কড়া ফেড়ে যাচ্ছে—তবু না দৌড়ে নিস্তার নেই। রশি দশেক দূরের বাবলার ঝাড়টা পেরোবার সময় এমন একটানা মাঠে এক-পোচড়া ভুষোকালির চেয়ে বেশি কিছু লাগল না তার। ওই জায়গাটায় সেটেলমেন্ট সাহেবের বোট বাঁধা থাকত। ফাঁকা দেখে চাঁদ অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে। দৌড়োনোর ঝোঁকে একবার নীলাম্বরের গলা হাকড়ানি পেছু-ডাক ছুটে আসছে বুঝতে পেরেছিল। ল্যাজা দিয়ে পুরো একটা মানুষ

পাইজে আনে কী করে। এখন দেখে শুনে পথ ঠিক করে নিতে হবে। ওই তো রূপশাল ধানের মাঠ। বোধহয় তাই। সবই একরকম লাগছে। উপরে তাকাতে ক্ষীরোদ চাঁদের কিছু উনিশ-বিশ বুঝতে পারল না। পোকা এবার ধানের দফা শেষ করেছে। বর্ষার মুখে মুখে আরও কম টাকা নিয়ে নীলাম্বরের উঠোনে এসে দাঁড়ালে ভাইপো সুদ্ধ বুড়ো খুড়ো আজ এই সন্ধ্যের পরেও টিঁকে থাকলে কাঁধে কুড়োল নেবে ঠিক। মগডালের রসালো কাঠে-হলুদ রঙের পিঁড়ি বানিয়ে ক্ষীরোদ তখন রথের মেলা ছয়লাপ করে ছাড়বে।

হঠাৎ মাঠ নাবি নিতে থমকে দাঁড়াল। এ যে নেবেই যাচ্ছে। বাদা জুড়ে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠল, বিদ্যেধরী শুকোতে শুকোতে করাতি মুছে গেছে। বর্ষার জল দাঁড়ালে বেরোতে চায় না। সেই বাদা ডিঙ্গিয়ে পোড়ো গায়েনকে নাকি ফিরতে দেখেছে নীলাম্বরের বড় ছেলে। যত্ত তেড়েল গেজেল!

উল্টে পড়ল ক্ষীরোদ। পা ঠিক জায়গায় রাখতে পারেনি। পাম্পসু কুড়িয়ে উঠতে গিয়ে বসে পড়ল। করাতি-বিদ্যেধরীর শুকনো জল হু হু করে ফিরে আসছে। রূপো রঙের। পড়ি মরি উঠতে গেল। হাঁটুর কল-কব্জায় জং ধরে আছে কতদিন। পাম্পসু পড়ে গেল হাত থেকে। হামা টানার কায়দায় বুক ভরে দম নিয়ে ছিটকে বেরোবার চেষ্টা করল ক্ষীরোদ। দৌড় ত দূরের কথা—দাঁড়ানোর মত এমন চেনা জিনিসটাই কিছুতে হল না। হচ্ছে না। হাঁটুই খোলে না। যখন এখানে এভাবে থাকতেই হবে—তখন আর পাম্পসু খুঁজে লাভ নেই বুঝে যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই ক্ষীরোদ একটুও না নড়ে বসে গেল। কোথাও অন্ধকারের ছিটেফোঁটাও নেই। বাদা ভর্তি জ্যোৎস্না। ডোঙায় চড়ে পোড়ো গায়েন ইচ্ছে করলেই ফিরতে পারে এখন।

অন্নপূর্ণা

কার্তিকের বৌভাতে সকালবেলা এই পথ দিয়েই মাছ গেছে। কলকাতার ঠাকুররা হাতা-খুন্তি হাতে কাঠের বারকোস মাথায় দিয়ে বিশ্বাসদের সানের পুকুর পাড় ধরে এই পথেই বিয়ে বাড়ি গেল। এখন সন্ধ্যেবেলা। গাঁয়ের পথ আলো করে দু'টো হ্যাজাক যাচ্ছে।

কিছুই চোখ এড়ায়নি হাজরার। গালে কালো দাড়ি। মনের ভাব মুখে ধরা পড়ে না। চোখ দু'টো মোটা ভুরুর ছায়ায় থাকে। কখন জ্বলে, কখন নেভে—কেউ তা জানে না।

সন্ধ্যের মুখে-মুখে একবার বাজারে যাবে ঠিক করে ফেলেছিল। একটা মিথ্যে আশা আজ ক'দিনই হাজরার মনের মধ্যে পাক খাচ্ছিল। দুপুরেও একবার মনে হয়েছে, হয়ত বিকেলে ঘরে ফিরে শুনবে—কার্তিকের বৌভাতে বাড়িসুদ্ধ লোককে খেতে বলেছে। কাজকম্মের বাড়ি, আত্মীয়কুটুম্বে বোঝাই —তাই বলার সময় পায়নি।

এবার বর্ষা এসেছে দেরিতে। সামনে পুরো ভাদ্র মাসটা পড়ে আছে। অথচ আকাশ যেন শরৎকালের। নির্মেঘ। নীল। তবে মাঝে মাঝে কালো মেঘে ঝুলে পড়ে। তখন গত বছরকার মোটা আল দিয়ে পিঁপড়ের সারি ডিম মুখে করে ডাঙা জায়গার খোঁজে ছোটে। চারদিক গুমোট। তবু বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। এখনো অর্ধেক মাঠ জলের অভাবে পড়ে আছে। আর কবে জল হবে! আর কবে লোকে রোয়া ধরবে!

হাজরার সামনে স্টেশন। বাজারে যাওয়ার রাস্তা। পেছনে গাঁ ঘেঁষে দু'-তিনশো বিঘের এক বন্দে জায়গা—তার ওপরেই কোম্পানি-বাঁধের গায়ে তার নিজের ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। পুকুর পাড়ের সজনে গাছটা পর্যন্ত এখান থেকে চেনা যায়। সামনে কোন বাধা নেই। স্রেফ দু-একটা বাবলা

গাছ আর ন্যাড়া মাঠ।

সামান্য যেটুকু যা চাষ হয়েছে—তার ভেতর দিয়ে হাজরা বড় রাস্তার দিকে এগোতে লাগল। সকাল থেকেই ছাকা তেলে নেমন্তন্ন বাড়ির পটল-ভাজা, মুড়িঘণ্টের, ডালের গন্ধ পাচ্ছিল মাঠ দিয়ে। কার্তিকের বৌভাতের হ্যাজাক এখন গাছপালার আড়ালে চলে গেছে।

চোখের নজর কেমন মোলায়েম হয়ে এসেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যেতক একপো জায়গা নিড়িয়ে ধান চারার গোড়াগুলো ঘেঁটে দিয়েছে। নগদ তিনটি টাকা—পান্তা আর গরম জুটেছে আজ হাজরার। ঠায় মাথা নিচু করে সারাদিন জমি আঁচড়ে এগোতে হয়েছে। মুখে রক্ত এসে থানা দিয়ে গাল ভারি করে তুলেছে তাই।

খেয়ে পেট ভরেনি। বনঝাল গাছের জঙ্গলে, বাঙালদের মাঠকোঠার ঢোলকলমির বেড়া দিয়ে শুধু ভাতের গন্ধ উঠে আসছিল। ভুর ভুর করে। তাতে নানান জিনিস মেখে মনে মনে এক-এক গ্রাস দলা পাকাতে পাকাতে হাজরা বড় রাস্তায় উঠে এল।

এখানে একটি মদ্দা তাল গাছের নীচে পা-কাটা এক খোঁড়া থাকে। তালপাতার ছাউনি দিয়ে দোকান করেছে। সকাল সন্ধ্যে বিড়ি বাঁধে। দেড় টাকা ভরি গাঁজা বিকোয়। পুরিয়া পাঁচ পয়সা। সরকারী গ্লাস আছে। এক ভাঁড় রস নিয়ে গোল হয়ে বসলে হাতে হাতে গ্লাস ফেরে। বাসি তাড়ি গুলঞ্চের রস দিয়ে তারানো—পেটে পড়লেই মাথাটা দাউ দাউ করে ধরে ওঠে। আবার ভোরবেলা পাইকারি ব্যাপারীরা ওই তালতলাতেই আমড়া থেকে লাউ মুলো—সব ঢেলে বেচাকেনা করে। পাশেই খাল। সোজা গিয়ে মাতলায় পড়েছে।

খোঁড়ার দোকানে ঢুকে হাজরার কাছে দুনিয়াটা সরল হাল্কা হয়ে গেল। খাঁটি রস বিশেষ ছিল না। সকালের ট্রেনে স্যাকারিন আর মিল্ক পাউডারে মিশেল তাড়ি বারো আনা ভেজালের সঙ্গে কলকাতায় চালান হয়ে গেছে। বাকি যা ঝড়তি-পড়তি ছিল—তাতে আবার ফুট কাটছিল। গ্লাস দশ পয়সা। তিন গ্লাস তাই—সঙ্গে এক পুরিয়া গাঁজা—হাজরা কয়েক লহমায় রাজা হয়ে গেল।

দাম মিটিয়ে দেওয়ার পর কোমরে নগদ দু' টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা গজগজ করছিল। এখন তার ভাবনা কিসের। জ্বর-জারি, মন খারাপ, অভাব

কাপড়ের খুটের পয়সা দিয়ে খানিকক্ষণ তো ঠেকানো যাবে।

সারাদিন খাটা-খাটনির পরে বাসি তাড়ির সঙ্গে গাঁজার ধোঁয়া হাজরার বুকের ভেতর বাড়তি জোর এনে দিচ্ছিল। পা দুখানা এলোমেলো পড়লেও বেশ জোরে এগোচ্ছিল। পথে একটাও কুকুর পড়ল না। সব গিয়ে এখন কার্তিকদের কাজের বাড়ি হাজিরা দিচ্ছে।

বাড়ির পুকুর পাড়ে সজনেতলায় এসে মনে পড়ল। ওই যাঃ! সব তো গোলমাল হয়ে গেছে। খুকির মা বলে দিয়েছিল, খাটুনির পয়সা দিয়ে এক কিলো আটা নয়ত ভুট্টা নিয়ে যেতে। তা তো আনা হয়নি।

জ্যোৎস্নায় উঠোন বড় আনন্দের দেখাচ্ছিল। ভাঙা গোলাঘরের মাটিতে মানকচুর নধর ডগা ঘরের ছই বরাবর সিধে উঠে গেছে।

এই সময়ে তেজ দিয়ে কথা বলে থাকে হাজরা। দু-দুবার জোর গলায় ডাকল। আসলে তার ভয় করছিল। বারো চোদ্দ বছরের বিয়ে-করা বউটা গেল কোথায়। সাড়া নেই কোন। ছেলেটা, বড় খুকিটা—তারাই বা কোথায়?

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না।

প্রমীলা বেরিয়ে এসে বলল, 'আস্তে চেঁচাও। জেগে উঠবে।'

তেলাকুচো লতার ওপর থোকা থোকা জোনাকি লেজে আগুন জ্বেলে হেঁটে বেড়াচ্ছিল।

'কই! তোমার নেমন্তন্ন এল!'

হাজরা বেরোবার সময়েও আজ ভোরে বলে গেছে, বিকেলের ভেতর কার্তিকদের বাড়ি থেকে লোকজন এসে ডেকে নিয়ে যাবে ঠিক। সেরকম একটা ক্ষীণ আশা ছিল। কেউ ডাকতে আসেনি।

মণ্ডলগিন্নির ধান ভেনে দিয়ে আধ পালি মত খুদ হয়েছিল। সঙ্গে পুকুর পাড়ের সাচি শাক ভাজা। খুঁটিনাটি জানিয়ে শেষকালে প্রমীলা বলল, 'ওদের মুখেও স্বাদ হয়েছে। আজকাল আর খেতে চায় না। বড় খুকি তো নিজেই এদানী গেঁড়িগুগলি তুলে আনে। বলে, ঝোল রেঁধে দে—'

'একগাছি জাল থাকলে না-হয় পুকুরে কিংবা খালে ফেলে দেখতাম—' বলেও হাজরার মনে পড়ল, তার এই চল্লিশ বছরের জীবনে জ্ঞাতিদের সঙ্গে শরিকানি পুকুরে কোনদিন মাছ ফেলা হয়নি। মাছ ফেলা মানে ঝগড়া ডেকে আনা। বর্ষায় খালবিলের যা-কিছু ভেসে আসা বিলসে মাছ পড়ে—

তাই ধরে খাওয়া হয়। তবে বেওয়ারিশ খালে দু'একবার বড়সড় মাছ পেয়েছে হাজরা।

সারা পাড়া এই সন্ধ্যেবেলাই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি। না সবাই বুঝি কার্তিকদের বাড়ি গেল। বৃষ্টির অভাবে উঠোনে যা-কিছু সবজি দিয়েছিল—সব পুড়ে খাক। সামনে কেষ্টবাবুর আবাদে জ্যোৎস্না পড়ে ঠনঠন করছে। একগোছ ধানও লাগানো যায়নি। জল নেই।

'আশা ছিল, কার্তিক নিজে ডেকে নে যাবে। বারো বছর বয়সে প্রথম রাখালিতে ঢুকি। কার্তিককে তখন কাঁধে নিয়ে বেড়াতাম। আমার খুব ন্যাওটো ছিল—'

প্রমীলা কোন জবাব করল না। কয়েক বছর আগেও হাজরাদের হেলেগরু ছিল। তাদের জাবনা দেওয়ার শুকনো মেছলা আজও ঘরের গায়ে উল্টে রাখা আছে। তার একটাতেই চুল খুলে দিয়ে প্রমীলা চুপ করে বসেছিল।

হাজরার বুকের ভেতর স্যাকারিন আর মিল্ক পাউডারে ঘোলানো একটা স্রোত ওপরে উঠে আসার জন্য চাপ দিচ্ছিল। একে তার বুকের বেগ বলে বোধহয়। কিংবা অম্বল। কার্তিকদের আবাদ-বাড়ি রাখালি করতে ঢুকে সারাদিন গরু চরাতো মাঠে মাঠে। শেয়ালের গর্তে আগুন দিয়ে বড় বাঁশ হাতে নিয়ে বসে থাকত। একবার শেয়ালের হাতেই যাওয়ার দশা হয়েছিল তার।

ফাঁকা মাঠের মধ্যে বিশ-বাইশটা গরু নিয়ে আবাদ-বাড়িতে থাকত হাজরা। কার্তিকের বাবা কাজে ভুল হলে নিজে এসে কত লাথি মেরেছে হাজরাকে। তবু স্বীকার করবে, পালান বিশ্বাসের দয়া মায়া ছিল। বিপদে আপদে হাজরাদের দেখত। আশ্বিন মাসে এক মন ধান দিয়ে চাষের শেষে দেড় মণ ফেরত নিত অবশ্য। তবু দিত। এখন তো কেউ দেয় না।

প্রমীলাও তাই বলল, 'এখন আর কেউ দিতে চায় না আমাদের—' আপনাআপনি বলল, সে তোমার কার্তিকের জন্যি—

ছানাকাটা দুধের ধারা জ্যোৎস্না। তার ওপর এমন এমন কথায় কার বা নেশা থাকে!

'তবু কার্তিক ছেলেটা ভালো ছিল কিন্তু—'

'ছাই—'

হাজরাও আর তেমন জোর দিয়ে আপত্তি করতে পারল না।

'ও-ই তো তোমাদের পথে বসালো—'

কি বলবে হাজরা। কলকাতার কলেজে পাশ দিয়ে এসে কার্তিক এখানকার ইস্কুলে মাস্টার হয়েই গত দেড়-দু' বছরে পার্টির বাবু হয়েছিল। কার্তিকের কথায় হাজরা, প্রফুল্ল প্রামাণিক—ওরা সবাই ট্রেনে চড়ে শেয়ালদা গেছে—ময়দানে মিছিল করে গেছে কতবার। বড় বড় সভায় সন্ধ্যে হলে মশাল জ্বালাতো।

লাস্ট ট্রেনে গাঁয়ে ফিরে কাউকে আর ভয়ডর লাগত না। পুলিশরা কেমন কেঁচো হয়ে গিয়েছিল। সে তো কার্তিকদের ভয়েই। চরের ধান কাটা হল। এক জায়গায় জমা হল। তারপর সেসব যে কোথায় গেল। কেউ আজ আর হদিস দিতে পারে না। ভোর থাকতে জমি-জায়গা বিলি হত। সে এক মোচ্ছব গেছে। ঘরে পাঁচ সের দশ সের ধান আসতো ঠিকই। কিন্তু যারা এতকাল ধান বাড়ি দিত—তারা সেই যে গুটিয়ে গেল—চাইলে বলে, পাব কোথায়?

হাজরা আর দাঁড়াতে পারছিল না। দুটি ভাতের নেশা, দুটি ভাতের আশা তাকে আস্তে আস্তে ভীষণ কাবু করে ফেলছিল। চুপচাপ বসে থাকা বউটার কাছাকাছি গিয়েও তার ঘাড় গলা দিয়ে সেই একই ভাতের গন্ধ পেতে লাগল। আজ তার হয়েছে কি?

প্রমীলা মাথা সরিয়ে নিল না। খুব আস্তে বলল, 'খেয়েছো কিছু?'

'খোঁড়ার দোকানে তিন গ্রাস—'

'তা বলছি নে। শক্ত কিছু পড়েছে পেটে?'

'তুমি খেয়েছো—' বলে হাজরা লক্ষ্য করল, তার বিয়ে করা বউটার কণ্ঠমণিতে জ্যোৎস্না পড়ে মুখের ভারি ছায়ার নীচে এক চিলতে নরম হাড় শুধু জেগে আছে। তক্ষুণি তার মনের মধ্যে খুব মায়া হল। এরই নাম বৌ। এরই নাম মেয়েমানুষ। কিন্তু কাছে গেলেই এত ভাতের গন্ধ পায় কেন? মহা জ্বালাতন।

প্রমীলা কোন কথাবার্তা না বলে ঘরে ঢুকে হাড়ির ভেতরেই বাকি ভাতের সঙ্গে যা কিছু ছিল তাই দিয়ে বেড়ে দিল। হাজরা অন্ধকারেই ডাবা হাড়িটায় হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে খেতে লাগল।

মাটির দেওয়াল কেটে যেখানটায় হাওয়া, আলোর জন্যে জানলা—

সেখানে বাঁশের মাচায় হাজরা নিজে শোয়। তারপর প্রমীলা। তারপর খোকাখুকু। শুতে এসে হাজরা দেখল, প্রমীলা জেগে। দেখে তার খুব আহ্লাদ হল। সারাদিন সে যতবার কার্তিকের কথা ভেবে রাগ করবার, অভিমান করবার বা ঘেন্না করবার চেষ্টা করেছে—ততবারই মনে পড়েছে, এই কার্তিক ছোটবেলায় তার কোলে কাঁখে ঘুরত। তাই কার্তিককে দুষতে তার মন সরেনি। অথচ প্রমীলা আগাগোড়া কাতুকে ভালো নজরে দেখে না। এই কার্তিকের জন্যে নাকি তাদের যত কষ্ট।

হাজরা কোন আপত্তি করেনি। বাঁশের মাচায় এখানটায় শুয়ে শুয়ে পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখা যায়। মেঘ দেখা যায়—ভোরবেলা সূর্য ওঠা নজরে আসে। এখানটায় শুয়ে এসব দেখতে দেখতে হাজরার মন থেকে সবার ওপর রাগ দ্বেষ উবে যায়। সবাইকে সে ক্ষমা করতে পারে। বৃষ্টির আগে ফড়িংয়ের দল মাঠে দল পাকিয়ে ওড়ে। তাদেরও এখান থেকে শুয়ে শুয়ে দেখা যায়। তখন কারও ওপরে রাগ থাকে না। এই বুঝি পৃথিবীর নিয়ম।

পঞ্চাশ সালে সে নিজের চোখে দেখেছে, কোলের খুকিকে সন্ধ্যের ঝোঁকে পথে নামিয়ে দিয়ে অল্পবয়সী মা পালিয়ে যাচ্ছে। দেশগাঁয়ের মেটে রাস্তায় মানুষের মাংসখোর সেয়ানা শেয়ালের পাল, পথ হারানো সেই খুকির পাশ দিয়ে অল্প দূরে দূরে হেঁটে চলেছে। শুধু সন্ধ্যের অপেক্ষা। হাটুরে লোকজন ঢিল ছুঁড়লেও সরে না।

এসব দেখা শোনার পর শরীরে কারও কি আর রাগ থাকে। এই মেয়েমানুষটাকে সেকথা বোঝাবে কে!

এই যে নদী, খাল, বিল—এ তল্লাটের জলকর—সবই গত বিশ বছর কেবলি শুকিয়ে আসছে—এসব দেখার পর কারও কি আর রাগ থাকে।

প্রমীলার বুকের ওপর একখানা হাত ফেলে দিল হাজরা। বউ কোন বাধা দিল না। সাহায্যও করল না। শুধু বলল, 'চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই—'

হাজরার বুকের ভেতরটা খচ করে উঠল, 'এতকালের ভিটে ছেড়ে কোথায় যাব। বাইরে আমাদের কে চেনে—'

'এখানে তো চিনে উদ্ধার করে দিচ্ছে—'

'তা হোক। তবু তো আমি খগেন গুণীনের বেটা। বাপের নামে

এখনো আমাদের প্রতাপনগর, বেগমপুর অব্দি লোকে চেনে—'

'তাও যদি তুমি ওষুধ দিতে জানতে!'

'ভুলে গেছি সব। বাবা একটা শেকড় চিনিয়েছিল। কেউ যদি কুকুর, ছাগল—ঘরে পোষানি জন্তু-জানোয়ার বাণ মেরে বোবা করে দিত—মুখুজ্যি করে ফেলত—ওই শেকড় খেলে আবার বাক্ ফুটতো—।'

নতুন বিয়ে করে এসে গোড়ায় গোড়ায় প্রমীলাও এসব দেখেছে।

হাজরা আর কিছু বলল না। আসলে এই এতকালের এই জানাশুনো ঘরদোরে রোজ সন্ধ্যো-রাতে ফিরেও হাজরার বিশেষ ফুর্তি হয় না। এখানে ঘুমোবার সময় মাথার ওপর হেলে পড়া একটা খড়ের চাল আছে ঠিক—কিন্তু ওই অব্দি—তার চেয়ে বিশেষ কিছু বেশি নয়।

'আমাদের এখানে কেউ নেই। মরে গেলেও কেউ দেখতে আসবে না। তোমার জ্ঞানো খুড়ো একটা টাকা ধার দিলে দিন ঘুরোলে দশ পয়সা সুদ চায়। তার চেয়ে চল আমরা চলে যাই। সীতাকুণ্ডু যাই—'

'তোমার বাপের বাড়ির দেশে? না, সেখানে যাবো না। তোমার ভাই থাকে সেখানে।'

'তুমি সেখানে মাছ ধরবে কোম্পানির খালে—অনেক মাছ আছে। তোমার সম্বন্ধীর সঙ্গে না হয় না মিশলে।'

'কাছাকাছি থাকলেও চোর হয়ে যাব।'

প্রমীলা চুপ করে গেল। তার বড় ভাই সীতাকুণ্ডুর সবচেয়ে বড় চোর। তবে সিঁদেল নয়। নারকেল, সুপুরি, পুকুরের মাছ, চিংড়ি, শুকোতে দেওয়া কাপড়, হাঁস মুরগী, চরে বেড়ানো পাঁঠাছাগল—সবকিছু নিমেষে উধাও করে দেয়। কিন্তু বললে কি হবে—ওই করে তো দিব্যি সংসার চালিয়ে দিচ্ছে। একবার অবিশ্যি ঘোষেদের পুকুরে জাল সুদ্ধ ধরা পড়ে মারের চোটে মরে যাচ্ছিল। তবু তাকে বোঝে প্রমীলা। কিন্তু এই মানুষটা কেমন ধারা। কাজ জুটলে কাজে যায়। না জুটলে চুপ করে কোম্পানির বাঁধে বসে কেষ্টবাবুর আবাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সারাটা বেলা কাবার করে ফেলে। এসব মানুষ নিয়ে সংসার হয়! মুখে বলল, 'কত গুমোর!'

হাজরা কোন জবাব দিল না। অন্ধকারেই জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসল। তখন বেশি রাতের জ্যোৎস্না একটু একটু করে নিভে আসছিল। এই সময়টায় কোম্পানি বাঁধে দাঁড়ালে চোখের সামনে সারাটা

কেষ্টবাবুর আবাদ আস্তে আস্তে মুছে যায়। দুনিয়ার সব মেয়েছেলে এই এক ধারা। মাথার ওপর তার বাপ আজ বেঁচে নেই। মাও নেই। বেঁচে থাকতে মা কম জ্বালিয়েছে খগেনকে! তবু যেন সেসব সময় ভাল ছিল।

বউকে নেড়ে চেড়ে নিজের দিকে কাৎ করতেই সেই গন্ধটা আবার পেল হাজরা। কে যেন গরম ভাত হাঁড়ি থেকে কলাপাতায় ঢেলে দিয়েছে। গরম ধোঁয়া উড়িয়ে সেই গন্ধটা চারদিকে চারিয়ে যাচ্ছে। বিয়ে করলে একজন মানুষের আরেকজন মানুষের ওপর কেমন দখল হয়!

ঠিক তখনি হাজরার বুকের কাছাকাছি মুখ নিয়ে প্রমীলা বলল, 'তবে আমায় হাটবারে হাটবারে ঘর ভাড়া করে রেখে আসবে বল।'

'কোথায়—'

'কেন? ঘুটিয়ারিতে নেমে হিড়গড়ির বাজারে। তুমিই তো বলেছিলে, ব্যাপারীরা সেদিন জোর পয়সা খরচা করে। একটা তো রাত মোটে। পরদিন ভোর ভোর ফিরে আসব।'

হাজরার শরীরে বাসি তাড়ির ঝিমুনিটা খোঁচা খেয়ে জেগে গেল, খুব আস্তে বলল, 'কোন্ মুখে ফিরবি?'

'খুব পারব। তোমরা দুটি পেট ভরে খাবে। ছেলেমেয়ে দুটোও আশ মিটিয়ে যা ইচ্ছে খাবে—'

'মুখে রুচবে?'

'হাতে পয়সা পড়লে সব সয়ে যাবে দেখো। তখন ওই বড় হাঁড়িটায় ভাত চাপাবো দো বেলা। ওথলানো ফেনে সরা ভেসে উঠবে। বেশি যা হবে পান্তা করে রেখে দেব।' তারপর আচমকা প্রায় ভাসানের বাজনায় জলে-ডোবা গম্ভীর সুর এসে গেল প্রমীলার গলায়, 'এভাবে আর হয় না।'

বিয়ের বাসন বলতে ওই একটা হাঁড়ি পেয়েছিল হাজরা। মোটা চাদরের। কাঁসা কি পেতল জানে না। নিশুতি রাতে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া দিল। ঘরের বাইরে বড় বড় ব্যাঙ বৃষ্টির আশায় গর্ত থেকে বেড়িয়ে পড়েছে। ওদের গলায় খুব ফুর্তি। লতাপাতার মাঝখান দিয়ে থপথপ করে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। অথচ বৃষ্টির দেখা নেই।

বুকের মধ্যে বউকে এনে ফেলে সরে শুতেও পারছিল না। এই কথার পর আবার কাছে টেনেও নেওয়া যায় না। অন্তত হাজরা পারছিল না। তার অস্বস্তি কাটিয়ে দেবার জন্যেই যেন প্রমীলা নিজে উঠে বসল।

'কোথায় ?'

'ঘুম আসছে না—' বলে প্রমীলা বাইরে উঠোনের ধারে গিয়ে শুকনো ছেচতলায় পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসল। চাঁদ নেই। তবে ফিকে আলোয় কেষ্টবাবুর আবাদ অস্পষ্ট পড়ে আছে। খানিক দূর অবধি দেখাও যায়।

হাজরাও বাইরে উঠে এল।

'এই হাটবারেই আমার ঘর ভাড়া করে দাও। কালই তো হাট—' তল্লাটের মুড়ি, চিড়ে, খই, গুড়ে বাজারের বটতলা ভরে যায়। কলকাতা থেকে মলম, মেয়েছেলে, বাঁশী আসে।

তেলাকুচো লতায় তখন গুচ্ছের জোনাকি। হাজরা উঠোনে নেমে গিয়ে সারা গাছটার গা থেকে কাচিয়ে কাচিয়ে আঁজলা ভরে সেই আলো হাতে নিল। তারপর জোনাকিতে জোড়া হাতের একটা খুচরো ধাক্কায় এলো খোঁপাটা ভেঙে দিয়েই আঁজলা ভরতি জোনাকিগুলো একেবারে জলের ধারায় সেই ভাঙা খোঁপায় ঢেলে দিল। দিয়েই অনেককালের হাজরা নস্কর এই এখনকার হাজরার ভেতর থেকে এক ঝটকায় উঠোনে লাফিয়ে পড়েই হাততালি দিয়ে উঠল। এই সময়টায় বউটাকে বড় ভাল দেখাচ্ছে। কোনো লাজলজ্জার পরোয়া করার দরকার নেই হাজরার এখন। সারা দেশটা ঘুমোচ্ছে : মেয়েমানুষটার মাথায়, চুলে আগুন ধরে যাচ্ছে।

প্রমীলাও সপাং করে উঠোনে সিধে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর নিশুতি রাত ফুটো করে দিয়ে চেঁচাতে লাগল। মাথার চুলের ভেতর দু'হাতের দশটা আঙুল চিরুণি করে চালাচ্ছিল। সঙ্গে চেঁচাচ্ছিল। 'খাওয়ানোর মুরোদ নেই—আবার গুচ্ছের পোকা গুঁজে দিয়ে জ্বালানো—'

হাজরার হাতের তালি থেমে গেল। ঠিক সেই সময়েই মেঘ সরিয়ে দিয়ে আলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এমন বোকা সে শীগগিরি হয়নি। প্রমীলা তখনো উঠোনময় লাফাচ্ছিল। আর চেঁচাচ্ছিল।

বাদার মধ্যে কেউ যদি একটেরে কুঁড়ে বাধে—পাড়াপড়শী না থাকলে—আগুন লাগলে, এমনি একঠায় বসে বসে নিজের ঘরপোড়া দেখতে হয়। কাছে পিঠের ডোবার জলেও কুলোয় না। মিঠে কথা দিয়ে বউটাকে শান্ত করার ইচ্ছেও ছিল না হাজরার মনে তখন।

লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এক সময় থামল প্রমীলা। বেআক্কেলে জ্যোৎস্না সেই সময় ফক্ ফক্ করে দেখা দিল। কচুগাছের গোড়ায় দুটি ব্যাঙ। দূরে গাছ

পানার আড়ালে কার্তিকের বৌভাতের এঁটোপাতা নিয়ে কুকুরদের ঘেউ-ঘেউ।

'নে সেজে নে এইবেলা—'

'এখন? কোথায়!'

'হিড়গড়ির হাটে যাবিনে—'

প্রমীলা একেবারে গা ঘেষে দাঁড়াল হাজরার।

'বাদা দিয়ে খরো খরো চলে যাব।'

'বড়ো খুকি কিন্তু আমায় না দেখে কাঁদবে—'

'সে আমি সামলাবো। ভোর ভোর ফিরে এসে ঘরে বসে থাকব—'

অন্য বছর এই সময় বাদায় এক হাঁটু জল থাকে। এখন প্রায় শুকনো। পৃথিবী তার নিজের সুখে মাঠঘাট ছড়িয়ে রেখে ঠাণ্ডা খাচ্ছিল। চাঁদ তার পছন্দমত জায়গা থেকে জ্যোৎস্না ঢালছিল। হাজরার পেছন পেছন প্রমীলা। সামনেই নবীনবাবুদের আবাদ। দু'ধারে গুটকো গুটকো ধান চারা। চরাচর জুড়ে ধামা-ওলটানো কুয়াশায় ওরা মুছে গেল।

ধানকেউটে

বেস্পতি ঘর ঝাঁট দেওয়ার আগে ঝাঁটার ঢিলে কাঠিগুলো গুছিয়ে বেঁধে নিচ্ছিল। এমন সময় অমৃতলাল পাম্পসুতে মসমস আওয়াজ তুলে ঘরে ঢুকলো। মাইনে সতেরো টাকা, একবেলা গরম আর ভোরে পান্তা পেয়ে এখানী সে ভরে উঠছে। পা থেকে পাম্পসু ছাড়িয়ে নিয়ে বুরুশ বুলোতে শুরু করেছিল বেস্পতি। অমৃতলাল তাকে এমনভাবে টেনে নিল, যাকে আগের দিনে লেখা হত—প্রবলভাবে আকর্ষণ করিল।

বাবুর হাতের মধ্যে থাকতেই বেস্পতি বলল, 'তোমার ওই সবসময় এক কাণ্ড! ভাল লাগে?'

তা অমৃতলালের লাগে। বেস্পতি দাঁত বের করে বলল, 'আমার মান খেয়ে তোমার লাভ কি বাবু?' কথাগুলো বেস্পতির ভাবের কথা। অতএব তাকে এখন সোহাগ কর। সে ভাষা অমৃতলাল ভাল করেই জানে। আচ্ছা করে ধরে বলল, 'তুই যে আমার সব নষ্ট করে দিলি। সে বেলা?'

বেস্পতি হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল, 'দিদি আসছে—'

পাম্পসু গলিয়ে অমৃতলালও উঠে দাঁড়ালো।

'দেখেছো কত বড় বড় ওলকপি হয়েছে—'

রেবা তার বিয়ে করা বউ। আজকাল রেবতী বলে ডাকতে ইচ্ছে করে অমৃতলালের। ভালবাসার দিনে আদর করে নানান নামে ডেকেছে। এখন লেপের মধ্যে বুড়োটে ঢঙে বলে, 'ওগো।'

'বাঃ। বেশ বড় বড় তো!' আর কত অবাক হওয়া যায়। সাড়ে তিন টাকা রোজ দিয়ে দু'দুটো লোক হপ্তা তিনেক ওই মাটি বানিয়েছে। তাতে অনেক আদর যত্নের পর কিছু পালং, বিট-গাজরের সঙ্গে ডজন দুই ওল কপি ফলেছে।

বাইরে অঘ্রাণের রোদ। সতের বিঘের বড় দাগটায় অন্তদের সঙ্গে বেস্পতির স্বামী সনাতনকেও খানিক আগে ধান কাটতে লাগিয়েছে অমৃতলাল। দু'জন কাটছে, বাকীরা আঁটি বেঁধে বেঁধে এগোচ্ছে। দুটো রোদ খেলেই ধান ঠ্যাঙানো শুরু হবে।

বৌকে বলল, 'গরম গরম লুচির সঙ্গে ওলকপির তরকারি দিও। মেয়েরা তারিয়ে তারিয়ে খাবে।'

রেবা ততক্ষণে কুটতে বসে গেছে। পিঠোপিঠি সেভেন এইটে পড়ে দুই মেয়ে। এখন তাদের ভীষণ খিদে। গুড়, সেদ্ধ ডাল যা পায় খেয়ে ফেলে।

চায়ের বাসন মেজে এনে বেস্পতি ঠক করে রান্নাঘরে রাখল, 'আমি কুটে দিচ্ছি, তুমি বরং নক্সা চিরে দাও।'

এই দুটি মেয়েলোককে এক রান্নাঘরে বসে মিলে মিশে কাজ করতে দেখে অমৃতলালের খুব অস্বস্তি লাগল। এদেরই একজন অমৃতলালের দু'দিক জানে। সেখান থেকে সরে গিয়ে অমৃতলাল পুকুর পাড়ে বাবু হয়ে দাঁড়াল।

সব মিলিয়ে জনা দশেক ধান কাটছে। ডাঙা জমির ওপর সবজির চাষ। সরষের হলুদ ফুল, বাঁধাকপির সবুজ পাতাগুলোর ঘোমটার ভেতরে রোদ পড়ে রীতিমত ছবি হয়ে আছে চারদিক। আগামী চোতমাসে অমৃতলাল ছত্রিশে পা দেবে। পায়ের কাছেই ধান সেদ্ধ করার চুলো তৈরী হচ্ছে। জায়গাটা বস্তির চেহারা নিচ্ছে আস্তে আস্তে। আগে এদিকে লোক আসত না। এখন ছুটির দিন লোকজন বেড়াতে বেড়াতে এদিকটা দেখে যায়। নাম ছিল নিরিমিখি ডাঙা। অনেক আগে নদী ছিল এখানে। ভাঁটায় যেখানে জল আটকানোর খাড়ি ছিল, সেখানে এখন বুড়ো বুড়ো গাবগামার জঙ্গল। জঙ্গল হাসিলের চোটে সুন্দরবন এখন সরতে সরতে তিন নদীর পথ। পড়ে আছে শুধু লাট আমলের ওই পুরনো গাছগুলো। কিছুকাল আগেও এদিককার বৌ ঝি জামাই ওইসব গাছের ডালে গলায় দড়ি দিত।

পায়ে চকচকে পাম্পসু। ধুতির কালো কুচকুচে পাড় পুরুষ্টু পায়ের পাতার উপর লুটিয়ে আছে। পাটভাঙ্গা পাঞ্জাবীর হাতার বাইরে কব্জিতে সোনার ঘড়ি ঝকঝক করে জ্বলছে। অমৃতলালের ছায়া পড়েছে পুকুরের

জলে। দেনা নেই, সুস্থ শরীর, বছরের ধান মাঠে—বয়স এখন অফুরন্ত মনে হল অমৃতলালের। কলকাতা যাওয়ার পথে ইলেকট্রিক ট্রেন এমন ভোঁ দিচ্ছে, মনে হবে, শঙ্খ বাজছে।

যোগাযোগ, ডান হাতের ঊর্ধ্ব রেখা, প্রবল যশোস্থান—সব মিলে অমৃতলালকে এখানে ঠেলে তুলেছে। একটা চাকরি আছে। দুপুর বেলায় যেতে হয়।

অথচ বেস্পতি ঘটিত অভ্যেস সে ছাড়তে পারছে না। রেবা বৌ বলেই নয়—এমনিতেই তাকে খুব ভালবাসে অমৃতলাল। এদানী কাছাকাছি হলে বুঝতে পারে রেবা আগের চেয়ে কিছু ঢিলেঢালা হয়ে গেছে। নয়ত মনে প্রাণে সে ষোল আনা অমৃতলালের। পুকুরে মাছ বাড়ে, মেয়াদিতে খাটানো ব্যাঙ্কের টাকা অঙ্কে বাড়ে—রেবার বয়স অমৃতলালের আপত্তিতে থেমে থাকার কথা নয়।

এইসব চিন্তায় পরিশ্রম হচ্ছিল। রেবা লুচি-ভর্তি থালা বেস্পতির হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিল। খাচ্ছিল, এমন সময় মেয়েলোক দুজন তার কাছে হাজির হল। কথাটা পাড়ল রেবা। খাওয়ার সময় স্বামীদের কাছে দরকারী কথা পাড়তে হয়। বেস্পতি বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বাঁধানো চাতালের একচুলও ঘষটে তুলতে পারল না।

'ওরা ধান সেদ্ধ করবে। বেস্পতির একটা গরম ব্লাউজ কিনে দাও।'

'সেই কথাটা দিদি। বাবুর তো গরু নেই। খড়টা আমরা কিনে নেব। দাম যা মাইনে থেকে কেটে নেবে।'

'তুই থাম। টাকার গরম দেখাস নি। খড়টা ওদের তুমি দিয়ে দাও। ঘর ছাইবে।' বিশ বাইশ কাহন খড় হবে। বর্ষার দিনে কাহন পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ টাকায় বিকোয়। রেবা তরকারী আনতে গেল। লুচি রয়ে গেছে থালায়।

বেস্পতি চাতালে বুড়ো আঙুল ডলতে ডলতেই বলল, 'আমায় রাখো না।'

'আছোই তো।'

'সেমন নয়।' এইখানে বেস্পতি তার নিজের কায়দায় চলানি করে হাসল। অমৃতলালের খুব ভাল লাগল না। বেস্পতি ভেঙে বলল, 'আমায় রাখিতো রাখো। বঙ্কু বাবুর যেমন বাপির মা—'

'বঙ্কুবাবু বাপির মাকে রেখেছে ?'

'জানো না ? ন্যাকা ! বাজার সুদ্ধ লোক জানে—'

অমৃতলাল জানত না। বঙ্কুর বাড়িতে সোনার মুকুট পরানো নারায়ণ আছে। মাইনে করা ঠাকুর পুজো করে দুবেলা। ওই ফ্যাকাশে মাগীটা শেষকালে মনে ধরল বঙ্কুর ?

'নাও। আমার হাতে পোঁতা ওলকপি। কত হেনস্তাই করেছিলে—'

বৌয়ের কাছে থালা বাড়িয়ে দিয়ে অমৃতলালের শিস দিতে ইচ্ছে হল। এমন মেয়েকেই কল্যাণী বলে। মুখ লুচিতে ভর্তি বলে কিছুই করতে পারল না। কৃতজ্ঞতায় তার চোয়াল লুচি নাড়তে নাড়তে মুখের ভিতর জুড়ে আসার জোগাড়।

বেস্পতিকে পান সাজতে পাঠিয়ে দিল রেবা। অমৃতলাল জলযোগ করেই সিগারেট সহযোগে পান চিবোয়।

'সাত আটটা ছেলেমেয়ে। তুমি গাক্ গাক্ করে ওঠো বলে ছোটটাকে বড় মেয়ে বেদানার কাছে রেখে আসে। শুধু শটি জ্বাল দিয়ে খাওয়াবে, তাও সব সময় হয় না।'

অমৃতলাল মনে মনে রেবাকে বলল, নিজেই নিজেকে বাঁশ দিচ্ছ তো আমি কি করব। মুখে বলল, 'কেন সনাতন, বড় ছেলেদুটোর আয়ের তো কামাই নেই।' কাজের ব্যবস্থা অমৃতলালই করেছে। পুকুর পাড়ে গাছ বসানো নয়ত ডাঙা জমিতে জল দেওয়া—কোন না কোন রকমে বাবা আর দুই ব্যাটার কাজ সব সময় এখানে হয়ে যাচ্ছে আজ বছর খানেক।

'খাবার লোকেরও তো কামাই নেই। আবার একটা পেটে এয়েছে—'

'সনাতন করিতকর্মা লোক বলতে হবে।'

'কাজের কথা বলছি শোন। খড়টা তুমি এমনি দিয়ে দাও। আমাদের তো দরকার নেই।' অমৃতলাল খানিক শুনতে পেল। অন্যকথায় সে মনে মনে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল। বাপির মাকে বঙ্কু রেখেছে। ব্যাটা এঁটো পুঁই ডাঁটার ছিবড়ে চুষছে ভেবে অমৃতলাল একটু পুলকিতও হয়েছিল। অথচ বেস্পতি যে হোটেলবাড়ির ডালের গামলা হয়ে বসে আছে।

পান হাতে বেস্পতি আসতেই অমৃতলাল বৌয়ের কাছে গৃহপালিত জীব বনে গেল, 'দেখে দাও তো। বেস্পতির পানে বড় মুখ পোড়ে।'

'তা পুড়বেনি !' বলে বেস্পতি পানটা খুলে মেলে ধরল। রেবা

নিজের হাতে নিয়ে ডলে ডলে চুন সরালো খানিক, তারপর সেজে এগিয়ে দিয়ে বেস্পতিকে বলল, 'গাড়ি ঠিক করে খড়টা নিয়ে যাস। সনাতনকে বলিস গাড়ির ব্যবস্থা করতে।'

অমৃতলাল মনে মনে ভেবে নিল ক'গাড়ি হবে। ছয় না সাত। গাজি-পাড়ায় খবর দিতে হবে। তারও গরুর গাড়ির দরকার। আঢ্যির আবাদ থেকে ধান আসবে। সনাতনকে ডাকল। প্রথমে 'আজ্ঞে—এ' বলে একটা হাঁক পেড়ে আন্দাজে বাবুর দিকেই ছুটে এল। লোকটা কিছু খোঁড়া—তার উপর কানেও খাটো। সতের বছর বিয়ে হয়েছে। দশের কাছাকাছি ছেলেমেয়ে। নিজের হাতে লাগানো খেজুর গাছ আছে পনেরটি। নিজেই গাছ কাটে—তাড়ি করে খায়।

'বাবু ডেকেছেন।' বৌয়ের সামনে কাছাটা আলগা দিয়ে হাঁটুর নিচে ধুতি নামিয়ে বাঁদর হয়ে দাঁড়ালো। অমৃতলাল তাকে আদর করে ডাকে 'বেল্লিক।' আজ আর তা ডাকতে পারল না। না জানি কাল রাত্তিরেই হয়ত উল্লুকটার সঙ্গে পরামর্শ করে বেস্পতি আজ রাখিতো হতে চেয়েছে অমৃতলালের কাছে। কোমরে গোঁজা বিড়ির কৌটোটা ধুতির ভেতর থেকে ট্যাম হয়ে ফুলে আছে।

'কাছারি বাজারে তাঁবু পড়েছে। ডাক্তারবাবুরা চিকিৎসে করছে। যাওগে দেখিয়ে আস। টাকাও পাবে।'

অমৃতলালের কথাগুলো না বোঝার নয়। সরকার থেকে ঢোল দিয়ে লোক ডাকছে। অপারেশন করলে শুয়ে থাকতে হয় ক'দিন। বসে পড়তে হয় বলে টাকা দেয়। অপারেশন করাতে যে নিয়ে যাবে, সেও পাবে তিন টাকা। সেই লোকগুলো তখন গাঁয়ে গাঁয়ে আড়কাঠি হয়ে ঘুরছে। তাদের দেখেই লোক পালায়। অথচ মাঠে ঘাটে লোক গিজগিজ করছে। এর একটা ফয়সালা না হলে দেশের অভাব যাবে না। সব বুঝিয়ে বলল অমৃতলাল। তার লেকচারের মাঝে রেবা কেটে পড়েছে। বেস্পতি ঘাটে নেমে রাতের বাসন ঘষছে। ঘোমটার ফাঁকে বাবুকে দেখিয়ে একটু হাসল। অমৃতলাল ওর বসার ভঙ্গী দেখে চোখ ফেরাতে পারল না। সেদিকে তাকিয়েই সনাতনকে বলল, 'এ মাঠের ভাগের ধান তো তোমাদেরই হত। তিন মাসের খোরাকি নিয়ে চিন্তা থাকত না।'

'কপাল বাবু।'

'কপাল না অভ্যেস—'

এবার উত্তোর কাটল স্বয়ং বেস্পতি। বাসনের ডাঁই ঠক করে চাতালে নামিয়ে দিয়ে প্রায় ঝগড়ার কায়দায় অমৃতলালের মুখোমুখি দাঁড়াল। বাবুটির কেরামতি তার অজানা নেই। ধরতে ধরতে পিছলে পড়ে।

'হাল নেই, গরু নেই—খানিক জায়গা-জমি ছিল তাও পায়ের চিকিচ্ছেয় গেল। পা যে সারেনি দেখতেই পাচ্ছ।'

এই নেই নেই শুনতে আর ভাল লাগে না অমৃতলালের। আজকাল মাঝরাতে বিছানায় উঠে বসে ভাবতে বসে—এগারো বছর আগে আমি জানতাম না, মাসের শেষে বাড়ি ভাড়ার কথা ভাবতে হবে না। তখন ট্রাম-বাস ভাড়াই সব সময় থাকত না।

'পা সারেনি সনাতন?'

'কোথায় আর সারল বাবু। পো তিনেক দুধ দিত শেষ গরুটা—পাঁচ বিয়েনের গাভিন গরু—তাও বেচে দিলাম চাষের গোড়ায় গোড়ায়।'

এবার বেস্পতি ফুসিয়ে উঠল, 'ভাসপো ছিল চোর। তোরঙ্গ ভেঙে নাকছাবি, দুল হাতানোর সময় বাক্সে কাগজ ভেবে আমাদের ভদ্রাসনের কোবালাটুকুও গায়েব করেছিল।' এখানে থেমে বেস্পতি আবার শুরু করল, 'নয়ত আমরা কি আর সাধে ঝি-গিরি করে খাই—,' সিঁথির পাশ দিয়ে গরুর দড়ির চাইতেও মোটা একগোছ চুল বেস্পতির গালে ভেঙে পড়েছে—নাকের পাটা লম্বা লম্বা নিঃশ্বাসে উঠছে পড়ছে। এই মেয়েলোকটি তার রাখিতো হয়ে থাকতে চাইছে।

'তোমার দিদির কথায় আমি তো ছ'বিঘের দাগটা পুরোপুরি সনাতনকেই চষতে বলেছিলাম। তোমরাই পিছিয়ে গেলে—'

ধান কাটতে কাটতে বেস্পতির বড় ভাসুর তার তাগড়াই ছেলেদের সঙ্গে এগোচ্ছে। কিছু নেই বলে সনাতন তার দাদাকে ডেকেছিল। বলেছিল, 'বাবু, আমার দাদার হাল গরু সবই আছে। ট্যাঁকে জোরও আছে। আমি মেহনত দেব—ভাগের ধানের ভাগীদার হব।'

'তোমাদের মধ্যেই খিটিমিটি লেগে গেল!'

'তা বাবু, ধান ওঠা লাগাত বিনি পয়সায় খেটে খাবার মুরোদ কোথায় পাব? আমার যে রোজ দেড় পালি চাল চাই। কেনার পয়সা কোথায়?' কথাগুলো সত্যি। অমৃতলালের এই ভদ্রাসন তৈরীর সময় গত সনের চোত-

বোশেখে সনাতন এখানে চৌকিদারি করেছে। তখন বেওয়ারিশ গাছের খেজুর খেত বেল্লিকটা। পেট ভরানোর জন্যে এত খেয়েছে, চৌদিক বিচি ছড়ানোর চোটে বর্ষার পর খেজুর চারা গুলন দিয়ে মাথা তুলেছে গুচ্ছের। ধান রোয়ার সময় সনাতন বেঁকে দাড়াল। ট্যাঁক ফাঁকা বলে তারই খাটুনি বেশী। কিন্তু রোজকার পেট চলবে কোত্থেকে।

তাই আর্জি এনেছিল অমৃতলালের কাছে। আর্জি শুনে রেবারও মন খারাপ হয়ে গেল। বেস্পতি তখন চুপ করে ছিল। বাবুকে বড় ভয় সনাতনের। অমৃতলালের সামনেই বলেছে, একটু ময়াটে চটা আছেন আপনি। কথা নেই বার্তা নেই ধক করে জ্বলে ওঠেন। গুছিয়ে বলতে পারবে না বলে গাঁয়ের একটা ছেলেকে দিয়ে লিখিয়ে এনেছিল।

আর্জির কাগজখানা তার ডায়রিতে রেলের মান্থলির পাশে গোঁজা আছে। প্রায়ই কাগজখানা অমৃতলালের হাতে পড়ে। ওপরেই লেখা আছে—

মজুরী—খাওয়া খরচ নাই

৭ টা × ৫·০০ = ৩৫·০০

৮ টা × ২·০০ = ১৬·০০

বীজের জন্য = ৫·০০

৫৬·০০

চাষের সময় এদিকে মজুরী ছাড়াও একবেলা পান্তা একবেলা গরম দেওয়া হয়। সনাতন ঘরের খেয়ে খেটে গেছে। ছেলেরা আটদিন ভাত বয়ে এনেছে—তাই আট দুগুনে ষোল টাকা। ভাগীদার হয়ে ধান পাবে ভেবে বড় আশায় আশায় বাড়িতে বীজতলা করেছিল। এবার আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এসেছে। পুরুষ্টু বীজতলার বিয়েন ভেঙে কচি ধানচারা এনে অমৃতলালের চাষে নেমেছিল। সেই বাবদে পাঁচটি টাকা তার দাবি। এসবই দাবি তার বড় ভাইয়ের কাছে—যাকে সনাতন বাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে এখন নিজেই আঁটি হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

আর্জির লক্ষ্য সনাতনের বড় ভাই বিনোদ—পেশ করা হয় বাবু অমৃতলালের দরবারে।

চাষে নামিয়া দেখছি আমি তোমাদের সঙ্গে চাষ করিবার খরচ করিতে

পারছি না। সেইজন্য দেখছি, হয়তো এই চাষে খরচ তোমরা করিবে—পরে আমাকে দিতে হইবে। কিন্তু সেই খরচ করিতে না পারায় এখন আমি চাষ একেবারে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হচ্ছি। অতএব প্রথম হইতে আমার মজুর খরচ ও অন্যান্য খরচ সমস্ত যাহা হইয়াছে দয়া করিয়া আমাকে এই ভাদ্র মাসের মধ্যে দিয়া দিবে। যদি না দাও তাহলে আজ পর্যন্ত যতটুকু জমি রোপণ করা হইয়াছে তাহার ভাগীদার আমি হইব, এবং তাহা দয়া করিয়া দিয়া দিবে।

আর এইটুকু জানাচ্ছি, যে আমার ছেলেরা যতটুকু কষ্ট করে ভাত বহন করিয়াছে সেই দুঃখে তাহাদের মজুরী খরচ দুই টাকা করিয়া ফেলিয়াছি। প্রথমে যাহা আশা দিয়া আমাকে চাষে নামানো হইয়াছে এখন সেই আশা ব্যর্থ হওয়ায় আমি চাষ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

আর্জির শেষটুকু অমৃতলালের জন্য—আর বাবু, আপনি দয়া করে এই চিঠি রাখিয়া দিবেন, যদি না টাকা পাওয়া যায় তাহলে আপনি দয়া করে এই চাষের জন্য টাকা আদায় করিয়া দিবেন এই আমার ক্ষুদ্র প্রার্থনা।

—ইতি

শ্রীসনাতন সরদার

সাং—রামনগর

অমৃতলালের দয়ার শরীর। বেল্লিক ডেকে ধাই করে সনাতনের পেছনে সটান একটি লাথি কষাতে পারত। কিন্তু বেস্পতি নজরে ধরবার পর থেকে তারই সামনে তার স্বামীকে বেল্লিক ডাকে কি বলে—কি বলেই বা লাথি কষায়।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন? লেগে যাও। রোদ থাকতে থাকতে ধানের গাদা দিতে হবে।'

'একটা আর্জি ছিল বাবু।'

'আবার আর্জি? বলে ফেল—'

'ইঁদুরের গর্তের ধানটুকু নেব? ও তো আপনার পড়েই থাকে।'

সনাতনের সঙ্গে বেস্পতি যোগ দিল, 'কার্তিক মাসে ইঁদুরগুলো ধান চুরি করে নে গে এসব গর্ত করে লুকিয়ে রাখে।'

সনাতন বলল, 'এই বাবু অ্যাত বড় বড় কেউটে, গোখরো সব ইঁদুরের নোতে নোতে গর্তে গিয়ে তালাশ করে—'

অমৃতলালের ঘাড়ে চর্বির একটা ডেলা পাকিয়ে উঠেছে এদানী। ব্যাপারটায় একটা খেলা আছে বুঝতে পেরে সে তারিয়ে তারিয়ে শুনছিল। সাপের কথায় লাফিয়ে উঠে সনাতনকে বলল, 'বন্দুকটা নিয়ে আয়—'

ঠা ঠা করে হেসে পড়ল সনাতন, 'আঁকা বাঁকা গর্তে বাবু গুলি সেধোবে না। দেশের কেউটেগুলো বড় সেয়ানা। চুপ করে পড়ে থাকবে দিনমানে। ওই করেই তো ইঁদুর ধরে—'

'তাই বলে তুমি আবার হাত দিয়ে ধান কুড়োতে যেয়ো না।'

সনাতনের জন্যে বেস্পতির এমন ভাবনা দেখে অমৃতলালের ভালই লাগল। একটা গেঁয়ো মেয়েলোক শেষে তার জন্যে হাপুস নয়নে কাঁদুক তা অমৃতলাল চায় না। সে চায় তার মেয়েদুটো যেমন স্কুলে পিঠোপিঠি পড়ছে তেমনি পড়ুক। রেবতী ওল কপি দিয়ে তরকারি করে লুচি দিক। আর মাঝে মধ্যে বেস্পতি গদ গদ হয়ে ধরা দিক—তবে একটু আধটু পাখা ঝাপটাবে, নয়ত স্রেফ কাপড়ের পুটুলি কার ভালো লাগে? সনাতনে বেস্পতির মন থাকলে সব করেও সব দিক মানিয়ে যায়।

খবরের কাগজে আইন-আদালতের ভাষায় যাকে বলে কুপ্রস্তাব, অমৃতলাল তাই বেস্পতিকে করতে যাচ্ছিল। বেল্লিকটা দাঁড়ানো। শির-তোলা বেঁকা বেঁকা হাত-পা নিয়ে আস্ত একটা বাঁদর। এমন সময় রেবতীই উদ্ধার করল, 'মেয়েদের আনতে যাচ্ছি। সামনের বারান্দায় বড়ি শুকোতে দিয়েছি। বড় কাগের জ্বালা—তুমি সেখানে বসে কাগজ পড়ো গে।'

কলকাতার এত কাছাকাছি উঠতি গঞ্জ জায়গা—সব সময় লরি যায়, বাস চলে। রোজ তাই মেয়েদের স্কুল থেকে আনতে যায় রেবা। ধনে পাতার সঙ্গে বড়ি দিয়ে মাছের ঝোল অমৃতলালের বড় প্রিয়। রেবা সবসময় তার প্রিয় জিনিসপত্র বানাচ্ছে।

খাবার জল রাখবার স্ট্যাণ্ডে ঠক করে কুঁজো বসিয়ে দিল বেস্পতি। সামনের ঝিল পাম্প হচ্ছে আজ হপ্তাখানেক। এখন কম জলে কাদায় বড় বড় মাছ খাবি খাচ্ছে—ধরবার অপেক্ষা শুধু।

অমৃতলালের বাঁ-হাতখানা ধাঁ করে এক ঝটকায় বেস্পতিকে কাছে টেনে নিয়ে এল। সে কাগজের সম্পাদকীয় পড়ে, ট্রামে পা মাড়ানোর পর সরি বলে থাকে, উপরন্তু দাড়ি কামিয়ে ক্রিমও মাখে। জানাশুনোরা তাকে ভদ্রলোক বলে। পৃথিবীর তাবৎ জিনিস খেতে খেতে আজকাল কোন

জিনিসেই বিশেষ স্বাদ পায় না। শুধু অভ্যেস বশেই রাত্তিরে খেতে বসে। মেয়েমানুষ এখনও মন্দ লাগে না।

'বোসো। কুঁজো ভেঙে যাবেনি?'

'যাগ্ গিয়ে—'

'এ পোড়াকাঠখানা নষ্ট করে রোজ রোজ কী হয় তোমার বাবু—'

ফুটো আধুলি সাইজের গোলালো নথখানা ঝামটা দিয়ে নাকের পাটায় কাৎ হয়ে বসে গেল।

'পরে বলব'খন—' আরেক টান দিল অমৃতলাল। নাইকুণ্ডুলিতে ধুতির গিঁট টোম্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

'নাও, যা ইচ্ছে।'

এই বাবুটির এত 'নাফানাফি' দেখে বেস্পতির বড় অবাক লাগে। কত ফন্দি ফিকির করে দিদিকে সরিয়ে দেয়। না পারলে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায়।

অমৃতলাল বাইরে বেরোবার সময় সনাতকে ডাকল। আঙ্গুল দিয়ে মাঠ দেখিয়ে দিল বেস্পতি। সেখানে সনাতন মোটা মোটা ধানের গোছ হেথায় নামিয়ে দিয়ে আলগোছে মাঠে শুইয়ে দিচ্ছে। আন্তাবড়ি হলেই ডালি কেটে ঝুর ঝুর করে ধান খসে পড়বে।

বারান্দায় বেরিয়ে সনাতনকে আঙ্গুল দিয়ে ডাকল। দু'ফোটা ঘাম লাইন দিয়ে বুকে নেমে এসেছে। রোদ বাড়াতে মুখ শুকিয়ে সারা গায়ের হাড়-গোড় কেমন জেগে গেছে। ধান তোলার পর সারা মাঠের গর্ত খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে।

'গর্ত খুঁজে সব ধান নিতে পারবে?'

'তা বাবু গর্ত বুঝে—' হেসোর ডগা দিয়ে ভ্রুর উপর চুলকে নিল।

অমৃতলাল কোন রকম হেয়ালি না করে পরিষ্কার বলল, 'বেল্লিক তোর বৌর কথা বলছি। আমাদের বেস্পতির।'

'ওর কথা আমি আর কি বলব বাবু। তবে ইঁদুরের গর্তে কোনদিন হাত দেয়নি। যা করার আমিই করি—। তেমন গর্তে দেড় পালি অব্দি ধান পাওয়া যায়।'

'ভাগ এখান থেকে—'

আগাগোড়া মাথাভর্তি শুধু ধানচাল।

রেবার সঙ্গে মেয়েদুটো ফিরছে লাফাতে লাফাতে। তাদের পেছনে ঝাঁপি মাথায় এদিককার হাঘরে সাপুড়ে। একটা দু'থাক ঝাঁপি বিড়ে পাকানো মাথায় দুলছে।

'রাখিতো থাকবে। সনাতন জানে?'

'বোলবোনি। জানাজানির কাজ কি?'

এগোতেই বেস্পতি সরে গেল, 'এত যে মিনিট মিনিট টান বাবু— আমার হাতে ধরে কিছু দিয়েছো?'

'কত কী নিয়ে যাস যে—জামা কাপড়, ভাত, টাকা পয়সা—'

'ও তো খয়রাতি!'

'এই যে ইঁদুরের গর্তে ধান নিবি ঢালা মাঠময়—'

'আমার সোয়ামিরে সাপের মুখে ঠেলে দিচ্ছ না তো বাবু?'

মেয়েদের সঙ্গে মা ঢুকছে বাড়িতে। আজ তাদের খুব আনন্দ। রাঙালুর পান্তুয়া বানাবে রেবতী।

সাপুড়েটি অমৃতলালের চেনা। ধান কাটার পর মাঠে মাঠে ঘোরে। খুব করুণ করে তার দুঃখের কথা বলল। পরপর দু'বছর খরার চোটে গোখরা, চন্দ্রবোড়া দামী সব সাপ একটানা রোদে রগচটা হয়ে এদিককার মাঠঘাট ফেলে দূরে দূরে সরে গেছে। আকাল গেছে দু'বছর। খেলা দেখাতে পারেনি মোটে। কাহাতক জলঢোঁড়া, দাড়াশ নেড়েচেড়ে শহরের খোকাখুকু ভোলায়। ওগুলো খোঁচালেও ফণা তোলে না। সরকারী কলেজেও কিছু বেচতে পারেনি। তাই যদি বাবুর অনুমতি হয়—তবে এই মাঠ ঢুড়ে ভাল যা সাপ আছে নিয়ে যাবে, আর—বাস্তুসাপ থেকে থাকলে ছোঁবেও না, আঘাতও করবে না।

উত্তম প্রস্তাব। গরম পড়লে ওনারা কালান্তক। শুকনো জায়গায় সন্ধ্যের পর হাওয়া খেতে বেরোয়। ভাল বাতাস দিলে চন্দ্রবোড়ার কোমর আরামে ফুলে ওঠে।

'নিয়ে যাও। তবে খেলা দেখাতে হবে কিন্তু।'

'আলবৎ।'

রেবার পাশে বেস্পতি দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, 'সেই ভাল!'

'দুপুর দুপুর আসব বাবু। তত্খোনে আপনার ধানকাটা সারা হয়ে

যাবে।'

দু'পাশে দু'মেয়েকে নিয়ে খেতে বসেছিল অমৃতলাল। শেষ পাতে জ্বাল দেওয়া ঘন দুধের সঙ্গে পাটালি মিশিয়ে দু'চুমুক দিয়েছে সবে—এমন সময় কাইমাই করে সাপুড়ে ছুটে এসে বাইরের বড় রোয়াকে কেঁদে পড়ল। সামনেই সনাতন হেসো হাতে ফোঁস ফোঁস করছে। অমৃতলালকে দেখেই এগিয়ে এল, তারপর হুড়বড় করে যা বলল—তার অর্থঃ শীতকালের ঘুম ভাঙিয়ে সাপগুলোকে জাগাচ্ছিল লোকটা। এখন জাগালে বেরিয়ে পড়বে। তারপর ইঁদুরের হদিশ পায় কার সাধ্য। গর্তের সব ধান ওরাই খাবে। শেষে বলল, 'কার হুকুমে লোকটা মাঠে নেমেছিল? গোড়ায় ভেবেছিলাম বাবু, ধান মুছে নে যাচ্ছে—'

অমৃতলালের বারান্দায় সারাদিনই দরবার হয়। ভালই লাগে আজকাল তার। তাল খেজুর খিরিশ—সব গাছ সারাদিন এমন স্থির হয়ে থাকে। তার মাঝখানে এমন অবাধে বিচার করে, সাজা দেয়—ফাইন লাগে। ধান চুরি করতে লোকটা মাঠে যায়নি। খোলশা করে না বলে দাবড়ি দিয়ে উঠল, 'আমার হুকুমে—'

সনাতন ভেবেছিল, চোর না হোক অপরাধী ধরে এনেছে। কিন্তু এ কাণ্ড হবে ভাবতে পারেনি, 'আপনি বাবু—'

'হ্যাঁ বেল্লিক।'

'তাই বলুন। কিন্তু আমায় যে গর্তের ধান নিতে বললেন—'

সারাদিন ধানের কথা শুনতে শুনতে অমৃতলালের মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে যায়। কলকাতা যাওয়ার ট্রেনে, সরকারী ফতোয়ায়, কাগজে—সর্বত্র। চার-পাঁচবছর আগেও ধান নিয়ে এত মাতামাতি ছিল না। এ তল্লাট নাকি তিরিশ বছর হেজে যাওয়া বিদ্যাধরীর জলে ডুবে ছিল। মানুষ প্রমাণ হোগলার জঙ্গলে ছেলে বৌ মদ্দ সবাই মিলে মাছ ধরত এখানে—পাখি মারতে বাবুরা আসতেন। এখন না হয় আবাদ হয়ে চাষ হচ্ছে বছর দশেক। তাই বলে সবসময়--

'গর্তের ধান নিবি। তাই বলে সাপ পুষে রাখতে হবে?'

'অকালে ঘুম ভাঙালে সাপগুলো এদিকওদিক ছোটাছুটি করে সরে পড়বে বাবু। দশহবার মধ্যে ওনাদের ছানাপোনা হয়েছে। ঠিক এই সময় ঘরছাড়া করবেন?'

অমৃতলাল জীবনে সাপ নিয়ে এমন পারিবারিক আলোচনা করেনি।' খাওয়া দাওয়ার পর ঘর অন্ধকার করে ঘুমোনো অভ্যেস হয়ে গেছে এই কদিনের ছুটিতে থাকতে থাকতে। অফিস খুললেই আবার ছোটাছুটি।

সাপটাপ রেবা দেখতে পারে না। সাপুড়েকে বলল, 'তুমি বাপু ছানাপোনা সুদ্ধ, ওসব নিয়ে যাও।'

বেস্পতিও সায় দিল, 'সেই ভাল দিদি।'

'তুই থাম মাগী।' এর চেয়ে পষ্ট করে বলতে পারল না সনাতন। এবড়ো খেবড়ো জমিতে অঢেল গর্ত। এখানে সেখানে না হোক গর্ত হাতড়ে কম করেও মণ খানেক ধান পাওয়া যাবে। সে ধানে বড় ভাই বিনোদ কিংবা বাবুর কোন ভাগ নেই। অথচ সাপ তাড়ালে গর্তের খোঁজ কিছুতেই পাওয়া যাবে না। সে নিজেই তাড়াবে সাপগুলো। একটা করে গর্ত হাতড়াবে—আর তালি দেবে। দূর থেকে আলের পাশে মোটা লাঠি ঠুকবে আর চেঁচাবে—'বেরিয়ে আয় বাবারা—এই বেলা বেরিয়ে আয়। আমার দিকে একটু দেখিস মা মনসা। সব সুদ্ধ, দশটা পেট।' শীতকাল ভর বেদানা ওর খুদ ভাত পাবে। তা মাগীকে বোঝাবে কে! বাবুর বাড়িতে দুবেলা ভাত গিলে নিজের ঘরে শাকপাতা দিয়ে ভুট্টার খিচুড়ি মুখে রোচে না। এসব কথা জোরে বলতে না পেরে সনাতন গজরাতে লাগল।

ঘুমের সময় পার হয়ে যাচ্ছে দেখে অমৃতলাল তাড়াতাড়ি রফা করে দিল, 'তুই বাবা ওই বড় আলের ওপাশে গর্ত হাতড়ে হাতড়ে ধান নিয়ে যা—', সাপুড়েকে বলল, 'আমাদের বাড়ির গায়ের এই নাবি জমির সব সাপ তোমার—ব্যস আর একটাও কথা না।'

মেয়ে দু'টো সাপুড়ের ঝাঁপি ঘুরে ঘুরে দেখছে। রেবতী লেবুর আচার, বড়ি রোদ ফেরাতে গেল। পান হাতে বেস্পতি খাটের কাছে আসতেই অমৃতলাল সিধে হয়ে বসল। ঘুমোনোর জন্য দরজা জানলা বন্ধ করে ঘরটা অন্ধকার করে দিয়ে গেছে রেবতী। সুতোর ঝালর দেওয়া লাল রঙের উঁচু বালিশ পুরু জাজিমের ওপর একটুখানি আলো পেয়ে টকটক করে উঠেছে। কালো রঙের কুঁজোটা স্ট্যাণ্ডের ওপর বিড়ে পাকিয়েও মাথাটা ঢাকতে পারেনি। পানটা মুখে দিয়ে অভ্যেস বশে খপ করে ধরতেই অন্যদিনের মত বেস্পতি হাত ছাড়িয়ে নিল না। অমৃতলালের সেদ্ধ আলুর চেয়েও নরম

আঙুলের মধ্যে পড়ে বেস্পতির হাতের বড় শিরাটা দপদপ করে রক্ত পালটাচ্ছে। সামনের ভেজানো দরজা ঠেলে আচমকা রেবা যদি এখন ঢোকে দেখবে ঘরের কোণে জাজিমের ওপর নীল লুঙ্গি পড়ে অমৃতলাল বুক, ভুঁড়ি ভাসিয়ে বসে আছে। রেবা আসেনি। তার বদলে অমৃতলাল বেস্পতির বুকে হাত রাখল। চিটে ধানের চেয়েও হালকা—হাওয়া দিলে ফুরফুর করে উড়ে যাবে। পাঁজরের হাড়ে তার আঙুল বসে যাচ্ছে। খানিকটা পানের রস গিলে ফেলল অমৃতলাল। বড় বড় সুপুরি ভেঙে নিয়ে চিবানো পানের সমান করে ফেলল। তার ঘুরে যাওয়া মাথাটা বেস্পতি টেনে নিয়ে বুকের কাছে তুলে ধরল, 'এমন কর কেন বাবু?'

অমৃতলাল সেখান থেকেই মাথা তুলে দেখল বেস্পতির চোখের কোণে লাল জায়গাটা ফুলে উঠে আরও লাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা গা অন্ধকারে লম্বা একটা কালির পোচ ছাড়া বেশি কিছু নয়। বাইরেই সতের বিঘের বড় দাগটা এখন রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছে। ধরা বেস্পতিকে আলগা দিয়ে অমৃতলাল বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর হালকা বেতের চেয়ারটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে রোয়াকে গিয়ে বসল।

মেয়েদুটোর সঙ্গে রেবতী চোখ গোল গোল করে সাপুড়ের কাণ্ড দেখছে। অসময়ে ঘুম ভাঙানো একটা কেউটের লেজ ধরে সাপুড়ে দড়ি টানছে প্রায়। সাপটা কিছুতেই গর্ত থেকে বেরোবে না। সনাতন, বিনোদ, বিনোদের বড় বেটা ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে।

'তিন সনের সাপ বাবু।'

'কি করে বুঝলি বেল্লিক!'

'আমাদের পুকুর ধারে একটা কেউটে আছে বাবু। জন্মাবার পর থেকে দেখছি। সাত সন বয়স হবে। চর্বিতে নড়তে চড়তে পারে না। গর্তের ধারে বসে এটা ওটা খায়। মুখ পালটাবার জন্য খেজুর গাছে উঠেছিল একবার। আমি গর্তের মুখে শীতকাল ভর ভাঁড়ে করে রস রেখে আসি।'

সাপুড়ে সাপটাকে টেনে বের করে হাঁপাতে লাগল। জিরিয়ে নেওয়ার ফুরসৎ হল না। সঙ্গে সঙ্গে থাবা দিয়ে ওর মাথাটা ধরে ফেলল। পকেট থেকে চাকু বের করে কচকচ করে বিষের থলিটা চিরে উলটো করে ধরল

শিশির মুখে। পিত্তকে হার মানায় এমন খানিকটা ঘোলা নীল টুপ করে শিশিতে পড়ল। যেদিকটা মাটিতে ঘষে এগোতে হয়—কেউটের সেই শাদা শাদা জায়গা মোচড় দিয়ে পাকিয়ে উঠল। দেখে গা গুলোয়।

বেস্পতি বলল, 'বড় পাজি সাপ দিদি। নিজিরটা ছাড়া কিছু দেখে না। আমাদের পুকুরধারেরটা সারা দুপুরবেলা গর্তের ধারে বসে কচি কচি ব্যাঙ গেলে। বোকাসোকা সাপ পেলি তিনদিনির মধ্যে ছাড়ে না। বিয়োবার সময় কাড়ি কাড়ি বিয়োবে। মাটির ঘরে প্রাণ হাতে নিয়ে থাকি।'

আশ্বিনের পর আর জল হয়নি। হলে ধানের যা গোছ ছিল তাতে আরও ফসল হত। শুকনো মাঠে খড়ের আড়ালে আবডালে ধেড়ে ইঁদুরগুলো মাসভর ধান খুটে খুটে গর্ত বানিয়ে লুকিয়েছে। গন্ধে গন্ধে সেয়ানা সব সাপ সেই গর্তে গিয়ে আড্ডা গেড়েছে। ধান চোর ইঁদুর দিয়ে ফলার করবে।

'আঁ! আঁ!' ডাক তুলে সনাতন মাঠে নেমে পড়ল। চার পাঁচটা ইঁদুর এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতেই আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। গর্তের নিশানা হারিয়ে ফেলবে এই ভয়ে ছুটে এসেছে।

সাপুড়েটাও মহা হাঘরে। হা হা করে পাল্টা তেড়ে এসেছে সনাতনকে। দুপদাপ ছোটাছুটিতে একটা সাপও গর্তে থাকবে না। আনতাবড়ি বেরিয়ে খালে জঙ্গলে সেঁধিয়ে যাবে। তখন আর কে হদিশ পাবে !

একটা লাঠালাঠি হয় আর কি। মাঝখান থেকে বিষ ওগলানো কেউটেটা হাত গলিয়ে মাঠে নেমে পড়ল। মেয়েদের নিয়ে রেবা সুড়ৎ করে রান্নাঘরে—সঙ্গে সঙ্গে বেস্পতিও। অমৃতলাল যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দিতে লাগল সাপুড়েকে। বাচ্চা নিয়ে ঘর করে। এখন আচমকা বিছানা পত্তরে ঢুকে বসে থাকলে কেলেঙ্কারি।

তখনই সাপটা অমৃতলালের বাড়ির গা ঘেষে বেঁটে বেঁটে বনঝালের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। সাপুড়ে ক্যাবলা হয়ে দাঁড়ানো। সনাতন কিছুটা খুশি হয়েছে। মুখে দুঃখ দেখানোর জন্যে চুকচুক আওয়াজ করে বলল, 'আবাদে যেতি পারোনি! সেদিকি সাপের আণ্ডিল। যত্ত গেরস্থর বাড়ি দেখে দেখে—'

'তুই থাম হারামজাদা। এখনই সাপটা খুঁজে বের করতেই হবে—'

'সেকি আর এখন এখানে আছে বাবু!'

নিজেরই গা মোচড় দিয়ে উঠল অমৃতলালের। মাটিতে ঘসটানোর দিকটা দুমড়ে দুমড়ে উঠেছিল কেউটেটার—একটু আগে। বেস্পতি বিকেলে কয়লা ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'এত ভয় কেন তোমার বাবু। ও বিবি তো এখন ঢ্যামনা।'

'তুই চুপ কর বেস্পতি। তোরা তো বাড়ি চলে যাবি। মেয়েদের নিয়ে কোন্ সাহসে এই বাড়িতে রাত কাটাব—', রেবা আর বলতে পারল না। তারও গা কাঁটা দিয়ে উঠল।

বিকেলের কফি জুৎ করে খেতে পারল না অমৃতলাল। সিমেণ্টের মেঝেতে সাপ উঠলে বিকেলের আলোয় চোখে পড়ত। সনাতন বাইরে বসে পুরো ব্যাপারটা ফোড়ন কেটে গুলোচ্ছে। ভাগচাষী হিসেবে তার বরাতে ধান নেই। নিজেই আর্জি করে বাবু মারফৎ বড় ভাই বিনোদের কাছ থেকে ছাপান্ন টাকা আদায় করেছে। এখন নিজের ভাইয়ের কাছে সাড়ে তিন টাকায় রোজ খাটে। বিনোদ টাকাটা দিলে বাজারে গিয়ে তিনপো চাল নেবে, ঝরতি-পড়তি কিছু আলু নয়ত কপি। তারপর ঝোলা ঝোলা একটা লাবড়া তৈরী হবে। কানা উঁচু থাড্ডুতে ঢেলে নিয়ে বড় বেটার সঙ্গে খেতে বসবে। তখন মিড ট্রেনের বাঁশি শোনা যায়। নারানপুর, কুন্তিয়ার লোকেরা ঘরে বসে রেলের আলো দেখে। ওদিকটায় কিছু জায়গা ছিল বাপকেলে। ভাগের সতের শতক পায়ের চিকিচ্ছেয় উড়ে গেছে। ক'দিনই বড় ডাল খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে। লেবু দিয়ে কাঁচা লঙ্কা ডলে নিলে সুন্দর গন্ধ দেয়। ডালের কিলো আড়াই টাকা।

বড় ভাই বিনোদ পাকা লোক। গত রাতে জাল পেতে রেখে গিয়েছিল। ভোর ভোর দু'গণ্ডা ঘুঘু পেয়েছে। জ্যোৎস্নায় ধান খেতে এসেছিল। ধরা পড়ে সারারাত শীতে শুকিয়েছে, কেঁপেছে। বাবু তখনও বিছানায়। বেস্পতি কয়লা ধরাতে বসে ভাসুরকে ছেড়ে দিতে বলেছিল। এসব দেখে তার বড় কষ্ট হয়। বিনোদ ছাড়েনি। চোখের মধ্যে শনের সরু সলা এফোড় ওফোড় ভরে অন্ধ পাখিগুলো কুঁজির আঁধারে সারাদিন ফেলে রেখেছে। ওই কুঁজিতেই আজ রাত কাটাবে। চৌকি না দিলে সব ধান ফরসা।

ধান কাটার পর সারা মাঠ ন্যাড়া মাথা হয়ে আছে। ধানের গোড়াগুলো

শুকিয়ে পচে মাটিতে মিশে গেলে আসছে চাষের মরশুমে ভাল সার হবে।

সাপটার লেজ দেখা গেল বড় বারান্দার ঠিক নিচেই। তাড়াতাড়িতে কাপ নামিয়ে রাখতে গিয়ে অমৃতলালের হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। সাপুড়ে দৌড়ে ধরতে গিয়ে টিউবয়েলের বাঁধানো চত্বরে গুতো খেয়ে হাঁটু ধরে বসে পড়ল। সাপটা নেই। বিকেল পড়ে এসেছে।

সনাতনের ভ্রূক্ষেপ নেই। মোটা একটা বাঁশের খেটো দমাশ দমাশ করে আলে মেরে দুটো গর্তের সন্ধান পেয়েছে। একটায় হাতড়ে হাতড়ে পালিখানেক ধানও বের করেছে। গামছায় গুছিয়ে রাখছে। আন্দাজে আন্দাজে সব বোঝে। গর্তে হাত দিয়ে গরম গরম ঠেকলে নির্ঘাৎ ইঁদুর। 'দ্যাখো! ইযি ঠাণ্ডা!'

চড়াৎ করে লাফ দিয়ে উঠল, 'আর একটা সাপ বাবু—'

বিনোদ আধমরা ঘুঘুর মালা বাবুর পায়ের সামনে রাখল, 'আপনার ক্ষেতে কাল ধান খেতে এয়েছিল। খুকুরা খাবেন।'

বেস্পতি সব দেখছিল। আগাগোড়া তার কাছে সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আসছে বারে বাবু যেন এই বড় দাগটা তাকেই ভাগে চাষ করতে দেয়—এই ইচ্ছে মনে মনে। এখন থেকেই বাবুর মন ভেজাচ্ছে। বেদানার বাপ একটা আস্ত গাছ। ঠিক এখনই বাবুর সামনে গর্ত হাতড়ে হাতড়ে ধান বের করছে। অথচ এখনও ধান গাদা দেওয়া বাকি, ঠেঙানো বাকি। ওই করে কি ভাগে জমি পাওয়া যায়! ভাগের ধানের ভাগীদার হওয়া চলে! বেস্পতি চেঁচিয়ে কাঁদতে পারলে বাঁচত।

বিনোদের সামনে থেকেই ছোঁ মেরে পাখিগুলো তুলে নিল বেস্পতি। বৌমাটিকে তার খুব ভয়। কথা না বাড়িয়ে বিনোদ সরে পড়ল।

অমৃতলাল নাম ধরে দুটো ডাক দেওয়ার পরই চেঁচাতে লাগল, 'বেল্লিক! ও বেল্লিক!'

বেস্পতি বাবুর সামনে বাতাবিতলায় ঘট হয়ে বসেছে। সামনে এক বালতি জল। এইভাবে বসলে বাবু লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে। বেস্পতি জানে। আধমরা পাখিগুলো বালতির জলে চুবিয়ে ধরল। মরবার পর কাটাকুটিতে সুবিধে। আদা বাটতে হবে।

অমৃতলাল আবার ডাকল, 'ও বেল্লিক!'

জলের ভেতর থেকে পালখে পাখিতে একদলা তুলে ধরল বেস্পতি। একটা তখনও মরেনি। সরু ঠোঁট দিয়ে বাতাস ঠুকরে ঠুকরে ধরতে চাইছে। জলের নিচে আগাগোড়া পাথর প্রায়। বাপের বাড়িতে ছোটবেলায় পুকুর সংস্কারের পর বেস্পতি একবার ডুবেছিল। তখন সে খুকি। জ্যান্ত পাখিটা আবার চুবিয়ে রেখে খানিক পরেই তুলল। বাবু ঘুঘুর মাথা চিবিয়ে খেতে ভালবাসে।

'ও বেল্লিক—', অমৃতলালের গলা চিরে গেল রাগে।

"আজ্ঞে-এ—', খেটো হাতেই সনাতন ছুটে এল।

বেস্পতি বেঁকে উঠে দাঁড়াল, 'ওকি ধারার ডাক বাবু? মানুষটার নাম নেই?'

সনাতন দাবড়ি দিল, 'তুই থাম মাগী। বাবু আদর করে ডাকেন—হাসি ধরছে না সনাতনের মুখে।

থতমত খেয়ে গেল অমৃতলাল। বলতে যাচ্ছিল, হাত দিয়ে সাপটা ধর। কাটছাঁট করে বলল, 'বাচ্চাদের নিয়ে থাকি—ঘা দিয়ে সাপটাকে ছেড়ে রাখা ঠিক হল—'

দেড়পালি ধান হয়েছে সনাতনের। না হোক ঢালা মাঠময় এমন বিশ-তিরিশটা গর্ত আছে। এতে আর বিনোদের ভাগ নেই। তেমনি হেসেই সনাতন বলল, 'বিষ ওগলানোর পর ও সাপ তো এখন রবার বাবু। মাথা তুলতে পারবেনি।'

'তাই বলে গর্ত থেকে সাপটা বের করে ছেড়ে রাখা হবে?'

অমৃতলালের সামনেই কুড়ি নম্বর ফুটবলের চেয়ে বড় একখানা চাঁদ গাবগামার জঙ্গলের ওপর ভেসে উঠল। ঝুলন্ত ধোঁয়ার ওপর জ্যোৎস্না পড়ে আছে। বিনোদের ডাগড়াই দুই ছেলে কাঠকুটো দিয়ে চুলো ধরিয়েছে। রান্না হয়ে গেলে কুঁজির পাশে আগুন করে রাখবে রাতভর।

বিনোদ এগিয়ে এল, 'আমি বলি কি বাবু, ধান তো কাটা হয়ে গেছে —এইবার বাবলার শুকনো ডালগুলো গাদা দিয়ে আগুন দিই। তাপে সাপটা পালাবে।'

অমৃতলাল এদিক ওদিক তাকাল। আছাড় খাওয়ার পর সাপুড়েটা বিড়ি নিয়ে কেটেছে। থাকলে হা হা করে উঠত। যত্ত সব বাগড়া। সনাতন ছিল, 'তাহলে বাবু গর্তের ধান যে সব যাবে—'

অমৃতলাল বেস্পতির সামনেও চুপ করে থাকতে পারল না, 'কোন কথা শুনব না। বিনোদের ব্যাটাদের সঙ্গে গিয়ে আগুন লাগা। যত কাঠকুটো আছে সব আগুন দে—'

গলায় কি ছিল অমৃতলালের। একদলা কাশি পেরিয়ে ঘড়ঘড় করে উঠল একটা বেয়াড়া আওয়াজ। সনাতন ছিটকে মাঠের মাঝখানে। বিনোদ ফোকলা মুখ খুলে দাঁড়ানো। বোধহয় হাসছে।

বেস্পতি বড় ঘুঘুটার গলার কাছে পোটলায় আঙুল চালিয়ে আস্ত ধান বের করল অনেকটা। কাল রাতে খেয়েছিল। বাবুর গলার আওয়াজে ভড়কে গিয়ে এক ছুটে শোবার ঘরে চলে এল।

বড় মেয়েটার ব্যাকরণ কৌমুদী সবে শুরু হয়েছে। রেবা তি তস্ অস্তি রপ্ত করাচ্ছিল। তারও বাইরের গোলমাল কানে এসেছে। ফাঁকা জায়গায় বাড়ি। তবু গণ্ডগোল আছে। অমৃতলাল একটার পর একটা নিয়ে আছে।

'মাংস কুটে দিয়েই কিন্তু আমি বাড়ি যাব দিদি। ভাসপোরা ঘুঘু ধরেছিল—'

'আজ তোর যাওয়া হবে না। রাতটা এখানেই শুয়ে থাকবি—ঘা দেওয়া সাপ ছাড়া রেখে ঘুমোতে পারব না।'

ঘুঘুর মাংসের নাম শুনেই মেয়েরা ছুটে বারান্দায় চলে এল। অমৃতলাল বারান্দায় দাঁড়িয়েই চেঁচাচ্ছে, 'ভিজে কাঠ ধরবে না বেল্লিক! কেরোসিন চেয়ে নে—'

মেটে জ্যোৎস্নায় কাঠ কুড়োতে কুড়োতে সনাতন গাবতলায় এসে পড়েছে। একটু নিচু হয় আর কুটোকাটা কুড়িয়ে ঢিবি করার মুখে দম নিতে গিয়ে শুধু ডালের গন্ধ পায়। গরম ভাতে ডাল ঢেলে দিয়ে একটু লেবু ডলে নিলি সে যে কী হয়! তা বলার নয়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবু যে নিরন্তর কী হাবিজাবি চেঁচাচ্ছে। কেউটেটা এখন ঢোঁড়া—তাও আগুন দিতে হবে চৌদিকে। কে বোঝাবে! অসম্ভব ময়াটে চটা।

পুকুর ধারে বাতাবি গাছটার গোড়া নিকোনো। সেখানেই পাখি ছাড়ানো হয়। চাঁদের আলো পড়ে পাতায় ছায়ায় জ্যোৎস্নার জাফরি তৈরী হয়েছে। সেখানে নেমে রেবতী ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'করছিস কি বেস্পতি? তুলসী গাছটায় পালখ ফেলছিস?'

'সকালে ধুয়ে দেবো দিদি—'

'ধুয়ে দিলে পালথ খসে?'

ছোটটার জন্মের সময় রেবতীর পেট খুলতে হয়। অতটুকু বাচ্চা এলোপাথাড়ি শুয়েছিল ভেতরে। তখনই ডাক্তাররা দরকারী নাড়ি কেটেকুটে সেলাই করে দিয়েছে। হাসপাতাল থেকে ফেরার পরই রেবা অমৃতলালের কাছে রেবতী হয়েছে। ছোঁয়াছানি এঁটোকাঁটার বাছবিচার বেড়েছে সেই থেকে। আজকাল একটা পেতলের বালগোপালকে ভোগ রেঁধে খাওয়ায়। দুটো তিনটে বাজলে তবে নিজে খেতে বসে।

অথচ উর্দ্ধরেখা যোগাযোগ এবং প্রবল যশোস্থান একসঙ্গে তাকে ঠেলে তোলার অনেক অনেক আগে বাপের পাশে বসে বালক অমৃতলাল ছোটবেলায় অঘ্রানের শীতের রাতে হ্যারিকেনের আলোয় শোলমুলোর ঝোল দিয়ে কত তোলা তোলা করে ভাত খেয়েছে। বেশী শীতে মাটির ঘরে কম্ফটারে কান গলা জড়িয়ে নিয়ে খেতে বসত। অথচ ঘুঘুর মাংস রেবার কাছে পলতা পাতার বড়ার চাইতে বেশী কিছু নয়।

আগুন ধরতেই অনেকটা জায়গা জুড়ে জ্যোৎস্না পুড়ে গেল। বেস্পতি সনাতনকে একরকম ঠেলেই বাড়ি রওনা করিয়ে দিল। বেদানা এতক্ষণে বাস রাস্তায় এসে দু'বার উঁকি দিয়ে গেছে। আক্কেল দেখ বাপের, তাও যেতে চায় না। খানিকটা দূরে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল, 'কতকাল ডাল খাইনে। আজ মাংস রয়েছে,—খুকিরা ডাল ছোঁবে না। খানিক শুকিয়ে রাখিস তো।'

রান্নাঘরের দিকে ফেরার মুখে বেস্পতি দেখল, কাটা খড়ের গোড়ায় শিশিরের ফোঁটা আগুনে লাল হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যে ঘুরতেই দরজা জানলা বন্ধ। শুধু রান্নাঘরের জানলা দিয়ে মাংস সেদ্ধ হয়ে আসার গন্ধটা বাইরের বাতাসে পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

অমৃতলাল পাখির মাথাগুলো সময় দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খেল। ঘুঘুর পাঁজরা একেবারে গুড়ের চেয়েও মধু। খেতে খেতে অমৃতলালের মাথা ঘুরছিল। সেই কখন থেকে চিবোচ্ছে। বড় পাখিটাই পাতে রেখে উঠে পড়ল, 'বেস্পতিকে দিও।'

রেবা খেয়ে দেয়ে পান সেজে পরিষ্কার হয়ে বসে বসে ঢুলছে। তার

কানে গেল না। এঁটো তুলতে তুলতে বেস্পতি ফোড়ন কাটল, 'বাইরে আগুন দেখলে না বাবু?'

'দরজা খুললেই কাঁপানো ঠাণ্ডা—'

'আগুনের কাছে গে দাঁড়াও—'

ঘুমন্ত রেবার কোলে প্লেট থেকে পান নিয়ে চড়বড় করে চিবোতে লাগল অমৃতলাল। পান মুখে দিয়ে শোয়া এক বিপদ। কিছুদিন তার নিচের পাটির একটা দাঁতের গোড়া ব্যথা হয়ে আছে। এমন সুন্দর শীত, অমন মিষ্টি মাংস, ডানহাতে পরিষ্কার পষ্ট উর্দ্ধরেখা—কোনদিন মরতে হবে না মনে হচ্ছে, ঠিক এই সময় দাঁত তুলতে হলে অমৃতলাল যাকে বলে মরমে মরে যাবে।

লেপের মধ্যে কখন যে অমৃতলালের তলপেট পাথর হয়ে উঠেছে, কখন যে চিবোনো এক চাবড়া পান সুপুরি ঘুমের মধ্যে মুখ করকরে করে দিয়েছে—ওসব ঠিকঠিক মিলিয়ে নেওয়ার সময় সে বুঝল বাড়িসুদ্ধ সবাই ঘুমোচ্ছে। ভেন্টিলেটর গলে বাইরের আলো ঘরের মধ্যে খানিকটা ঝুলে আছে। সাপটা বাড়ির গা ঘেঁষে মিলিয়ে গেছে বলেই আজ অনেকদিন পর মশারি টাঙানো হয়েছে। মশা প্রায় নেই। এই সময়টা আকাশেও মেঘ থাকে না। জ্যোৎস্না তাই বাড়তি হয়ে ঘরে চলে এসেছে।

তিন প্যাঁচে সাতাশটা ধাপ দোতলায় উঠে গেছে। ঢালাইয়ের সময় অমৃতলাল সেখানে ছিল। এখানে দেওয়াল পনেরো ইঞ্চি। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি-ঘরেই বেস্পতিকে পাওয়া গেল।

প্রথমবার হাত দিতেই পাশ ফিরে বেঁকে গেল। আবার হাত রাখল অমৃতলাল। ঘরের চেয়ে এখানে অনেক শীত। অভ্যেসে যেমন কাছে চলে আসে, ঘুমের মধ্যেও ঠিক সেইরকম উঠে এগিয়ে এল বেস্পতি, 'দিদি কোথায়?'

'কি দরকার। তুই তো রাখিতো থাকবি—'

সিঁড়ি-ঘরের ল্যান্ডিংয়ে স্টীল উইন্‌ডো বসানো বাকি। সেখান দিয়ে রাজ্যের ঠাণ্ডা লবিতে এসে ঢুকছে।

'একটা সাপের জন্যি আগুন দিলে বাবু? এত ভয়!'

'এদিকে এসো।'

'কোনদিকে বাবু ?'

'আস্তে কথা বলবি তো—'

মুখ চেপে ধরল অমৃতলাল। তার হাতের ওপরেই বেস্পতি হেসে দিল, 'একটা সাপ নিয়ে যা করলে বাবু।' ঘাবড়ে দিয়ে বেস্পতির বেশ লাগে, 'বাইরের ঠাণ্ডায় থাকতে না পেরে ঘরে এসে সেধোয়নি তো ?'

যেটুকু উঠেছিল, সেখান থেকে পড়ে গেল অমৃতলাল। সনাতনের কথাটাই বলে ফেলল, 'এখন তো ঢোঁড়া—'

বাইরে বাবলার কাঠ পুড়ে কালো হয়ে এসেছে। টোকা দিলে ছাই ভেঙে পড়ে। পোড়া জায়গাগুলো আসল জ্যোৎস্নায় ভরে যাচ্ছে। শেষবার সাপটার লেজ দেখা গিয়েছিল দেওয়াল ঘেঁষে।

'কে ? বাবু !' বেস্পতির ছাড়া ছাড়া হাসি বেরিয়ে এল খানিকটা।

এই কথায় বাইরের সব জ্যোৎস্না চলাৎ করে অমৃতলালের শরীরের মধ্যে নেমে গেল। এখন কোথাও খুট করে একটা আওয়াজ হলেই অমৃতলাল কোথায় কি দেখতে গিয়ে সরে পড়তে পারত।

'কী হল বাবু!'

রেবা নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে।

বিচ্ছিরি শীত। এই কথাটাই বলতে চাইল অমৃতলাল। বলে ফেলল, 'শুয়ে পড়গে—'

'ইদিকি আস বাবু।'

দেওয়াল থেকে চুন উঠে এসে লাগছে। হঠাৎ ছড়ে গেল বোধহয়। এভাবে গরু অনেক সময় গা ঘষে। মনে পড়তেই অমৃতলাল সরে গেল, 'শুয়ে পড়গে—'

'অসময়ে ঘুমটা ভাঙালে বাবু! সাপের চিন্তায় এমন নরম হয়ে আছ।'

অমৃতলাল দাঁড়াতে পারল না সামনে। এখনই বিছানায় তাকে লেপের মধ্যে কেউ গুঁজে দিলে বেঁচে যেত, 'শুয়ে পড়গে—'

উনুনের আঁচ নিভু নিভু হয়ে রান্নাঘর লাল করে রেখেছে। ভোরে এঁটো তোলে বেস্পতি। বাবুও ডাল খায়নি আজ। একটা বাটিতে তিনজনের পাতের ডাল তুলে শুকোতে দিল চুলোয়।

সামনের ছোট জানলাটা খুলতেই দেখল, বটঠাকুর কুঁজির গোড়ায় হা

করে বসে ঘুমোচ্ছে। বোধহয় মুখ দিয়ে লাল পড়ছে। একখানা মোট কাঠ জ্বলে শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। এমন ভাসুর যেন কারও না হয় ছেলেকে দিয়ে তার সবকিছু চুরি করিয়ে একদম ন্যাংটা করে ছেড়েছে বেস্পতিকে। কানে গলায় দেবার মত আর কিছু নেই তার। একমনে লোকটাকে দেখতে লাগল বেস্পতি। পরশুদিন সনাতনকে রোজ খাটিয়ে নগদের বদলে ষোল তড়পা খড় দিয়ে ভুজুং দিতে চেয়েছিল। বাবুকে দিয়ে আচ্ছা করে দাবড়ে দিয়েছে। সারাদিন পর খড় খেয়ে থাকবে শেষে আরও ভাল করে লোকটাকে দেখবার জন্যে দরজা খুলে বারান্দায় এল একখানা পোড়া কাঠ ছুঁড়ে দিয়েই সরে আসবে। বারান্দা থেকে বাতাবিতলায় নেমে দেখল, কুঁজির মধ্যে তিন ভাসপো ঘুমোচ্ছে। এখান থেকে ফোঁস ফোঁস শুনতে পেল।

হঠাৎ ধানের ভাঙা গাদায় চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল বেস্পতি। হাতের পোড়া কাঠখানা পড়ে গেল। জ্যোৎস্নার মধ্যে ধানের গাদায় জালে ধরা পড়ে তিন চারটে পাখি পারলে ডানা খুলে বেরিয়ে আসবার জন্যে উড়তে চাইছে। খানিক উড়েও উঠল। ভারি জাল নড়ল কিনা বোঝা গেল না। অথচ দিনের মত আলো। খড় ছড়িয়ে গেল। একটা পাখি জালেই ঝুলে পড়ল তার সামনে। কাল বাবু খাবে।

পরামর্শ

রাস্তা বলতে খালপাড়। একধারে খাল। অন্যধারের নাবি জমি, তিরিশ বছর ভাসা ছিল। কাছে কিনারের দু'দুটো নদী মজে গিয়ে এই কাণ্ড। ব্রিটিশ চলে যেতে নতুন সরকার পাম্প বসিয়ে জল মেরে দিল। যারা একদিন জমি ফেলে পালিয়েছিল—তারা আর ফেরেনি। এল তাদের বয়সকেলে ছেলে—ছেলের ছেলে, নাতি। মাঠে মাঠে হাল নামল। আবার কতকাল পরে গরুর লেজ মোচড়ানো হাঁক শোনা গেল—হেই, হেট্—ভ্রুবা, ভ্রুবা।

বিপদ হল চুনির। ভাসা বলে রাজ্যের শাল-শোল, বোয়াল-গজাল এতকাল দিনরাত মেরে বেড়িয়েছে। ধরো আর খাও। নুন কেরোসিনের জন্যে কিছু বেচে দাও। দিব্যি চলে যাচ্ছিল।

সন্ধ্যে রাত থেকে আটল বসিয়ে লম্ফ আগলে চৌকি দিত চুনি। ভোর ভোর মাছের বোঝা কাঁধে ফেলে বাড়ি ফিরত। বাড়ি বলতে কাছেই পিচরাস্তার গায়ে সরকারী জায়গার ওপর টিনের খাপরা চড়ানো মেটে ঘর। বউ সিন্ধুমণি সাত সকালে মাছ ভেজে দিত। টাটকা তাড়ির সঙ্গে তারিয়ে তারিয়ে ভাজা মাছ মেরে দিয়ে চুনি চরতে বেরোতো। তখন গোটা চারেক ল্যাংটো ছেলে মেয়ে নিয়ে সিন্ধুমণি দুপুরের জন্যে তৈরি হয়।

ততক্ষণে চুনি পা-কাটা বিষ্টুর দোকানে। সেখানে চেয়েচিন্তে চোলাই নয়ত কামুক্ষে তসিলদারের বেতো হাঁটু টিপে দিয়ে রতি পরিমাণ আফিম হয়ে যায় আটটা না বাজতেই। এই সময় থেকে চুনি আপন মনে বকবক করে, ইংরেজি বলে, দাঁড়ানো বাসের পেছনের সিটে দারোগা পুলিশ বসে আছে দেখতে পেলে স্যালুট করে। তারপর কার আল কেটে দেওয়া দরকার, কার গরু খোঁয়াড়ে দিতে হবে—এসব ঝঞ্ঝাটে কাজ নিজের কাঁধে তুলে নেয়।

নয়ত স্টেশন-রোডের কসাইয়ের হয়ে পাঁঠা খাসি খুঁজতে যায় গাঁয়ে। বেশির ভাগ দিনই পায় না। কে বেচবে ওর কাছে। তাই দু'একদিন নিজেই কানে সরষে ভরে দিয়ে চুনি বাদার ভেতর দিয়ে ফাঁকায় ফাঁকায় মাল নিয়ে চলে আসে। একবার তার কাঁধে চড়লে পাঁঠারা বোবা হয়ে যায়।

সোনারপুর সাটেল বাঁশি দিয়ে চলে যেতে চুনি ঘরে ফেরে। হাতের কাছে বউ পেলে ভালো—নয়ত রোগাভোগা একটা বাচ্চাকে উপুড় করে নিয়ে ভালোরকম পেটায়। গালের সাদা দাড়ি বুরুশ হয়ে থাকে তখন। চোখের কোণে পিচুটি। নেশায় সারা শরীর পাথর। সিন্ধুমণি তখন রাস্তার ধারের ধুতরো বাগান থেকে কয়েকটা ফল তুলে এনে বাইরের কাঁটা তুলে সামনে এনে ধরে। চুনি কচকচ করে চিবিয়ে খায়। ছ'সাতটা ধুতরো ফল খেলে তবে তার নেশা শানায়। তাই এই বাগানটুকু চুনি খেটেখুটে বানিয়েছে। চুনি স্যাদলা ধরা দাঁতে ধুতরো ফল চিবোয়—সিন্ধুমণি খালের জলে কড়া মাজতে মাজতে দেখে আর নিজের মনেই বলে, কতলোক মরে—আমি কবে বেওয়া হব? মুখ তুলে চাও ভগমান।

চুনির এসবই চলে যাচ্ছিল মাছের দৌলতে। ভাসা-ডোবার মাছ থাউকো দরে চাকুরে-বাবুরা কিনত। পাম্পে জল টেনে নিতে সে মাছ গেল। চুনির আর চলে না। সিন্ধুমণির হাড় ভাজা ভাজা। ক'দিন হল মাছের শোকে পাগল হয়ে আছে চুনি। ভোর থেকে মাটি কুপিয়ে খাল ধারে খানিকটা গর্ত করেছে। সেখানে পচা জল তুলে দিয়ে মাছের ডিম ছাড়বে।

বড় ছেলেটা খাল ধার থেকে গুচ্ছের কচু তুলে এনেছে। মুখুজ্যেদের রেশনের দোকানের আড়ত ঝাঁট দিয়ে পোকায় কাটা এক টিন গম হয়েছিল। তাই দিয়ে বড় এক হাঁড়ি চাপাতে হবে। কাঠকুটো দিয়ে আঁচ ধরিয়েছে মেয়েটা। খাল ছেড়ে ওঠার আগে সিন্ধু খুব মন দিয়ে ভগবানকে ডাকলো—ছেলেমেয়ের বাপকে তোমার কাছে টেনে নাও। আর সয় না।

ভগবান কোনকালেই লোকের কথা শুনে চলে না। মনে হয়েছিল, এবার বোধ হয় শুনে থাকবে। চুনি টলতে টলতে রাস্তা পার হয়ে আসছিল। ইটখোলার লরি ঘচ করে ব্রেক কষল। চুনি যেমন আসছিল ধীরে সুস্থে রাস্তার এপারে এসে ড্রাইভারকে একটা গাল দিল। খুব আশা করেছিল সিন্ধু। লরির চাকা থেকে মানুষটা ফসকে যাওয়ায় মুষড়ে পড়ল।

চুনি বড় রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েই বউকে কষে দু'খানা চড় হাকড়ালো।

পা-কাটা বিষ্টুর দোকানে তখন বাড়ি থেকে ভাত এসেছে। সেখানকার একটা লোক ছুটে এসে চুনিকে ছাড়িয়ে দিল। ধুতরো বাগানের একদিকে বেড়া দিতে বলেছিল চুনি। দেওয়া হয়নি সিন্ধুমণির। সেই সুবাদে সিন্ধুমণির পিঠে এক হাত সুখ করে নিল চুনি।

সন্ধ্যেবেলা হোমিওপ্যাথ জি পালের দোকানে হ্যাজাক-বাতি ঘিরে পোকার রাজত্ব। তাই একটু দূরে বসে পালমশাই ওষুধ দিচ্ছিল। সিন্ধু গিয়ে ঘরের কোণে মেঝেতে বসে পড়ল।

শীতকাল তর দোকান খুলে মাছি তাড়াতে হয়েছে জি পালের। দেশ গাঁয়ে কফ্‌কাশি ছাড়া সে' সময় বিশেষ কোন রোগ বালাই থাকে না। সে কথাই পতিত মিস্তিরকে বোঝাচ্ছিল। বর্ষাকাল হল ডাক্তারির সময়। কত রকম অসুখ বিসুখ লেগে থাকে তখন। এসব আলোচনার একটা কারণ ছিল। মিস্তিরের অবস্থা ভাল, স্বাস্থ্যটিও ভাল। ঘরে বউ নেই। কোনকালে ছিলও না। বয়সকালে সব নেশা ফিরিয়ে ফিরিয়ে করেছে। রেলে চাকরি ছিল। বাপকেলে জমিতে সম্বচ্ছরের ধান, মুগকলাই হয়েও বেচবার মত থেকে যায়। ফাঁকা বাড়িতে বসে কাঁচাপাকা চুলে টেরি বাগায় আর বিপদে পড়ে। পাড়ার ছেলেদের সব পুজোয় মোটামুটি চাঁদা দেয়।

জি পাল বলল, 'মিস্তির এবারে একজন ঘরে আন। দেশ গাঁয়ের সুর ভালো না। কোনদিন রাস্তাঘাটে এমন পেটন খাবে—আর মুখ দেখাতে পারবে না।'

মিস্তির বলছিল, 'ধান উঠলেই নিয়ে আসব ভাবছি।'

জি পালের ওপর নীচ দু'পাটি দাঁতই বাঁধানো। লোকে জিজ্ঞেস করলে বলে, ইস্কুলের টিমে হাফব্যাকগিরি করতে গিয়ে ওই দশা। কুলোকে কুকথা বলে। সেসব আমলে আনার লোক না জি পাল।

এমন সময় সিন্ধুমণি ঘরে ঢুকেই পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে পড়ল।

মিস্তিরের ডান পায়ের গোড়ালির নীচে অনেককালের গুপো আছে। কোথাও বসলেই জুতো খুলে পা মেঝেতে ঘষে ঘষে দেখে। জুতোর তিন ফুট দূরেই সিন্ধুমণি পা ভাঁজ করে বসে।

কোন্‌ এককালে ন্যাংটো বয়সে জি পাল চুনির সঙ্গে খেলাধুলো করেছে। সেই চেনা শুনো ধরে সিন্ধু মাঝেমধ্যে ওষুধবিষুধ নিতে আসে। তারপর কতকাল কেটে গেল। জি পাল জি পি ও-তে সর্টার হয়ে ঢুকে গেল যুদ্ধের

তিন বছর আগে। একবার একজন মরা লোকের মনিঅরডারের মোটা টাকা ফাঁকতালে হাতে আসতেই হ্যানিম্যান সাহেবের ছবি টানিয়ে দোকান দিল। সেদিনটা ছিল অক্ষয় তৃতীয়া। বড় পয়া দিন। সেসব কথা মনে পড়লেই জি পালের চোখের কোণ ছোট হয়ে আসে—উঠোনে আছড়ানো খড়ের গাদা, পাকা বাড়ির ছাদে ফাইভ এইট রডের ত্রিশূল ভেসে ওঠে। ভাব এসে যায় মনে। কোথায় পড়ে ছিলাম—কোথায় উঠেছি আজ।

'বল কার অসুখ আজ?'

'কারও না ডাক্তার। আমায় একটা কিছু দাও—খেয়ে মরে যাই।'

'আজ আবার পিটেছে! ভালো! তোকে তো বলেছিলাম—বামুন কায়েতবাড়ি ঢেঁকির পাড় দিয়ে বাসন মেজে কতকাল কাটাবি?'

সিন্ধু কিছু ঢিলেঢালা মেয়েমানুষ। দুটো নরম কথা ছাড়লে কষি আলগা দিয়ে বসবে। নিজেই পিঠের কাপড় তুলে দেখাল, লম্বা লম্বা তিনটে কালসিটে পড়েছে। মিত্তির ঝুঁকে পড়ে দেখছিল। তাকে ফাঁকায় আলাদা করে দেখালে হাত বুলিয়ে দিত।

জি পাল বলল, 'বছর বিয়োনি গরু হয়ে গেলি। তবু আঁকড়ে পড়ে থাকবি। এখনো যেটুকু আছে তুলে রাখ—নয়ত শেষ বয়সে কে দেখবে তোকে? চুনি? ছেলেপিলেরা। ওই বাপেরই তো ছানাপোনা!!'

এদেশে পশ্চিমে গরু টেঁকে না। পাল ধরতেই দিশী গরুর পালান শুকোয়। তাই নাড়াবুনিয়ার হাটে একরকমের গাই গরু আসছে—তাদের সাইজ ছোট, কিন্তু ভরাট পালান, বছর না ঘুরলে ডাকে না। আবাদের চালান। মিত্তির একটা আনাবে।

মিত্তিরের এখন মাথায় ঘা। কোনদিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই। তবু না তাকিয়ে পারছিল না। তবে কিনা চুনির বউ। তাই চোখ ফিরিয়ে নিল।

এই বেয়াড়া লোকটার হাতে পতিত মিত্তির গত অঘ্রানেও নাকাল হয়েছে। পাখি, গাছের ফলপাকুড় ভগবানের। পাখিরা বছর বছর খেজুর বিচি ছড়িয়ে দিয়ে গেছে খালপাড় ধরে। সেই খালধারে গুচ্ছের গাছ। পতিতের বাড়ির সামনেও দু'দুটো খেজুর গাছ আছে। সরকারী জায়গার ওপর। বেওয়ারিশ। যে আগে কাটবে রস তার। গাছ দু'টোর বয়স হয়েছে। ফি'বছর তাঁর বাড়ির সামনের গাছেও চুনি কলসি বসায়।

এবার পতিত তক্কে তক্কে ছিল। ভোর রাতে সিউলি নিয়ে গাছের গোড়ায় গিয়ে দেখে চুনি নামছে, এক গাল হাসি, 'রস তাড়ি করে ছুটো পয়সা পাই বাবু।'

অমন নোংরা বাঁদুরে মানুষের এমন বউ। মারধোর খায়। তবু পড়ে থাকে।

এমন দেশ গাঁ কলকাতার এত কাছে আছে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বিশ ত্রিশ বছর আগে বাজার জমজমাট করে বসানোর আগে বাঁড়ুজ্যেরা তিনঘর মেয়েমানুষ এনেছিল। হৈ হৈ করে বাজার বসে গেল, তারাও উঠে গেল। সেই ঘরে এখন প্রভাত মুখুজ্যের মদের দোকান। রেলের ঝিল জমা নিয়ে মাছ ফেলা যায় না। পাড়ার বেকাররা ধরে খায়। মিত্তির বলে, 'বুঝলে পাল, দেশে আর আইন নেই। ছেলেছোকরারা মাথায় উঠেছে। একটু যে ফুর্তিতে থাকব—তাতেও বাদ সাধবে।' মিত্তিরের অসুবিধে নানা রকমের। প্রভাতের দোকানের মাল খেয়ে সুখ হয় না। বামুনটা জল মিশিয়ে তেজ মেরে রাখে।

জি পাল সোজাসুজি বলল, 'পতিতবাবুর কাছে থাকবি তো সব ঠিক করে দিতে পারি। একবার তুই মুখের কথা খসা—বাকি আমি দেখব।' মিত্তিরের চোখমুখ দেখেই পাল ধরে ফেলেছে—

সিন্ধু সোজাসুজি মিত্তিরের দিকে তাকাল, 'আমাকে দিয়ে হবে বাবু?'

মিত্তিরের মুখে কথা সরছে না। এতকাল যা কিছু ঠিকঠাক করেছে—নিজে নিজেই, মাঝে পড়ে তার হয়ে কেউ কথা পাড়েনি।

জি পাল কথা যুগিয়ে দিল, 'খুব হবে। পেটেভাতে থাকবি। ছোট ছেলেমেয়েগুনো একবেলা না হয় খেয়ে আসবে ওর ওখান থেকে। তাহলে তোরও মন পুড়বে না—'

মিত্তির হা হা করে উঠল, 'আমি এবার ধান ধরে রাখিনি। অতগুলো পেট সামলাতে পারব না—আগে থেকে বলে দিচ্ছি।'

'কোলের ছেলেমেয়ে দু'টো ঘরে ফেলে যেতে পারব না কিন্তু। আর নগদ কি দেবে?'

'এখুনি বলব না। সব দেখে শুনে পরে ঠিক করে দেব। মাঝখানে আমি তো রয়েইছি—'

জি পালের কথায় একটু ভরসা হল সিন্ধুর, 'বাবু তো একা মানুষ।

রান্না বানা সব করে দেব।' মিত্তিরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'বউয়ের মত রেখো দেখবে তোমার কোন অসুবিধে হবে না। মারধোর কোরো না কিন্তু! তাহলে চলে যাব—' ঘরের গুমোট কেটে গেল।

জি পাল পতিত মিত্তিরের অপেক্ষায় না থেকে একটু একটু করে অনেকদিনই কথাটা পেড়ে রেখেছিল। আজ বলতেই কাজ হয়ে গেল। তার নিজের বাড়িতে সব সময় দুর্গোপুজো লেগে আছে। বাতে অচল গদাই মার্কা বউ। ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে যায়। নতুন সিনেমা এলেই ধান বেচে দেয় বড়ছেলেটা। বাড়ির মধ্যে কোথাও যে একটু সুখ করবে তার জায়গা নেই। শুধু এখন পতিত একটু বুঝসমঝ করে চললেই হয়।

হঠাৎ কি মনে হতে সিন্ধু শিউরে উঠল প্রায়। পরিষ্কার বলল, 'আমি কিন্তু সন্ধ্যে সন্ধ্যে ফিরে আসব। ঘরের মানুষটা সন্ধ্যের ট্রেন ছেড়ে যেতেই বারান্দায় এসে বসবে।'

সেকথা এখানকার সবাই জানে। সন্ধ্যে থেকে মাঝরাত অব্দি রাস্তার লোক ডেকে ডেকে চুনি গালাগালি করে। ওইভাবে তার সারাদিনের নেশার খোয়াড়ি চলে।

'তখন এসে আমায় না দেখতে পেলে খুন করে ফেলবে—'

মিত্তির এই প্রথম সরাসরি কথা বলল, 'তবে কখন আসবে?'

'দুপুর হলেই ধুতরো চিবিয়ে মাটির তাল হয়ে পড়ে থাকে। এক সময় নিজেই বাজরের দিকে ঘোরের মাথায় মিস্ত্রীর খাবারের দোকানে দুধ খেতে চলে যায়। দুপুর থেকে সন্ধ্যে অব্দি! হবে না?'

'ও আমার মনে নেয় না। বুঝলে পাল—'

জি পাল ভেবেছিল, সে নিজে মধ্যস্থ থেকে বাজার বরাবর যা হয়—তাই একটা কিছু ঠিক করে দেবে। তাঁর এই হোমিওপ্যাথির দোকানে বসে শ'দরে বাঁশবাগানের জমা ঠিক করে দেয় কতজনের—কার পুকুর ছেচতে হবে, কার গরুটা হাটে পাঠাতে হবে—সব সে মাঝখানে থেকে পড়ে বলে দেয়। যার যা ইচ্ছে দিয়ে যায় তাকে।

'জানাজানি হলে সর্বনাশ। আমায় কেটে ফেলবে।'

'তাই বলে তুই পড়ে পড়ে মার খাবি? বছর বছর বিয়োবি? দু'দিন পর একবেলা খাবি?'

সিন্ধু ফিরে সেই কথাটাই বলল, 'তাইতো বলছিলাম—খেয়ে মরে যাই

এমন একটা ওষুধ দাও।'

'ওটা কি একটা কাজের কথা সিন্ধু।' জি পালের মুখচোখে হ্যাজাকের আলোয় স্নেহ দরদ সব ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। ভাল করে কামানো গাল। জমি দিয়ে ঘরেই বাঁধা নাপিত করে রেখেছে। কলকাতায় ওষুধ কিনতে গেলে আতর মেখে বেরোয়। শহরে যাওয়ার পামপ্ শোয়ার ঘরের তাকে কাগজ পেতে রাখা আছে।

এসব লোক কত মিষ্টি করে কথা বলে। সিন্ধু বুঝতেই পারে না, চুনির মত মানুষ কি করে হয়?

'দোব। তোকে ওষুধ দোব সিন্ধু। তবে তোর জন্যে নয়।'

পতিত বুঝলো, তার উপস্থিত বিপদের জন্যে দরকারী ওষুধের কথা বলছে জি পাল।

'একটু একটু করে মিশিয়ে দিবি চুনির তাড়িতে। খাবে, আর পড়ে পড়ে ঘুমোবে। খবরদার একবারে সবটা দিসনি। তাহলেই চিত্তির!'

'তাই দাওগো। ঘুমোলেও শান্তি।'

পাকা কথা আর আজ হল না। ওষুধ নিয়ে যাবার সময় সিন্ধু ফিরে দাঁড়াল, 'খেয়ে মরে টরে যাবে না তো?'

'গেলই বা। বয়স তো কম হয়নি। এই বয়সে শরীরে আর আছে কি চুনির?'

'শেষে আবার জেলে না যাই দেখো।'

'ওরে আমি আছি না তোদের মাথার ওপর? তেমন বিপদ হলে কাগজপত্তর ঠিক করে দেব। বাগানের দু'খানা বাঁশ কেটে নিয়ে যাবি ছেলে পাঠিয়ে। লোকজন ডেকে আড়ংঘাটায় পাঠাবি—'

দোনোমনা সিন্ধুমণি জি পালের রক থেকে নেমে গেল। গাঁয়ে গঞ্জে এমন ওষুধ তাকে বছরে দু'একবার দিতেই হয়। কাগজপত্তরও তাকেই ঠিক করে দিতে হয়। এসব চিকিচ্ছের মড়া চোদ্দ মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে আর কলকাতায় যায় না। আড়ংঘাটায় শুকনো নদীর পাড় ধরে কাঠকুটো জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিলেই হল। তার প্যাডের কাগজে দু'ছত্র লিখে দিলেই খালাস।

ঠিক এই সময় স্টেশন ফেরৎ চুনি লেভেল-ক্রসিংয়ের মোড়ের আলুর চপ কামড়াতে কামড়াতে আসছিল। মাথাটা খুব ভার হয়েছে। অনেক কষ্টে চোখ তুলে তাকাল।

হ্যাজাকের আলোয় পালের ডাক্তারখানা বিয়ে বাড়ি হয়ে আছে। ঝুঁকে পড়ে খালপাড়ের মিস্তিরকে কি বোঝাচ্ছে।

হুট করে ভেতরে চলে গেল চুনি, 'চিনির গুলি বিক্রি করে খুব পয়সা হয়েছে? কি পাল শালো।' সবাই জানে, এটা চুনির আদরের গাল। ভালবাসা করে শালাকে শালো বলে।

'বোস্। মেলা চেঁচাসনি।'

'পয়সা হয়ে ভদ্রলোক সেজেছো?'

কথা কোনদিকে যাবে বলা যায় না। আগে আগে চুনি দোকানে ঢুকে পড়ে কাঁচের আলমারি হাটকে এটা সেটা ওষুধ নিয়ে এমন চলে যেত। দেশ গাঁয়ে সাপে কাটা রুগী হেলে পড়লে, নাক বসে গেলে খুঁচিয়ে জাগাতে কেউটের বিষ লাগে। খানিক ফুঁড়ে দিলেই তাজা মানুষের মত মড়া নড়ে ওঠে। এখন সেই ওষুধ এক শিশি শুকিয়ে পুরনো ঘি হয়ে আছে। তাতে ডিষ্টিল ওয়াটার মিশিয়ে ঝাঁকালেই ব্রাণ্ডির চেহারা পায়। জি পাল কতদিন একেবারে সামনের তাকে একশিশি যম সাজিয়ে বসে থেকেছে। সে সময় চুনি ভুলেও এদিক মাড়ায়নি।

আপশোস। বড় আপশোস। আজ যদি শিশিটা সাইজ করে সামনেই সাজিয়ে রাখা যেত। চুনি বোতলে হাত দেওয়া মাত্র জি পাল পুরোটাই গছিয়ে দিত।

চুনি আজ কিছুই নিল না। যাবার সময় বলল, 'তোমায় আমি অনেকদিন চিনি পাল। ফাঁকা দোকানে বসে মতলব আঁটছো দেখে ঢুঁ মারলাম।' বেরিয়ে যেতে যেতে মাতালি আন্দাজে বলল, 'হুঁসিয়ার কিন্তু।'

মিস্তির ভয় পেয়েছে দেখে জি পাল বলল, 'অত ঘাবড়াবার কি হল। নেশার মানুষ অমন ফিরে ফিরে হাঁক মেরেই থাকে।'

মুখুজ্যের রেশন শপ ঝাঁটানো গম ফুরোতেই চুনি মহা খাপ্পা। এতগুলো পেট কি দিয়ে ভরে রাখা যায়। বড় ছেলেটা একটা মুরগী নিয়ে বাজার ঘুরে এল। কেনার লোক নেই। তখন সেটা হাতে ঝুলিয়ে সিন্ধু মিস্তিরের উঠোনে হাজির হল। ভরসা এই, তাকে লোকটার নজরে ধরেছে। হোলোও তাই।

মিস্তির নিজে এসে একটা খুটোয় মুরগীটার ঠ্যাঙের দড়ি আচ্ছা করে বাঁধলো। তারপর দাম নেওয়ার জন্যে সিন্ধুকে ভেতরে ডাকলো। ফাঁকা

বাড়ি, গদির বিছানা, দেওয়ালে নারাণের বাঁধানো ছবি।

আধঘণ্টা জলের মত কেটে গেল।

মিত্তির নিজেই বারান্দায় বগি থালা ভর্তি করে পান্তা পেড়ে দিল সিন্ধুকে। একপালি চাল নিয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখে, জি পালের ওষুধ সুদ্ধ তাড়ি গিলে চুনি বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। শান্তি।

ঘণ্টাচারেক ঘুমিয়ে চুনি একদম চাঙ্গা। প্রথমেই সিন্ধুর কাছে কৈফিয়ৎ চাইল, 'মুরগী বেচলি কেন মাগি?'

সিন্ধু বোঝাবার চেষ্টা করল না। নেশায় এমন গোলমাল প্রায়ই করে লোকটা। মাটির দেয়াল, চালে খাপরা টিন। চুনি এক ধাক্কায় সিন্ধুকে ঘরের কোণে ফেলে দিল। সেখান থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। চার বছরের ছেলেটা এই মারধর দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। এক চড়ে তাকেও থামালো চুনি। কলসিটা কাৎ হয়ে মেঝেময় জলে কাদায় গোয়াল করে দিল। সেই রাগে চুনি দুম দুম করে সিন্ধুকে কয়েক ঘা দিয়ে নিল, 'রাক্ষুসি অত বড় মুরগীটা একা খেলি?'

বিকেলে চুনি বেরিয়ে পড়তেই সিন্ধু গিয়ে মিত্তিরের বাড়িতে উঠল। নিজের গাছের বাঁধা ভাঁড়ের তাড়ি নিয়ে বসেছিল পতিত। সামনেই খালের ওপারে বাতিল ইটখোলার পোড়ারঙের সাতপুরনো ঢিবি। ফোতো মিস্ত্রীর বাঁশবাগান জমা নিয়ে কারা বাঁশ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। রোদ একটু পরেই নিভে যাবে বলে কত নরম। এই অবস্থায় সিন্ধুকে আসতে দেখে মিত্তির মনে মনে নেচে উঠলো। তার নিজের কোন বউ-ছেলে নেই। থাকলে কেমন হত—একটু আগে তাই ভাবছিল। এখন মনে হল ভাগ্যিস নেই।

পতিত ভেতর বাড়িতে একটা জল চৌকিতে বসল। সিন্ধু পা ঝুলিয়ে দিয়েছে রকের বাইরে। আজ জি পাল নেই বলে মিত্তির খুব সহজেই কথা বলছিল। এগিয়ে গিয়ে সিন্ধুর পিঠে হাত বোলাতে লাগল, 'চুনি কোথায়?'

'চরতে বেরোল।'

'ওষুধ দিয়ে যাচ্ছ।'

'খালে কুচো মাছ ধরেছিল। সন্ধ্যের জন্যে সবটাই ওষুধ মিশিয়ে ভেজে রেখেছি। ফিরে এসে খাবে।' খাওয়ার কথাটা মনে পড়তেই সিন্ধু কেঁপে

গেল। সন্ধ্যেবেলা একা একা একথালা মাছভাজা নিয়ে চুনি বসে। নেশায় আঙুল কাঁপে। হাত গলে মাছ পড়ে যায়। অন্ধকারে দেখতে পায় না। ছোট ছেলেটা দূর থেকে দেখে আর বেড়াল হয়ে গিয়ে কুড়িয়ে কুড়িয়ে খায়। তখন মাথা ল্যাজা সবকিছু কড়রমড়র করে খায়। চুনি সাক্ষাৎ খোক্কোস।

মিত্তির লোকটা চুনির চেয়ে বয়সে বড় হবে। তবে অনেক বেশী আঁটো। গায়ের গন্ধ রাস্তাঘাটের ভদ্দরলোকের ধারা।

ভাদ্র পার হয়ে গেল। ক'দিন পরেই কুয়াশার ধাত থাকবে সকাল-বিকেলে। চাঁদ উঠেই একলাফে মিত্তিরের কলাবাগান বরাবর খুব উঁচুতে এসে থামল। তখন পতিত বলছিল, 'তোমার ছোট ছেলেটাকে সকালে পাঠিয়ে দেবে রোজ। পান্তা গরম যা জোটে খেয়ে যাবে—'

সিন্ধুর খুব সুখ হচ্ছিল। এই চওড়া রক, বড বড় ঘর, শান বাঁধানো পুকুর—এই সবই মিত্তিরের। ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে শুধু একটানা বাঁশ কাটার আওয়াজ।

'সবটুকু ওষুধ দিয়েছো?'

'পুরো। ওটা খেলে পড়ে পড়ে ঘুমোয়—'

মিত্তির বুঝলো আজ চুনি মাছভাজা মুখে দিলে শুধুই ঘুমোবে। তাই আরেকবার সিন্ধুকে আদর করবে বলে এগোতে পারল না। তাছাড়া এখন জলচৌকি ছেড়ে উঠতে গেলে গোড়ালির নীচে গুপোয় ব্যথা লাগবে। পরিষ্কার বুঝলো, এই চাঁদের আলোর নীচেই কিংবা পাশাপাশি একখানা কালচে অন্ধকার ঝুলে ঝুলে পড়ছে। হাজার হোক মিত্তিরের বয়স হয়েছে। সংসার না করলেও সংসার বোঝে আন্দাজে আন্দাজে।

বাগানের কলা গাছে গাছে মাঝের কচি সবুজ পাতা পাক খেয়ে সিধে ওপরে উঠে গেছে। চাঁদের আলোর সারি সারি ছায়া পড়েছে। সিন্ধুমণি নাটাগাছির ন'ভাসানের মেয়ে। সেখানকার মেঠো রাস্তা এমন জ্যোৎস্নায় মাঠের মধ্যে পড়ে থাকে। হাটবার কত লোক হেঁটে যায়। চুনি বিয়ে করে ফেরার পথে এমন জ্যোৎস্নায় তেমাথানির মোড়ে তাকে হ্যাণ্ডেল মেরে টিউকলের জল খাইয়েছিল। তখন মানুষটার কাঁধে কালো কুচকুচে বাবরি থাকতো।

মিত্তির বলল, 'বড় ছেলেটাকে ইঞ্জিনের পোড়া কয়লা বাছতে পাঠাও,।

বাড়ি বাড়ি দিলে দু'টো পয়সা আসবে।'

সিন্ধু ওদিক দিয়েই গেল না। ঘরের লোকের ভঙ্গীতে বলল, 'মুচমুচে বড়ি এনে রেখো। কাল পোনা মাছ দিয়ে রেঁধে দেবো। ঝাল ঝাল করে।'

পতিত ভাল করে কথাগুলো শুনতে চাইছিল। উপায় নেই। ঠিকেদারের লোকজন চাঁদের আলো পেয়ে ডবল দমে খটাখট বাঁশ কাটছে। ভোর রাতে চালান যাবে। মিস্তির সেই শব্দ ধরে ধরেই বলল, 'চুনির একটা ভালমন্দ কিছু হয়ে গেলে কি করবি সিন্ধু?'

'হাড় জুড়োবে। কুড়িয়ে কুড়িয়ে যাও জোটে তা একা গিলবে। অথচ এতগুলো পেট—'

'আমি বসি কি সিন্ধু এখন তুই যা। লোকজন ঘুমিয়ে পড়লে তবে আসিস।'

পতিতের খুব সুবিধে হয়েছে। খাল পাড়ের এদিকটায় লোকালয় বলতে কিছু নেই। দিব্যি ফাঁকায় ফাঁকায় যাতায়াত করলেও কারও চোখে পড়ার নয়।

'কেন পছন্দ হচ্ছে না বাবু?'

'তাই বলেছি। গুড়োগাড়াদের খাইয়ে-দাইয়ে আয়। মায়ের মন তোর —এখানে ভালমন্দ খেয়ে শেষে মন পোড়াবে দেখবি।'

সিন্ধুর সে সব কিছু হচ্ছিল না। ওঠার সময় বলল, 'রাত হয়ে গেছে—'

'আটটার ট্রেন কখন চলে গেছে।'

একা খালধারে পড়েই দেখল জ্যোৎস্নায় পিঠ দিয়ে তিনখানা মেঘ উল্টোদিকে দাঁড়ানো। এসবের কোন মানে হয় না। মনের ভেতরে চুলকোচ্ছে দেখে সিন্ধু বেগে হাঁটতে লাগল।

শেষ বাস চলে গেছে বোধহয়। বড় ছেলেটা পিচরাস্তার ধারে কণ্ডাক্টরদের বসার বাঁশের মাচায় ঘুমিয়ে পড়েছে।

অন্ধকার ঘরে প্রথমে পায়ে ঠেকলো ছোট ছেলেটা। মাঝের মেয়ে দু'টো এই রাতে বাপের ধারায় ঘুনি বসাতে যায়নি তো খালে! আজ সারাটা দিন একের পর এক অনেক কিছু পেটে পড়েছে সিন্ধুর। শুয়ে পড়ে আলিস্যি ভাঙবে ইচ্ছে ছিল। একখানা থালা ঠিকরে গেল পায়ে লেগে। তখনি চুনিকে সেই অন্ধকারেও দেখতে পেল সিন্ধু।

গালের ভুরভুরে শাদা দাড়ির চাক একটুখানি আলো পেয়ে ঝকমক করে উঠল। থালা ছিটকে গিয়ে গুচ্ছের মাছভাজা ছড়িয়ে পড়েছে। যেদিকেই পা ফেলে, এঁটেল মাটির মত পায়ের চাপে থেতলে যাচ্ছে। কাকে জাগাবে, কাকে তুলবে। ফোতো মিস্ত্রীর বাগান থেকে বাঁশ কাটার আওয়াজ একটানা এদিকে এসেও আছড়ে পড়ছে। সাত-আট মিনিটের রাস্তা পার হয়ে শব্দটা এদিকে আসছে।

পাল ডাক্তার বলেছিল, আমি তোদের মাথার ওপরে আছি রে। দরকার পড়লেই দু'খানা বাঁশ কেটে নিবি বাগান থেকে ছেলে পাঠিয়ে।

খালে, ডোবায়, সব জায়গায় জ্যোৎস্না। বাঁশ কাটার আওয়াজ আসছে খট্ খট্ খট্। নির্জনে এই সময় খাল থেকে মাঝে মাঝে কাঁকড়া উঠে আসে।

কে আসেনি

বৈশাখ মাসের প্রথম পূর্ণিমা হবে। খাল থেকে মাছ ধরছিল সবাই। জলছেচা মেশিন চলেছে আজ তিন দিন। জল যত কমে আসে—খগেনের ধারণা, এবার না-জানি বড় বড় মাছ বাতাসের অভাবে ওপরে ভেসে উঠেই জলে ঘাই দেবে। লম্বা খাল। একদা নাকি মোটর-লঞ্চ চলত। সেই কলকাতার নেবুতলার খালের সঙ্গে যোগ ছিল। খড়ের নৌকো যাতায়াত করত।

পঞ্চাননের বউ, মা, দু'ভাই ছাড়াও বেড়াতে আসা বড় কুটুম্বও উবু হয়ে খালের কাদা ঘেটে ঘেটে পাকাল মাছ তুলছিল।

খগেনের বড় ছেলে হাজরা দাড়ি কাটে কম। দাঁত মাজে না সেই ছোটবেলা থেকে। বিয়ের পর থেকে কাপড়ও কাচে না বিশেষ। সেও তার বাপ খগেনের সঙ্গে থাকে। সেও মাছ ধরছিল।

আসেনি খগেনের মেজো বেটা—বজরা। তার কাজকম্মই আলাদা। রেলের তার কাটে। চাল স্মাগল্ করে। বছরে একবার দু'বার বিয়ে করে। বউ ভাগে নয়ত আত্মঘাতী হয়। এবারেরটা নাকি টিঁকে যাবে।

ছোট ছেলে ঘটি বাপের সঙ্গে সঙ্গে কচুরিপানা দিয়ে আলটা বসিয়েছে। জল কেটে বেরোবার মুখে আটল বসিয়েছে।

জ্যোচ্ছনা রাত। খালের গা ধরে আবছা ছায়ায় ছায়া দুলিয়ে বনঝাল গাছের জঙ্গল বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপে। সামনেই চাঁদু ঘোষের ভেড়ি। একদা ইটখোলা ছিল। এখন ইট বানাবার পর সেসব গর্তে জলকর হয়েছে। মাছ বাড়ে ভাল। সেখানকার মাছও বর্ষাকালে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এই খালে এসে পড়ে।

খগেন জল থেকে মাছ তোলে। জলছেচা মেশিনের শ্যামল বাঙালকে

মাছের ভাগা দিতে হবে। বাঙাল ঠিক সময়ে খাল-ভেড়ির মাথায় এসে ছায়া ফেলে দাঁড়াবে। আল থেকে জানতে চাইবে, কদ্দর কি হলরে খগেন। মেশিন এখন একটু জিরোক।

এই শেষ বেলাতেই মেশিনের বড় দরকার। জল ছেচবে। জিরোবে। আবার ছেচবে। তবে না মাছের হদিশ পরিষ্কার বোঝা যাবে।

খগেন খালধারে বসে মেশিনের পাশাপাশি জিরোচ্ছিল। তার এখন জিরোবারই বয়স। বড় বেটা হাজরার বউ বছর বছর বিয়োবে। সংসার বড় বলে আলাদা করে দিতে হয়েছে। নয়ত ছেলেটা তার ভাল। খগেন নিজেই সবাইকে জড়ো করে সরকারী খালে মাছ ধরার ফন্দিটা বের করেছে। এখন কাজ নেই গাঁয়ে। মাঠের বোরো ধান পাকলে তবে আবার মাসখানেকের কাজ পাওয়া যাবে। এখন সে আগান বাগান ঘুরে বেড়ায়। কোথায় কাজ ?

খগেন ভেবে দেখছিল—কে আসেনি। শরৎ মিস্ত্রী আসেনি। তার এখন ডাঙা জমিতে বাগান দিয়ে অবস্থা ফিরেছে। সংসারের লোকজন মরে গিয়ে পয়সাকড়ি এখন তার ফাউ হয়ে গেছে। তার আর আসবার দরকার নেই।

আসেনি কিশোরী। কিশোরী দাশ। ফুরোনে ইট কাটে লালজীর ইটখোলায়। হাজারে সতেরো টাকা। রাত থাকতে যায়। ফেরে সেই বেলা দু'টোয়।

আর আসেনি কে? আসেনি একজন। তার বউ। হাজরার গর্ভধারিণী। এখন সে কাঁসার কেড়ে মাথায় দিয়ে বামুন-কায়েত পাড়ায় ফিরি করে ফিরছে। বিকেলের দুধটুকুও বেচে দেয়। বাদার ঘাস খেয়ে খেয়ে বেম্পতির কালো গাইটা এখন বিকেলেই তিনপো দুধ দেয়।

ও বাবা তুই জলে নাববি নে?

তুমি দ্যাখো বাবা। আমি এখন বুড়ো হচ্ছি। একটু জিরোই। একটা বিড়ি ধরাই। বলতে বলতে খগেন দেখল—তার ছোট বেটা ঘটি খালের পাঁকে হাঁটু অবধি গা দিয়ে ওপরে খালপাড়ের বাবাকে জলে নামতে ডাকছে। বাবা সে নিজে। অর্থাৎ বাপ। সে নিজে বাপ। খগেন নস্কর। ফরসা গা। মুখখানা রোদে পুড়ে ছাই ছাই। বর্ষাকালে আলে আলে ঘুরে রোয়ার জন্যে ফুরোনে ভাড়া করা লোকদের হাতে হাতে বীজের গোছা

এগিয়ে দিতে হয়। সে আজ তিরিশ বছর এই কাজ করে আসছে। পায়ের পাতা দুটো বেঁকে গেছে তাই।

খগেন বিড়ি এগিয়ে দিল পঞ্চাননকে। তারপর নিজে জলে নামল। আহা! কতকালের চেনা খাল। এ খালে তার বাপ ভেসে যাওয়া মরা ছেলের সাইজের চিংড়ি ধরেছে, এখন নয়। বাবা তার মাছ ভেজে খেত না। পুড়িয়ে খেত। আধপোড়া। সে কাঁকড়াই হোক আর চিংড়িই হোক। ওই পঞ্চার বাপের সঙ্গে ভাজাভুজি নিয়ে বসত। এক ঝাঁপা তাড়ি সঙ্গে। তাতে কচি কল্কির নিঙড়োনো রস। সাক্ষাৎ ধুতরোর ক্রিয়া। কড়মড় করে আধপোড়া জিনিস চিবোতো। জ্ঞান থাকত না বাপের। একবার ছেলেবেলায় বর্ষাকালে বেহুঁস বাবাকে খগেন কলাগাছের ভেলায় চড়িয়ে একরকম গুণ টেনেই বাড়ি নিয়ে এসেছিল। সেই থেকেই সে মাটি চেনে। গাছপালা চেনে। তখন থেকেই সে খালের গেড়িগুগলিখোর হাসা কেউটেগুলো ধরতে শেখে। কিসের শেকড় বেঁটে খাওয়ালে তবে কুকুরের মুখুণ্ডী করে তাকে বোবা বানানো যায়—তাও শিখে ফেলে ঘুরে ঘুরে—জোগাড়যন্তর করে। বারুইপুরে কাছারিপাড়ার বটতলায় বসে গুণীনদের কাছেও যাতায়াত ছিল খগেনের। যৌবনেই সে একটা চেনাজানা মানুষ হয়ে যায়।

এই দ্যাখো হাজরার কাণ্ড। ওভাবে আটলে হাত দিসনি বাপ্। এই থাম। দ্যাখ তোর নিজের বাবাকে। সিঙি মাছের কাঁটা খাবে শেষকালে? তোর ছেলেমেয়ে বড় হোক। এই তোর মত—তখন যেখানে খুশি হাত দিবি। নয়ত কোথায় হাত পোড়ায়ে বসবি। সামলাবে কে? তোদের রাঙা মাকে মনে নেই। কেঁদে কেঁদেই মেয়েটা মরে গেল। বেস্পতির যা চোপা!

হাজরা তখন বছর বারো চোদ্দর ছেলে। রাখালী করে মোড়লবাড়ি। মশালে আগুন দিয়ে গর্ত দেখে দেখে খুঁচিয়ে শেয়াল বের করে। তখন ওদের রাঙা মায়ের সঙ্গে খগেনের ভাব হয়। গরুর সূতিকা সারাতে গিয়ে খেয়াদা গাঁয়ে এক উঠোন লোকের সামনে বেধবা মেয়েমানুষটাকে সে দেখেছিল প্রথম। গড়ন-পেটন আলাদা ধাঁচের।

দ্বিতীয়বার দেখা হয় আরও পরে। তখন বেধবাটি তাগড়া যুবতী। তার বাপ বড়-মোড়ল গত। হিন্দু আইন পাশ হয়ে গিয়ে বাপের সম্পত্তির ভাগ পেয়েছে বেধবাটি। খগেনের বসতবাড়ির গায়েই জায়গা জমি।

রোয়ার সময় রাখালের মাথায় চাষীদের পান্তার ডেগ বসিয়ে আল ধরে ধরে হেঁটে আসত বেধবাটি। খগেন তার কাছে মজুরি খেটেছে। নগদ দু'টাকা আর একবেলা পান্তা। তখন বেধবার নাম সবাই জানে। জানারও কথা। এক দাগে বিশ-বাইশ বিঘে জমি থোক করে একাই রুয়ে দেয়—পাকলে একাই ধান তোলে—এমন মেয়েছেলের নাম তো আর চাপা থাকে না। কনক মণ্ডল। একবার খগেনকে দিয়ে খাজনা দিতে পাঠিয়েছিল। তহশীলদারের কাছে দাখিলা কাটতে দেখেছিল—খাতায় লেখা রয়েছে—বেওয়া—কনক মণ্ডল—জওজে ৺আশু মণ্ডল।

কনক দিনে দিনে জমিতে আসত। দিনে দিনে গো-গাড়িতে ধান বোঝাই করে ফিরত। এক সন খগেনের উঠোনেই খামার করল। ধান ঝাড়ালো সাত দিন ধরে। বেস্পতি দাওয়ায় আসন পেতে দিত। খগেন চোরা দৃষ্টিতে ফিরে ফিরে দেখত। তার মাটির দাওয়া আলো হয়ে আছে।

সেবারে ধানকাটার পর কনক লোক লাগিয়ে ঘর বানালো সাতদিনে। মুখে বলল, জমির গায়েই খামারবাড়ি ভালো। ধান ঝাড়ার জায়গা হল। ইচ্ছে হলে ধান চৌকি দিতে এসে থাকা যাবে।

বেস্পতির দৃষ্টি আস্তে আস্তে কঠিন হল। খগেন ততদিনে কনকের ভাগচাষী। এক দাগে তিন বিঘে চাষ করে। জমিদার—বেওয়া কনক মোড়ল। বাপের বাড়ির পাট তুলে দিয়ে কনক তখন খগেনদের পুকুরপাড়ে চাষবাড়িতে পাকাপাকি এসে উঠেছে। বেস্পতি আর রেখে ঢেকে কথা কয় না। হোক না জমিদার। ভাগচাষীর জন্যে এত আদিখ্যেতা কেন। ফারসা রঙে এত কুবুদ্ধি।

রোদ পড়লে বেস্পতি বাদায় গরু নিয়ে যায় বেলাবেলি। ধু ধু মাঠে উঁচুমত আলে পাচন হাতে বসে থাকত। মাঝে মাঝে কপালে হাত দিয়ে এমন করেই বসে থাকত—দূর থেকে দেখে খগেনের মনে হত—ফাঁকা মাঠের মাঝখানে বসে বেস্পতি তার নিজের ভাগ্যকেই দোষ দিচ্ছে। গরুগুলো তখন শুকনো বাদায় ঘাস খুটে খুটে ফিরছিল।

গোড়ায় গোড়ায় এসেই কনক হাজরা, বজরা, ঘটিকে বশ করে ফেলে। ওরাই কনককে রাঙা-মা বলে ডাকতে শুরু করে। ঘটির হাত দিয়ে খগেন খেতে বসলে কনক তার নিরিমিষি রান্না এটা ওটা বাটি ভরে পাঠিয়ে দিত।

বেশি করেই পাঠাতো। সে তো আর কোনদিন একদম হেলে চাষার ঘর করেনি। বাপের অবস্থা ভাল। স্বামীর ঘর বেশি দিন করেনি। যতদিন ছিল আদরেই ছিল। বাপ গত হতে শরিকানী কোঠাবাড়িতে আর মন টিঁকলো না কনকের। চাষের জায়গার কাছাকাছি থাকবে বলে একদম জমির গায়েই ঘর তুললো। ততদিনে খগেন তার ভাগচাষী হয়ে গেছে। ছিল দিন খাটুনির ফুরোনে মজুর।

বিড়িটা ফেলে দিয়ে জলে নামল খগেন। ওভাবে আটলে হাত দিসনে হাজরা। বৈশাখের পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় যেন সূর্যের একটা তাপ থাকে। জলে নেমে খগেন শীতল হল। কে আসেনি আজ খালে। বেস্পতি আসেনি। বজরা আসেনি। সে আর কোনদিন আসবে না—হাজরাদের রাঙা-মা।

বেস্পতি এমনিতেই দোবেলা তার মরণ চাইত। মুখে বলত, ফারসা মানুষির মনে যত কুবুদ্ধি থাকে। ফারসা মানুষটা তখন শুকোতে শুরু করেছে। সন্ধ্যে হলে কাঁদতে বসত। খগেন সবার সামনে তার ছেলেদের মতই রাঙা মা বলে ডাকত। একদিন শুধু কনক বলে ডেকেছিল। শুধু একদিন। সেদিন কনক কোন সাড়া দেয় নি। আলে ঘুরে দাঁড়িয়ে আস্তে বলেছিল—'হু।' তারপর মাথায় থানের ঘোমটা আরো টেনে দেয়। লোক খাটাচ্ছিল। ধান গাছের গোড়া ঘেটে দিচ্ছিল থোক করে। তখন সে কনকের পুরনো ভাগচাষী। কনকের কচি লাউডগার ঝোল না হলে ভাত উঠত না মুখে একসময়। খগেন নিজের হাতে কঞ্চির মাচান বানিয়ে তাতে ডগানো লাউ গাছ তুলে দিয়েছিল। তাই নিয়ে বেস্পতির কত চোপা।

আটলে হাত দিতে দিতে খগেন বিড় বিড় করে বলল, তা আমি কি করব। আমার মালিকের আদেশ। জমিদার অর্ডার দিলি আনতে হবে না? উরি! ব্বাস! ও হাজরা—আমি ভাবলাম—বড় পাকাল মাছ বুঝি—সরে যা—সরে যা—

বলতে বলতে খগেন এক দৌড়ে খাল পাড়ে উঠেই মাথার ওপরেই হাতের মাছটা ঘোরাতে লাগল। ধরিছিরে! ধরিছি বাপ। তোরা উপরি উঠি আয়। দ্যাখসে কি ধরিছি।

ঘুরোনের শেষে হাতের জিনিসটা খালপাড়ে নামিয়ে দিল খগেন। পাঁচ ছ' হাত লম্বা সাপ। ঘুন্নি খেয়ে সাপটা মাটিতে পড়েই বেঁকেচুরে পালাতে

পারছিল না। ঘাস উঠে যাওয়া শাদা খাল পাড়। জ্যোৎস্নায় মট মট করছিল। হাজরা, পঙ্কা, ঘটি—সবাই কাদা পায়ে উঠে এসেছে। সাপটা মাথা তুলতেই ঘটি চিনে ফেলল। কেউটে। দাঁড়া বাপ। এট্টা বাঁশ চাই।

খগেন তার ছোট ব্যাটাকে থামালো। বসে থাক ঘটি। জখম চামড়া কেউ নেবে না শেষে। আরেক ঘুন্নি দিয়ে ছালটা খুলে নেব। দেখিস তখন।

এ-তল্লাটে এখন গোসাপ, কেউটে, দাঁড়াসের চামড়া কিনতে লোক আসে। জখম চামড়ার দর নেই। কবিরাজ, গোবদ্যিরা বিষও কেনে। দু'চারবার খগেন বিক্রি করে এসেছে কাছারি বাজারে।

কেউটেটা মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। শরীরখানা আগাগোড়া বাঁকাচোরা করে তবে না ঝাঁকুনি দিয়ে সাপ এগোয়। সে শক্তি এখন কোথায়! উঠিসনে এখন বাবু। ব্যথা পাবি। দাঁড়া। দাঁড়া। খগেন হাসছিল। ভেতরটা এখন জল হয়ে গেছে ওনার। এমন ঘুন্নি দেলাম এট্টা। এখন খানিকক্ষণ শুয়ে থাকো দিনি। মাথা তুলতি হবে না। তুললিই ঘোরাবো।

কে আসেনি এখনো। বেস্পতি দাসী। জওজে খগেন নস্কর। গ্রাম চন্দনেশ্বর। থানা ঘাটগাছি। জিলা—২৪ পং।

বেস্পতি এখন দুধের কেড়ে থেকে বামুন-কায়েত পাড়ায় দুধ ঢেলে দিচ্ছে। বাজে জল কোনদিন মেশাবে না। কাঠের পুলের গায়ে টিউকল থেকে নিজির হাতে পাম্প করে জল মিশোবে। তিনবার পাম্প করলি তিনপো বেড়ে গেল।

তার কি সংসারে কেউ নেই। কেউ থাকবে না। জিরোবার সময় একঘটি জল গড়িয়ে দেবে না কেউ। তেষ্টার সময় সেই সঙ্গে খানিকটা গুড়। কনক বড় বেশি গুড় দিত চাটনিতে। একবার তাকে বলেছিল—হাজরার বাপ—আমায় একদিন নতুন পুকুরের মেলায় নে যাবে?

কেন? সেখানে কি!

এক ঘটি জল দেব পুকুরে।

কি চাইবেন রাঙা মা?

আমার কোন সাধ নেই। এমনি। বেওয়া মানুষের কোন সাধ থাকে!

তবু বলেন—

বেশ। একখানা মঠ কিনি দিও।

ব্যাস্। আর কিছু না! আপনি আমাদের মালিক। বাতাসার মঠ! ব্যাস্। আর কিছু না।

আবার কি। কিনি দিও। ঘটি খেতে চেয়েছিল।

শেষ দিকে ফারসা মেয়েমানুষটা তাকে আর নাম ধরে ডাকত না। হাজরার বাপ—নয়ত ঘটির বাপ বলে ডাকত। বেস্পতির চোপায় ওদের উঠোন মাড়াতো না। ডাক্তার বদ্যি বিশেষ ডাকতে হল না।

শরীরটা ভালবাসি না ঘটির বাপ! অঞ্চল প্রধানরি ডাকাও দিনি একবার—

সে কি আজকাল জ্বরও দেখে—

ডাকো না একবার—

শশী বিশ্বাস আসতেই বিছানায় উঠে বসেছিল কনক। একখানা ডেমি কাগজ আনান। আর দেড় টাকার স্ট্যাম্প। অতুল মুহুরি এল। বাজারে তুলসীর দোকানে সবই পাওয়া যায় ডবল দামে।

সাক্ষী দু'জন। অতুল আর শশী বিশ্বাস।

দুপুর বেলার রোদ্দুরে বসে দানপত্র লেখা হল।

আমি বেওয়া কনক মণ্ডল—জওজে ৺আশু মণ্ডল সজ্ঞানে—

ঘটির নামে দানপত্র।

বাদা থেকে সন্ধ্যে করে গরু নিয়ে ফিরেই বেস্পতি তিড়িং করে ক্ষেপে গেল। যত আদিখ্যেতা। আবার আড়াল আবডাল কেন? বেটার বাপের নামেই তুই দিবি—এই তো তোর মনের ইচ্ছে। তবে লাজলজ্জা এত কেন!

সেই থেকে রাঙা মায়ের খামারবাড়ি খা খা করছে। পড়ে আছে। উঠোনে বুনো পায়রা বসে পেয়ারাতলায়। লোকজন ঢোকে না।

বেস্পতি কোনদিন কাউকে ঢুকতে দেয়নি। এখন শুধু সাপ ঢোকে। বেরোয়। খেলা করে। ঢেঁকি-ঘরটা গত বর্ষায় পড়ে গেল। কেউ দেওয়াল তুলে দেওয়ার কথাও বলে না। সবুজ শ্যাওলায় বাঁশের খুঁটিগুলো ছায়ার ভেতর কালো কালো দেখায়। ঘটির নামে খামারবাড়িতে এখন জঙ্গল।

সাপটা এবার মাথা তুলতেই খড়ম জোড়া ঠক করে উঠল পঞ্চাননের

হাতের টর্চের আলোয়। খগেন আবার এক পাক দিয়ে কেউটেটাকে মুখের কাছে নিয়ে এল। মাথা তোলো বাবু। একবার তোলো দিনি বাবু। সাহেব না মেম—যাচাই হয়ে যাক।

হাজরা বলল, শ্যামল বাঙালরে দেখা বাপ। বারণ্ডায় খেতে বসলেন। নে যা ওখানে—

অসাড় কেউটেটাকে খুঁচিয়েও চাঙ্গা করা যাচ্ছিল না। পুরো দলটা জোর কদমে শ্যামল বাঙালের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। পঞ্চানন উত্তেজনায় টর্চ নেভাতে ভুলে গেছে। মাছ ধরার শেষে কাদা ধুয়ে সাফ করে নেবার সময় কিংবা আটলে লটকানো কুচোকাচা বেছে নিতে টর্চের আলোর বড় দরকার লাগে। এখন সে-আলো জ্যোৎস্নায় একদম ফিকে মেরে যাওয়ার দশা।

শ্যামল বাঙালের বাড়ির পেছন দিকটাতেই যত মজা। ধানঝাড়ার বাঁধানো চাতাল। শান বাঁধানো পুকুরঘাট। তার দু' ধারে কদমগাছ বসিয়েছে বাঙাল। আরেকটু গরম বাড়লে হারমোনি নিয়ে বসে গাইবে। গান ধরার আগে অনেকক্ষণ ধরে হারমোনিটা বাজায়। বাদার ভেতর দিয়ে পঞ্চাদের গাঁ অবধি তার স্বর ভেসে আসে। ফাঁকা বারান্দায় শ্যামল বাঙালের রাখিতো মেয়েছেলেটি তখন গান ধরে কোন কোনদিন। বর্ষায় কদম ফুটে থাকে দু'টি গাছেই। থোকা থোকা।

বাঙাল খেতে বসেছে। মেয়েছেলেটি ইলেকট্রিকের আলোর নিচে ঝক ঝক করছিল। তাই মনে হচ্ছিল খগেনের। তাদের পা ভর্তি কাদা। খালি গা। খগেনের ডান হাতে ঢলে পড়া কেউটে।

কি ব্যাপার—

কিছু না বলে খগেন হাতের অসাড় কেউটেটাকে তেল তেল মেঝের উপর ছেড়ে দিল। মাজা মেঝে। লাল রঙের। তার ওপর কালচে কেউটেটা কোনক্রমে একটুখানি মাথা তুলল। হাঁপাতে হাঁপাতে জিভ বের করছিল। আবার ভেতরে নিয়ে নিচ্ছিল। তার বাকি সারাটা শরীর একদম ন্যাতানো।

শ্যামল বাঙাল ঝকঝকে থালায় ফুলকো লুচি ক্ষীর দিয়ে চার ভাঁজ করে মুখে দিচ্ছিল। জল খেল। কি ব্যাপার—

ততক্ষণে কেউটেটা একটু মাথা তুলতেই 'মাগো' বলে মেয়েছেলেটি ছুটে

ঘরে গেল। যাবার সময় তার নাকছাবির লম্বা প্যাঁচটুকু আলোয় ঝিলিক দিল। পঞ্চানন বুঝলো, এবারের আমদানি গতবারের চেয়ে সরেস। এ বাড়িতে সনে সনে আমদানি হয়। হবে না কেন। সবজি চাষের বাগানবাড়ি। দু'টি জলছেচা মেশিন। তিনখানা মোষের হাল। ফি-সনে মেয়েছেলে বদলে রাখে বাঙাল। খুব ভয় পেয়েছিল গোড়ায়—এবার জলপাত্রটি বারান্দায় বেরিয়ে এল। ধরলে কি করে? ভয় করে না—

খগেন হাসল। খুব সোজা। দিনির আলোয় চোখে চোখে রাখি। তখন মা মাথাটা ধরি আগে। এখানে থেমে খগেন একবার কেউটেটাকে দেখল। লাল মেঝেতে কালো মাথাটা একটুখানি তুলেছে। কালো জিভ বেরিয়ে আসছে। আবার ভেতরে নিয়ে নিচ্ছে। শ্যামল বাঙাল আবার বলল, কি ব্যাপার—

খগেন তখনো জলপাত্রকেই বোঝাচ্ছিল। আঁধার হলি মা আমরা যেখানটা পাই—ধরেই ঘুন্নি দিই। সারা গা অবশ হয়ে যায়। মাথা তুলতি পারে না।

সাপটা বেচে দে। পয়সা পাবি। নয়ত পোষনিতে রাখ—অমাবস্যা, পুর্ণিমেয় বিষ তুলে বেচবি। একটা রোজগারের পথও হবে—হাত-ব্যাগটা দাও তো—

মেয়েছেলেটি ভেতর থেকে একটা কালো ব্যাগ এনে চেন খুলে ধরল। বাঙাল তার ভেতরে বাঁ-হাত ঢুকিয়ে একটা দু'টাকার নোট তুলে মেঝের ওপর রাখল। মাছ তুলবি কখন?

তা ভোর হয়ে যাবে বাবু—

দেখিয়ে তবে বাজারে নিবি কিন্তু।

আপনার ভাগা ঠিক থাকবে।

মেয়েছেলেটি বলল, মৌরলা পড়লে দিও কিন্তু।

তা আর জানিনে মা! আপনার কিসি স্বাদ—

বকশিসের নোটখানা কোমরে গুঁজে ন্যাতানো সাপটা হাতে তুলে নিল খগেন।

মাদী না মদ্দা? দেখিসনি—

খগেন আলোয় তুলে ধরতেই কেউটেটা মাথা তুলল। সবে বোধ হয় সাড় ফিরে আসছিল। টর্চ মার—

পঞ্চার টর্চের আলোয় যশার নিচের বুকটা দেখেই খগেন চেঁচিয়ে উঠল—হাম্বা কেউটে বাবু।

সে কি জিনিসরে?

মন্দা। সাহেব!

ওর মেয়টা কোথায় দেখিস্ তো। আরও দুটো টাকা পাবি।

তক্কে তক্কে তিনিও এখন মাছ খেতি আসবেন—

সে কোথায়? বলতে বলতে মেয়েছেলেটির নাকছাবি দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে খগেনের ঝক করে মনে পড়ল, কে আসেনি। বেস্পতি এখন খালি কেড়েটি মাথার ওপরের বিড়েয় বসিয়ে পাকাপোক্ত দুধওয়ালীর ধারায় ঘরে ফিরছে। ছাতার পাখির স্বভাব। গড়নও সেরকম। ছোটো-খাটো। শক্তসমর্থ। বিশ সন এক চেহারা। তার কোন কাজে বেস্পতি নেই।

যখন কোথাও কাজ থাকে না—মজুরি নেই—তখন খগেন আগান বাগান, বনবাদাড় ঘুরে কাজ জোগাড় করে। গেরস্থ-বাড়ি গিয়ে উঠতি নারকেল গাছের মাথা চেঁছে পরিষ্কার করে। ফল পাকুড় গাছের গোড়া খুশে দেয়। কিংবা কারও গরু নয়ত পোষা কুকুরকে বানখাওয়া বোবা অবস্থা থেকে কাটান দিয়ে গলায় আওয়াজ আনায়। গরু আবার হাম্বা ডাকে। কুকুর ঘেউ ঘেউ। তাতে চার ছ'পয়সা হয়। নয়ত নয়। যখন আর কিছু থাকে না—তখন খালের মাছ। কিংবা খেজুরপাতা কেটে নিয়ে খোলপে বুনতে বসে।

ওনার জুড়ি কেউটেটাকে খুঁজে পাবি কি আর—

তিনি একবার অন্তত ইদিকে আসবেন বাবু। বলতে বলতেই খগেন এক রকম সবাইকে তাড়িয়ে নিয় খালে নামল। সাবধানে পা দিবি বাবারা। খুব সাবধানে—খু-উ-ব—

আকাশে চাঁদ একখানিই মোটে। গোল। হলুদবর্ণ। ছায়ায় আলোয় বনঝালের জঙ্গলটা নানা রঙ ধরছিল। তারই মধ্যে একখানা মেঘ উঠে এসে সবার সামনে সরাসরি জ্যোৎস্নাটুকু ঢেকে ফেলল।

ঠিক তখনই আটল থেকে দূরে—বেশ দূরে জলের ওপরে খালপাড়ের গা ধরে ধরে খগেন নস্কর এগোতে লাগল। কে কোথায় বোঝার উপায় নেই। ঘটি, হাজরা, পঞ্চানন গোড়ালি-জলে মাটি চেপে চেপে এগোচ্ছিল। পাঁকাল,

গুলে, রয়না—যা পড়ছে—আচ্ছা করে চেপে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে—আর কোমরের কাপড়ের ভাঁজে গুঁজে দিচ্ছে। পরে খালপাড়ে উঠে হিসেব করে দেখবে। কার ক'টা হল। কি হল।

তারই ভেতর খগেন ছপ ছপ করে ঠিক উল্টো দিকে এগোচ্ছিল। কাঁটাঝোপ, খড়খড়ে এঁটেল মাটির কাঁকুড়ে দানা সামলে সামলে এগোতে হচ্ছিল। কে আসেনি। বজরা। সে তার কাটে। আর আসেনি বেস্পতি। একদম ছাতার পাখি। বিশ সন পরেও একই রকম। সরু কোমর। গড়ন-পেটন ভালই। ছোটোখাটো। এতক্ষণে ঘরে ফিরে গিয়ে দাওয়ায় বসেছে। নিজের গরুদের নিজেই চরায়। বাদায় কুটি কুটি ঘাস। তখন মাঠের মাঝখানে কপালে হাত দিয়ে বসে থাকে।

কোথায় গেলিরে বাবা জুড়ির মেম। এইবেলা বেরিয়ে আয়। একটা ঘুন্নি শুধু। দু' দুটো টাকা হাতব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসবে। নাকছাবি। কাঁটাঝোপে হাত লাগল বুঝি। উঃ! বলে হাত সরিয়ে নিতে নিতেই টাল সামলাতে হল। পা পিছলে যাচ্ছিল জলে। খালপাড়ের গায়ে গায়ে গর্ত। এখানেই ছানাপোনা নিয়ে বাস। ডিম থাকে গর্তের একদম নিচি। তার ওপর জুড়ির সাহেব মেম বিড়ে পাকিয়ে সারাটা শীতকাল পড়ে থাকবে। নড়নচড়ন বন্ধ। শেকড়বাকড় নিয়ে অনেক দিনের ঘাটাঘাটি খগেনের। তাতেই সব জানাশুনো। তারই বসতবাড়ির গায়ে ভেঙে পড়া খামারবাড়িতে কত যে লতাপাতা—কত যে শেকড়বাকড়। দুপুরের দিকি বুনো পায়রা উঠোনে নামে। বেস্পতি একদিনের জন্যেও ঢুকতে দেয়নি তাদের। এইত সেদিন দুপুরের রোদে বসে অতুল মুহুরি ডেমি কাগজে দানপত্র লিখল। তারপর দুদিন না যেতেই ঢেঁকিঘরের দেওয়ালটা ভেঙে পড়েছে। কেউ আর তুলে দেয়নি।

কে আসেনি। এইবেলা আরেকবার খালপাড়ের গর্তগুলো হাতের চেটোয় ঘষতে ঘষতে খগেন আরেকবার হাঁক দিল, ও জুড়ির মেম গো।

কালকেপুরের রেল পুকুর

ষোল পাউণ্ডের ছুশো ফুট নাইলন কর্ড, আধ ডজন ঝাঁড় বঁড়শি, এক কেজি পিঁপড়ের ডিম আর হরলিকসের শিশি-ভর্তি কেঁচো নিয়ে ছুলাল ভেণ্ডারদের গাড়ি পার হয়ে ছোট মত একটা কামরায় উঠল। কোণে কোচ সুদ্ধ ছিপ ছুখানা দাঁড় করিয়ে দিয়ে একটা বিড়ি বের করল, তারপর ছুমড়োয় ফুঁ দিয়ে দাঁতে চেপে ধরিয়ে ফেলল। ইঞ্জিন লাগছে।

কয়লা গাড়ি বলে ফাঁকা ফাঁকা। ঝোলার নীচেটা ভিজে ঠেকতে একে একে গামছা, বসবার আসন, কেঁচোর শিশি—অবশেষে খাবারের কৌটোটা বাইরে এনে বেঞ্চে রাখল। নাড়াচাড়ায় মুলোর তরকারির ঝোল, রুটির গোছা উপচে বেরিয়ে পড়েছে। তিন মাসের ছেলেটাকে শেষ রাতে ছুধ দিয়ে ইন্দু রান্না করেছে। কোটাকুটি বিকেলে সেরে রেখেছিল। বড় ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ার আগে তিন সত্যি দিয়ে ছুলালের কাছ থেকে কথা আদায় করেছে, ভোরে তাকে নিয়ে মাছ ধরতে যাবে।

ছুলালকে বিকেল থাকতে ফিরতে বলে ইন্দু রাখুকে বোঝাবার চেষ্টা কম করেনি। রুই পড়লে রুইয়ের মাথা, কাতলা পড়লে বড় দাগাখানা তাকেই ভেজে দেওয়া হবে। রাখু মাছের অত ধার ধারেনা। কাল বিকেলটা বাপের সঙ্গে গোল্লা গোল্লা চার বানাতে এটা ওটা জুগিয়েছে। শেষরাতে বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় ফেলে আসতে হয়েছে। ছ'বছরের রাখু আজকাল ছুলালের আধ খানারও বেশী লম্বা। ন্যাড়া মাথায় এমন ঘুমিয়ে ছিল—জগতের কিছু জানে না।

বেরোবার আগে ছু'বার ডেকেছিল, 'বাবু মশায়—বাবু মশায়—' রুটি সুদ্ধ তরকারি কৌটোতে ঠেসে ঢুকোতে গিয়ে ইন্দু উঠে এসেছিল, 'কি হচ্ছে? আদরের ঝোঁকে ছু'ভাইকেই জাগিয়ে বসবে—'

'কাল ঘুমোনোর আগে কথা আদায় করে নিয়েছে—ওকে মাছ ধরতে নিয়ে যাব—'

'কি এমন মস্ত লোক—কথার খেলাপ হলে বড় রাস্তায় বেরোনো বন্ধ হয়ে যাবে!'

'বাবু মশাই!' ডাকতেই রাখু পাশ ফিরল। ঘুমে চোখ একেবারে কালো হয়ে লেপ্টে আছে। এতটুকু মানুষ—সারাদিন দশ হনুমানের সমান লাফ ঝাঁপ দিয়ে বেড়ায়। দম কতদূর জানে না—এক একদিন ত সন্ধ্যে না হতেই রান্নাঘরের বারান্দায় ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ইন্দুকে আর বারণ করতে হয়নি। শ্রাবণের মেঘ—গুড় গুড় করে ডাকছে। ঝড়ে জলে রোদে ঘাটে অঘাটে এতটুকু মানুষকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি।

শেয়ালদা ছেড়ে ট্রেন কিছুটা এগিয়েছে। দরগা রোডে ভোর রাতে রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে। চরণ, হোটোর, খাস মল্লিকপুর, শাসন, ঘুটিয়ারী শরিফ এ তল্লাটের সব ষ্টেশনের রেলপুকুর দুলালের চষা হয়ে গেছে। বারুইপুরে মুখুজ্যেদের রথতলার পুকুরে টিকিট আট টাকা আজকাল। সারাদিন বসলে বিঘত দেড়েকের সাত আটটা কাতলা পড়ে বড় জোর। দুলাল কুচোকাঁচা জলেরটা জলেই ছেড়ে দেয়। কম বয়সে চাম্পাহাটির রেল পুকুরে ছিপ ধরেছে। একবার আন্দাজে বাইশ সেরি একটা কাতলা ধরে ফেলেছিল।

বড়রা দুপুরে খেতে যাওয়ার সময় ছিপ দেখতে বলে গিয়েছিল। ফোঁস ফোঁস করে একটা ভিজে ইঞ্জিন চলে গেল। জোড়া ছিপ বসানো, ফাৎনা দুটোরই চার ঠুকরে খেয়ে গেল। চৌকির নীচে কচি বোলতার ডিম ছিল। একটা ছিপে খানিকটা গেঁথে বসাতেই ঠোকর—সঙ্গে সঙ্গে টান, বেঁধে গেল। জানা ছিল বলে সুতো ছেড়েই গেল গোড়ার দিকে। মাছটা আঘাটা দেখে কোমর জলে দম ফুরিয়ে শুয়ে পড়েছে। সবাই এসে যেতে ধরাধরি করে তোলা হল। বুড়ো কাতল—ওপরে চামড়া পুরু ত্রিপল হয়ে গেছে। রিক্সা করে চিনের মোড় অব্দি ঘুরিয়ে আনা হয়েছিল।

কাতলার মাথা মোটা—বুদ্ধিও তেমনি। একবার ধরা পড়লে তুলে আনা কঠিন না। বঁড়শি গেঁথে গেলে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

খানদানি দশ বিশ সেরি রুই বঁড়শি গিলেও মাথা ঠাণ্ডা রাখে। বিপদ বুঝলে সোজা গিয়ে পুকুরের বুকে শুয়ে পড়বে। মাথা সরু। মৃগেল একদম

খামখেয়ালি, সখ হল ত জোড়া বঁড়শি গিলে বসে থাকবে। পাড়ে উঠে ছটফটানি। কতবার লেজে ঝটফটানি তুলে দুলালের হাত থেকে লাফিয়ে মাঝপুকুরে গিয়ে পড়েছে। এই মাছগুলো সর্বনেশে। ফিরে গিয়ে সবাইকে সাবধান করে দেয়।

গেল দু'হপ্তায় দু'দিন জোর বৃষ্টি হয়েছে। লাইনের দু'পাশের জমি যতদূর দেখা যায় একেবারে নদী। কাছে পিঠের কমজোরি পাড়ের পুকুর সব একাকার হয়ে গেছে। কোথাও কচি বাঁশ পুঁতে মাছ আটকাবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তাতে আটকাবে! এই জলে উঁচু নীচু বুঝে হাত ডুবিয়ে মাটি চেপে এগোলে কই মাছ ধরা যায়। একটা পেলে ঝাঁকের দেখা কাছেই পাওয়া যাবে। মাছগুলো দল পাকিয়ে ঘোরে। উঁচু জায়গা পেলে মাটি ঘষে ঘষে ওপরে ওঠে।

চারদিক্‌কার এমন খানা খোঁদল পড়ে পড়ে নষ্ট হয়। পাড় উঁচু করে খানিক ঘিরে দিলেই দিব্যি পুকুর। তবে, গোল হলে চলবে না—লম্বাটেই সরেস। তাহলে ছানা পোনা নিয়ে মাছগুলো হুটোপাটি করে বেড়াতে পারবে। বেড়ালে লম্বা হবে। তেলে ডিমে ফেঁপে উঠবে।

সারা হপ্তা দুলাল ডেসপ্যাচার। শনিবার হলে বড়বাবু থেকে অফিসের মেজ ছোট সবাই একবার খবর করে যায়। মাছের যা বাজার! সোমবার আধবেলা কেটে যায় তত্ত্ব-তাবাসে। কি মাছ পড়েছিল—ক' সেরি—এসব বলতেই, বকেয়া কাগজপত্তরে টেবিল পাহাড় হয়ে ওঠে। তবু দুলালের মন্দ লাগে না। ডালহৌসী পাড়ায় কিছুক্ষণ জলে ভেজা লম্বা লম্বা ঘাস গজায়, পেড়ি শ্যাওলায় নিস্তরঙ্গ ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

রেল লাইনের পাশাপাশি পিচ রাস্তা ধরে বড় বড় বাস কলকাতা দৌড়োদৌড়ি করে। তারই পাশে বেগমপুর, সীতাকুণ্ডুর মাঝে একটা হলদে জলের পুকুর পাড়ে। মাটি কেটে নিয়ে দত্তরা ভিটে উঁচু করেছিল—সেখানে জল জমে জমে পুকুর। বড় বড় মাছ আছে—কিন্তু স্বাদ নেই। জলের চেহারা দেখে কিন্তু বোঝার সাধ্য নেই। মনে হবে পানা-শ্যাওলার আড়ৎ। দু'চার ঝাঁক শোল টাকি থাকতে পারে। মাছের খবর পেয়ে দত্তরা কার্তিক মাসেই খেপলা জাল ফেলে পুকুর ছেঁকে সব মাছ ওদেরই বিষেণপুরের মাঠপুকুরে সরিয়ে দিয়েছে। দশ টাকা পাঁচ আনা টিকিট। সেখানে ছিপে ছিপে মোচ্ছব পড়ে গেছে। দুলাল জেনে শুনে অমন মাটি মাটি স্বাদের

মাছ ধরতে দশ দশটা টাকা জলে ফেলতে পারে না।

তার চেয়ে কালকেপুরের রেল পুকুর তার পছন্দ। গতবার থেকেই রেলের এই বরো পিট সে টেকে রেখেছে। খালের মত লম্বা—চওড়াও কম নয়, ইঞ্জিনের জন্যে মোটা নলে জল টেনে বয়লার ঘর সাফাই হয়—তারপর পাম্প করে ওভারব্রীজের চেয়েও উঁচুতে নম্বর লেখা সব চৌবাচ্চায় জল উঠিয়ে রাখা হয়—ইঞ্জিনরা খাবে।

পুকুরটা হঠাৎ তার নজরে ধরে। কিছুর মধ্যে কিছু না—গত ফাল্গুনে ইন্দুর সঙ্গে রাখুকে জাগুলের বাসে মামাবাড়ি পাঠিয়ে দুলাল দেখল, অফিস যাওয়ার আর সময় নেই। ফিরতি পথে একা একা শেয়ালদার ট্রেনে উঠে বসল। কালকেপুরে ট্রেন থামতে টিকিট ঘর, মাষ্টার বাবুর কোয়ার্টার। রিক্সার আড্ডা মায় বাউণ্ডারি বাঁধ ঘেঁষে টলটলে জল দেখে এত ভাল লাগল—গার্ডসাহেবের বাঁশি শুনেই নেমে পড়ল।

এক বুড়ো তার দুই নাতির সঙ্গে ছিপ ফেলে বসে আছে। মাষ্টার বাবুর ছেলের পৈতে। পাশেই তাই জাল পড়েছে। শামুক, গেঁড়ি, বেলে মাছের সঙ্গে কিছু কিছু চিংড়ি পোনাও উঠেছে—কিন্তু বড় মাছের দেখা নেই।

একদল লোক এনামেলের ডেগ বাঁকে চাপিয়ে প্লাটফর্মে এসে বসল। তারপর গামছা ঢাকা দেওয়া ডেগের ভেতর হাত ডুবিয়ে চাপড়াতে লাগল। মাছের বাচ্চা ছাড়তে চলেছে কোথাও। একজন উঠে এসে মুঠোখানেক মরা মাছের কুচি ফেলে দিয়ে গেল।

ধেনো মাঠের কোনাকুনি একখানা মেঘ উঠে চারদিকে ছায়া ফেলল। বুড়োর বড় নাতির সঙ্গে ভাব করে দুলাল কখন তার পাশে বসে গেছে। এবারে ফাৎনা নড়তেই ছিপ ধরে টান দিল। জলের ভেতর সুতো সুদ্ধ বঁড়শি যেন কেঁপে কেঁপে কাগজ কেটে উঠে এল। মাছ পড়েনি।

যা পড়েছে—তা চেপে গেল দুলাল। আধুলি সাইজের একখানা আঁশ বঁড়শিতে বেঁধে উঠে এসেছে। তাহলে মাছটা কত বড়! কতগুলো আছে! ভাবতেই দুলাল চমকে উঠেছিল। অথচ পুকুরটা দেখতে এমন বোকাসোকা। কারও নজরে পড়েনি। বুড়োর চোখ ফাঁকি দিয়ে আঁশখানা বুক পকেটে তুলে রেখে দিল।

এসব মাছের জন্য ভাল চার চাই, ময়ুর পেখমের ফাৎনা চাই—আর চাই বেশি পাউণ্ডের নাইলন কর্ড। সেদিনই পুকুরটার ভবিষ্যৎ আছে বুঝতে

পেরেছিল। ডাউন দিতে পুরো দলটা হাঁড়ির ভেতর হাতথাবড়ানি থামিয়ে বাঁক কাঁধে উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘন্টিওয়ালা কোত্থেকে এসে সামনে যেক'টা হাঁড়ি পেল, তার ভেতরে হাত ডুবিয়ে রুই কাতলার কুচি কয়েক মুঠো তুলে নিয়ে পুকুরে ছুড়ে দিল। বোঝাই যায়, প্রায়ই এমন ছোঁড়ে। কয়লাঘাট অফিসে তার মত কয়েক জন মেছো পার্টি আছে। খবরটা তাদের কাছে আর চাউর না করে এই বর্ষা অব্দি চেপে রেখেছে।

আজ সন্ধ্যে দিয়ে ইন্দু হ্যারিকেন হাতে সিঁড়িতে এসে দাঁড়াবে। দুলালের গলা পেয়ে রাখু ভারি ঝোলায় হাত দিতে গেলে তাকে সরিয়ে দেবে, 'আগে ছিপগুলো রাখ—দেখিস বাবা, গায়ে যেন কোঁচ না বিঁধে যায়।' ইন্দু এসে রাখুকে সরিয়ে ঝোলাটা তুলে নিয়ে যাবে, 'বিরক্ত করো না, গরম জলটা এগিয়ে দাও তো বাবাকে—'

মাছের মাথাগুলো তখন উঁকি দিয়ে অজানা জায়গায় হ্যারিকেন দেখবে। কতকগুলো মাছ থাকে ভীষণ দুর্দান্ত। ডাঙ্গায় উঠেও লাফিয়ে গিয়ে জলে পড়ে—তখন হয়ত টানাহ্যাঁচড়ায় রক্তে কানকো ভাসছে। কাল সকালেই মাঝপুকুরে ফুলে ঢোল হয়ে ভেসে উঠবে। দুপুর নাগাদ চিল তার ওপর চক্কর দিয়ে পাক খাবে। আর আছে কিছু সাহসী রুই, পাকা শোল। চার ঠোকরানোর আগে তারা একেবারে পাড়ের কাছে দেখতে আসে—শিকারীটি কে বটে। এদের জন্যেই কোঁচ—লম্বাটে কাঠের মুগুরের ভোঁতা জায়গায় মোটা মোটা ছুঁচলো শিক বসানো, ছুঁড়ে মারলে নির্ঘাৎ ল্যাজামুড়ো জুড়ে গেঁথে বসবে। ছিপের সঙ্গে কোঁচটাও শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে আনতে হয়েছে। আর এনেছে একখানা হাত-দা।

ফিকে অন্ধকারে ট্রেনটা দুলালকে প্লাটফর্মে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। রেল পুকুরের গা ঘেঁষে ইটখোলার পোড়ো দ' সব জলে বোঝাই হয়ে পড়ে আছে। এগুলো ভয়ানক জিনিস। তারের বেড়া টপকে তার সাধের পুকুরে নেমে এল দুলাল।

জিনিসপত্র নামিয়ে চারদিক তাকালো। এখনও ভোর হয়নি। এইবেলা সব গুছিয়ে ফেলতে হবে। বাউণ্ডারি বাঁধের পাশেই খালপাড়। সেখানে পোড়ো ইটখোলার মাঝে বাতিল ইটের লাট ঝড়ে জলে রোদে প্রায় মাটির ঢিবি হয়ে পড়েছে—আর সে জায়গাটা অন্ধকারও ভীষণ—সেখান থেকেই

ভীষণ এক পোড়ো দ'। কত জল কে জানে।

রাখুর মামাবাড়ি জাগুলের মিস্তির যুদ্ধের পরে মেফাক্রিন খেয়ে খেয়ে ম্যালেরিয়া তাড়ালো—কিন্তু শেষমেষ পাগল হয়ে গেল। গাঁয়ের কে বড় একটা মাছের খোঁজ পেয়ে ইটখোলার দ'য়ে টোপ ফেলেছিল। কতকালের পোড়ো কেউ তা বলতে পারে না। যেমন সুবিধে তেমন ইট কাটা হয়েছে। তাই ভেতরটা কোথাও খানা মত—আবার কোথাও সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে না হোক তিরিশ হাত জল চলে গেছে। খানিকদূর গিয়ে একেবারে কালো, ঠাণ্ডা, চাপা গন্ধ বেরোয়। ইন্দু তখন বিয়ের পর প্রথম পোয়াতি। খুকি হয়ে মারা গিয়েছিল। মাছের লোভে গাঁয়ের বাইরে একটা হুলো বেড়ালকে মেরে ভোমা বঁড়শিতে গেঁথে টোন সুতোয় মাঝ দ'য়ে ছেড়ে দেওয়া হল—সুতোর মুখ কলার ভেলায় বেঁধে ভাসিয়ে দেওয়া হল।

তিন দিনের দিন ভেলা নড়ে-চড়ে। হ্যাজাক, সড়কি, কোঁচ সব নিয়ে সারা গাঁ দ'য়ের পাড় ঘেঁষে ছুটে বেড়ালো। মাছটা কুচুটে। পাড়ে এসে কাছে পিঠে কোথায় তলিয়ে যায়। দু'খানা কোঁচ জলে তলিয়ে গেল—মাছের দেখা নেই। পাড়ের কাছে আসতেই তখন বড় মিস্তির চলন্ত ভেলায় উঠে বসেছে—তারপরেই ভেলা মাঝ দ'য়ে। কেউ কিছু বোঝার আগেই মাছটা একবার ওপর দিকে ভেসে উঠে তলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বড় মিস্তির ঝাঁপ দিল। পাগল লোক। তোলা দরকার। কিন্তু কে নাববে! ভেতরটা কেমন জানা নেই কারও—কতকালের জল, তাতে আবার রাত। পরদিন দুপুরেই বড় মিস্তির ভেসে উঠল।

খালপাড়ে অনেক জায়গায় মাটি নেই। দরকার মত যার ইচ্ছে কেটে নিয়ে গেছে। লোক চলাচল কম বলে একেবারে মাঝখানে কয়েকটা খেজুর আর বাবলার জঙ্গল। তাদেরই পাশে ফাঁকা দেখে দুটি জিওল গাছ উঠেছে। দা বের করে সাত আটখানা শক্ত মোটা ডাল কেটে ফেলল। ভোরের অন্ধকারে দায়ের কোপে গাছটা যত কাঁপছিল এক এক ঝাঁকুনিতে নালশে পিঁপড়ে দলে দলে এসে তত গায়ে পড়ছিল। আগে জানলে এতগুলো পিঁপড়ের ডিম টেনে আনত না। জিওল গাছে লাইন দেখে দেখে এগিয়ে ওদের ডিমের আড়তের খোঁজ ঠিক পেত।

চারখানা মোটা ডালের একদিক ছুঁচলো করে নিয়ে হাঁটু জলে সারা শরীরের চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল। পায়ের নীচে কতগুলো গেড়ি মুড় মুড়

করে ভেঙে নরম মাটিতে বসে গেল। চার খুটির মাথায় পা-সুদ্ধ ছোট মত জলচৌকিটা বসিয়ে দিল। তারপর চেপে দেখল—নড়ে না। আর একটা লম্বা ডাল পাশেই পুঁতে দিয়ে তার আগায় ছাতা খুলে বেঁধে দিল।

চার সাজিয়ে, ছিপ ফেলে বসতে বসতে সকাল হয়ে গেল। গুলতির মত একখানা ডাল জলচৌকির সামনে পুঁততে হয়েছে। তার ওপর ছিপ বসিয়ে দিয়েছে। বড় তিন চারখানা কচুপাতা ইটে চাপা দিয়ে তার ওপর কাগজে পিঁপড়ের ডিমগুলো উল্টেপাল্টে মেলে দিল। রোদে শুকিয়ে মুড়মুড়ে হয়ে যাওয়া দরকার। পা মুছে চৌকিতে বসতে যাবে, গামছা হাতে, ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নীচে রক্ত জলে ধুয়ে ফ্যাকাশে হয়ে আছে। সাবধানে সেখান থেকে শামুকের কুচি টেনে বের করল দুলাল। আবার রক্ত বেরিয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি জলে নামল। কাটা জায়গায় খানিকটা পেড়ি কাদা ভাল করে লাগিয়ে দিল—সাবধানে ঘাসের ওপর পা ফেলে আবার চৌকিতে উঠতে গিয়ে দেখল, হ্যাজাক বাতির নিভাঁজ ম্যাণ্টেলের মত লম্বা ফট্‌ফটে শাদা একটা খোলস পড়ে আছে। সাপের কাণ্ড। জলে ভেজা লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর থেকে অনবরত পোকা উঠছে—আশপাশে ফড়িং পাক খাচ্ছে। খালপাড় পেরিয়েই বৃষ্টির জলে চারদিক সমুদ্র হয়ে আছে। সামান্য একটু উঁচু জায়গায় গলায় দড়ি দেওয়া দুই ঘোড়া মশ মশ করে যত পারে ঘাস খাচ্ছে। এখানে এলে রাখু বসতে পারত না। আর একটু পরে রোদ চড়বে। তখন থাকলে পাগল পাগল করত। চৌকিতে ওঠার আগে পা দিয়ে খোলসটা দূরে ছুঁড়ে দিল। বাতাসে একটু উড়ে গিয়ে জলে পড়ল।

ভাজা মেথি বাটা, বোলতার কচি ডিম, কেঁচো, পিঁপড়ের নারকোলি-গুঁড়ো ডিমের চার—জলের ভেতর থেকে মাছ টেনে আনবেই। লেবেল-ক্রসিংয়ে মাছের নীলাম চলছে। আশপাশের ভেড়ি, ক্যানিং, উত্তরভাগ থেকে সব মাছ এখানে চলে এসেছে। পুলিশের ভয়ে শেষরাত থেকেই প্রায় বাজার আরম্ভ—দুলালের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার কয়েক বাবু ব্যাগ হাতে নেমেছে—যাদবপুর শেয়ালদায় হোটেল আছে হয়ত। দুলাল ঠিক করল আজ ভালরকম মাছ পড়লে রাখু যত ইচ্ছে খাবে। কোন বাধা দেবে না। ভাজা, ঝোল, পাতুড়ি, পোড়া।

রাখুকে নিয়ে একবার ইংলিশ পিকচার দেখেছিল। শহরের মেমসাহেব

নিয়ে দুই সাহেব বন্দুক কাঁধে জঙ্গলে সিংহ শিকারে এসেছিল। হাফ প্যান্ট, পিঠের ব্যাগে জিনিসপত্তর, বুক জুড়ে টোটার মালা। ডালহৌসিতে ঘড়ির নীচে বঁড়শির দোকানে গিয়ে দাঁড়ালে দাঁ-বাবুদের বড় তরফ এসে দাঁড়ায়। আগের চেয়ে বুড়ো হয়ে গেছেন। নিজেই বেছে দেন—নতুন কিছু এলে দেখান। শনিবার বিকেল থেকেই যোগাড়-যন্ত্র আরম্ভ হয়ে যায়। তখন অফিস থেকে হেঁটেই শ্যামবাজার অব্দি আসে। মালকোচা দিয়ে পরা ধুতি হাফপ্যান্টের মত টাইট হয়ে যায়। ক্যামবিশের না হয়ে বুট হলে, তখন হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে সেই মেমসাহেবের সঙ্গীদের মত গটমট আওয়াজ হত। পাঁচ মাথার মোড় ছাড়িয়ে বাসে বাড়ি আধঘণ্টাও না। ইলেকট্রিকের এলাকা দশ মিনিটে ফুরিয়ে যায়।

ময়ূরের পেখমের লোম চাকু দিয়ে তুলে ফেলে সরু সাদা ডাঁটি কেটে ভাল ভাল ফ্যাৎনা হয়েছে। বঁড়শি ঠোকরালেই কেঁপে উঠবে। ডিমের ঝাঁকা আর তাড়ির পিপে বোঝাই ট্রেনটা কলকাতা রওনা হল। গাড়ি একটু এগোয় –বুকসুদ্ধ রেলপুকুরটা কেঁপে ওঠে। অনেকখানি জুড়ে জল থিরথির করছে।

বেলা দশটা নাগাদ একটা মৃগেল উঠল। এক সেরও হবে না। মাথাসুদ্ধ মুঠ করে দূরের জলে ছুঁড়ে দিল। দু'একটা ডিমের গা দিয়ে ছানা পিঁপড়ে মাথা তুলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তেমন ডিমের অনেকগুলো বুড়ো আঙুলে একসঙ্গে টিপে গোল্লা পাকালো—পর পর বঁড়শিতে গেঁথে দূর দেখে ফেলল! দুটো ফড়িং অনেকক্ষণ জ্বালাচ্ছে। ফাঁক পেলেই ফাৎনায় এসে বসে। ছোট ছিপটা দিয়ে তাদের তাড়ালো। সেই ফাঁকে চার ফাঁক হয়ে গেছে। ঘাঘু মাছ। দুলাল এই চাইছিল। চালাক কেউ তার বঁড়শি ঠোকরাক্। একবার যাক্, দুবার যাক্—না হয় দশবার যাক্। লোভে লোভে অবশ করে ঠিক গেঁথে তুলবে।

আর এক গোল্লা পিঁপড়ের ডিম গেঁথে বসে থাকতে হল অনেকক্ষণ। আর আসে না। মাঝে মাঝে ফাৎনার কাঁপুনি দেখে বুঝল কুচোকাচার কাণ্ড। একটুও রাগল না তাতে। ওরাই গিয়ে খবরটা চাউর করে। পুকুরের পাড় ঘেঁষে ছিপ পাততে অনেক সুবিধে। কিন্তু সেখানে এমন শ্যাওলার জাল—মাছ বাঁধলেও ওপরে তোলা কঠিন, কোথায় কোন জটে আটকে গিয়ে ফসকে যাবে।

ট্রেন যদি আজ একটু কম আসত! দু'দিক থেকেই যাতায়াত চলছে। তার ওপর মালগাড়ি। রেলের ঘণ্টা। ফাষ্ট বেল, সেকেণ্ড বেল—ঢং ঢং শব্দগুলো এই ফাঁকা মাঠে আর কিছু না পেয়ে পুকুরের বুকেই কাঁপুনি তুলে জল নাড়ায়। সব আওয়াজই এখানে জলে পড়ে ফুরোতে ফুরোতে বেঁকেচুরে আকাশে ওঠে—তখন শব্দের কিছু থাকে না।

রাখু এমন ঘন ঘন ট্রেন যেতে দেখলে হাততালি দিয়ে উঠে দাঁড়াত। কিন্তু এই নরম বেলাতেই রোদ যা ক্ষেপেছে—এলে হয়ত জ্বর নিয়ে ফিরত। বৃষ্টির জলের নীচে যার যার ক্ষেতের চৌহদ্দি ঠিক রাখবার জন্তে কোথাও বাঁশ—কোথাও বা ঢোলকলমির ডাল পুঁতে দেওয়া হয়েছে। পুকুর পাড়ের ভিজে ঘাসে পা রাখলে প্রথম ঠাণ্ডা লাগে—তারপর বোঝা যায়, নীচের ভিজে মাটি রোদ পেয়ে গরম হচ্ছে।

আলগোছে গামছাটা ভিজিয়ে নিঙরে নিল দুলাল—তারপর বিড়ে পাকিয়ে জায়গা বদলে বদলে একবার মাথায় একবার ঘাড়ে রেখে শরীরটা খাতে রাখবার চেষ্টা করল। এমন গরম বড় খারাপ। ট্রেন থেকে নেমে হাত দশেক লাইন টপকাতে গোটা দুই চেলা সাপ নজরে এসেছে। চারদিকে জল—গর্তে থাকবার উপায় নেই, কিছুকাল উঁচু জায়গায় ঘুরে বেড়াতেই হবে। রেল লাইনের পাথর, পাটি সব তেতে উঠেছে—এখন ভিজে বাঁশ, নয়ত গরাণলতা ধরে ঝুলতে হবেই—গাছপালা তেতে ওঠে সবচেয়ে শেষে। কতক্ষণে বেলা পড়ে আসবে, রেলের পাটি, পাথর জুড়িয়ে আসবে—সেখানকার ফাঁক ফোকরে রাতটা নিশ্চিন্তে কাবার হয়ে যাবে।

পিয়ালি ষ্টেশনের গা দিয়ে কাটা খাল গেছে। খালের মাটিই বাঁধ। তার ওপরে কেউ যায় না। সেখানে মাছ অনেক—কেউ কেউ বলে কালবাওস আছে, কেউ বলে মেছোকুমির ভেসে উঠতে দেখা গেছে। থাকতে পারে। খালটা মাইল দুই দূরে একটা নদীতে পড়েছে—তবে সে নদী কাদা-পাঁকে বোঝাই, বুক বুঁজে যাওয়ার যোগাড়।

লোভে লোভে খাল পাড় ঘুরে এসেছে দুলাল। ভোরবেলাই শকুন নামে সেখানে। সাবধানে পা ফেলতে হয়। চারদিকে ছোটখাটো মাথা ছড়ানো—শেয়াল, ভাম কিংবা মরা অজগরের চোয়াল হতে পারে। বাচ্চা ছেলের মাথা নয়। মানুষের মুণ্ডু অন্যরকম। সেখানে কলকাতার এক বাবু জেদ করে মাছ ধরতে বসে আর ফেরেনি। দুপুরবেলায় তাকে সাপে কাটে।

ছিপ হাতে বাবু পড়েছিল, পায়ে পাম্পসু, ফাৎনা জলে মাথা তুলে ভাসছিল। ইন্দু দিব্যি গালিয়ে তার সেখানে যাওয়া বন্ধ করেছে—রাখুর দিব্যি। পয়লা খুকুটি মরবার অনেক পরে রাখুকে পেটে ধরে ইন্দু। আর যে কোনদিন হবে কেউ তা ভাবেইনি। রাখুর এমন ভোলানো মুখ—সব জুড়িয়ে দেয়। দুলালের এখন চল্লিশ হবে। মেছো নেশায় রোদে জলে গোঁফ দাড়ি কিছু পাকতে শুরু করেছে। আজকাল কাঁচের গ্লাসে ব্লেড ঘসে ঘসে ঘরেই কামায়। লোকে ষাট পঁয়ষট্টি বাঁচে। তার আগে ছেলেদের শক্ত করে দিয়ে যেতে হবে।

বাতাসের তোড়ে বৃষ্টির লক্ষণ। মাঠের কোণে ঝাপসা ঘোড়া দুটো মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। ভর দুপুর। অনেকক্ষণ ট্রেন চলবে না। মাষ্টার বাবু তোলা জলে উবু হয়ে জিব ছুলছে। জলের নীচে ঘাঘুটি আর একবার চার ফাঁক করে দিয়ে গেল। যাক্। কতবার যাবে! এখন ফাৎনার ছায়ার চারপাশে নেশায় নেশায় পাক খাচ্ছে। বৃষ্টি এগিয়ে এসে দুলালের ছাতা মাড়িয়ে প্ল্যাটফর্ম জুড়ে বড় বড় ফোঁটায় পড়তে শুরু করল। জবুথবু হয়ে খাবারের কৌটো খুললো। রুটিগুলো রেজিষ্ট্রি বইয়ের মলাট হয়ে গেছে।

বৃষ্টি ধরার পর পিঁপড়ের ডিমগুলোকে তলা থেকে এনে বাইরে মেলে দিল। জলের ছাটে একটু মিইয়ে গেছে। তিনটে চল্লিশের ট্রেনটায় ফিরলে সবচেয়ে ভাল হত। সন্ধ্যে সন্ধ্যে কেটে কুটে ইন্দু চাপিয়ে দিলে ঘুমিয়ে পড়ার আগে দুলালের সঙ্গে রাখু খেতে বসতে পারত। রাখু লম্বা হয়েছে, কোমরের হাড় চ্যাপ্টা, হাত-পা চওড়া—বয়সে বড়সড় হবে। এখন কিন্তু বড় লগবগে লাগে—টলে টলে হাঁটে, বাজার ফেরৎ বোঝা চাপালে কাঁধ বদলে বদলে এগোয়, ছায়া পেলে জিরোয়—এখনও তেমন শক্ত হয়নি। অথচ এই খোকার ওপরই একদিন সংসার পড়বে। তিন গোল্লা চার ভাজা মশলার গুড়ো মাখিয়ে জলে নামিয়ে দিল। রেলের বাবুরা ট্রলি চেপে বেরিয়ে গেল।

'বাবু মশায়--বাবু মশায়-আয়-আয়—'

নিজে নিজেই ডাকল। শব্দ করে। শোনার কেউ নেই। রাখু এখন উঠোনে আকাশ প্রদীপ তোলার বাঁশ পুঁতছে। আবার ফাৎনা ডুবিয়ে দিয়েছে। সময় মত ছিপ টানলে এবার আর পালাতে হত না। ষ্টেশনের

ধারাধারি রিক্সার আড্ডা ফাঁকা। ট্রেন নেই বলে খেতে গেছে। তাই ভেঁপু নেই। মাঠের ওপর দিয়ে জলো হাওয়া পিঠে এসে লাগছে।

দুলাল বোলতার অনেকগুলো কচি ডিম চটকে নিয়ে মাটি মেশালো, তারপর ধুলো ধুলো করে সবটা জলে ছিটিয়ে দিল। ভাল জায়গা দেখে জুৎ করে বঁড়শি নামালো।

মাষ্টারবাবু ঘুম থেকে উঠে টিকিট-ঘরে ঢুকলেন। পেছনে ঘন্টিওলার হাতে ঢাকা দেওয়া চায়ের কাপ। তিনটে স'তিনটে হবে হয়ত। গেঁথেছে—ভালরকম গেঁথেছে। হ্যাঁচকা টানে সুতো কেটে দেওয়ার আগেই হুইলে আলগা দিয়ে দিল অনেকটা। কিছুদূর দৌড়োক। ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা সাবধানে ছিপটা চেপে আছে। দুই চুল দূর দিয়ে সুতো ছুটতে ছুটতে পুকুরে তলিয়ে যাচ্ছে। আঙুলে বসলেই দু-ফালা হয়ে যাবে।

দম নেওয়ার জন্যে মাছটা থামতেই বাঁ হাতে কোঁচ—ডান হাতে ছিপ সুদ্ধ জল ছিঁটিয়ে পুকুরের ভেতর এগিয়ে যেতে হল। ঘোলানি তুলে মাছটা একবার জলের ওপর লেজ তুলল। বাঁ হাতের নিরিখ। কোঁচ ছুটে গেল। কোথায় মাছ! সটকে পড়েছে।

দুলাল পাড় ঘেঁষে এগোতে এগোতে টের পেল, পায়ের নীচে মাটি এবার ঢল নিয়ে অন্ধকার, ভারি ঠাণ্ডা জলের দিকে নেমে গেছে। এ সব জায়গায় হঠাৎ মাটি এমন শেষ হয়ে যায়।

জল, জলের নীচে মাছ। তবু তার একটা চোখ কেমন হচ্ছে দুলাল দেখতে পাচ্ছে। পানা, ভাসা-কচুরির ফ্যাকাশে ঝুরি—তার নীচে ঘনানো শ্যাওলা, ঠাণ্ডা মাটি মেখে মাছটা শুয়ে—সুতোর টানে মুখ হাঁ হ'য়ে আছে, টাকরার বঁড়শি বসে গিয়ে সারা গা বেয়ে টাটানো ব্যথা, চোখটা ঘোলা হয়ে উঠেছে—পেছনের চোখটা ওপিঠে মাটি থেকে ঠাণ্ডা মেখে নিচ্ছে। শুধু আঁশ দেখিয়েই কাল ডালহৌসি তোলপাড় করে দেবে। রাখুর প্যাণ্ট কখনো নাইয়ের ওপরে থাকে না। জেগে থাকলে ছুটে এসে ব্যাগটা কাঁধে নেবে। পাঁজরের নীচে ছোট পেটটুকু একেবারে পাত। বাবু মশাই—

বুড়ো আঙুলে পা টিপে টিপে এগোলো। কোনদিকে কোথাও কেউ নেই। গলার দড়িতে পা জড়িয়ে বড় ঘোড়াটা ঘাসে মুখ নামাতে পারছে না—এগোতেও না। ঠিক করল, মাছটা তুলেই আগে ওর দড়ির জট খুলে দেবে।

আন্দাজে হাত ডোবালো। মাটি, ভাঙা কলসীর পিঠ—শক্ত পেছল এত বড় জিনিসটা কি? টেনে তুলল—ধ্যাস্! কে মরেছিল—তার শ্রাদ্ধের বৃষকাঠ। যেমন ছিল তেমন শুয়ে পড়ল। জল সরলো খানিক—শব্দ। দু'পায়ের ভেতর দিয়ে মাছটা গলে যাচ্ছিল। সুতোর সঙ্গে কয়েকটা লোম আটকে গিয়ে পট পট উঠে গেল। জলের নীচে ব্যথা, কষ্ট, গোলমাল সব ঢ্যাবঢেবে—ভিজে ঢাক—কত জিনিস একাকার করে দেয়।

গামছা হাতে পেচিয়ে পা লক্ষ্য করে মাটি চেপে ধরল। পড়েছে। ছিপটা জলে ডোবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ড সুতোর অনেকটা ওগরালো—দুলালের হাতে চেপে বসে গেছে খানিকটা।

মাছটা আর একবার ঘূর্ণি খেল। সুবিধে হল না। আয়নায় গুতো খাওয়ার মত নাক-মুখ-চোখ সুদ্ধ দুলাল জল ফুটো করে জলের ওদিকে মাছের কাছাকাছি তাকাতে গিয়েছিল। চকচকে পিঠ নিয়ে ঠাণ্ডা অন্ধকারে মাছটা মাটিতে সেঁধিয়ে গেছে—শাদা না। কালো মতন। সেই জায়গা দেখে গামছা চেপে ধরতে হয়েছে। কাতল।

মাথার চুল ভিজিয়ে জলের ফোঁটা সার্টের নীচে পিঠ বেয়ে নামছে এখন। কোমরে পৌঁছে সারা পিঠ কাঁটা দিয়ে তুলছে। মন দেবার উপায় নেই। হাত ভেঙে আসছে। অন্তত চোদ্দ সের হবে। একটু পাক খায়—সঙ্গে সঙ্গে গামছা পেচানো হাত আরও জোরে চেপে ধরে—আবার একেবারে মরে যায়। চোখ খুলে নিঃশ্বাস সুদ্ধ জল ঠেলে নীচে তাকাতে হয়েছে একটু আগে। বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুলের নীচে অনেকদিনের কড়া। বুট ছেড়ে ক্যাম্বিস ধরেও পুরোপুরি সারে নি। শক্ত কিছু লাগলেই টাটিয়ে ওঠে। সেই পা এগিয়ে দিয়ে আন্দাজে মাটির নিরিখ নিল। নরম শক্ত দুই-ই আছে—কিছু কুচি শামুক, মরা ডালের পচা খড়কে। এত ফাঁকা—ডাউন পড়ল, ঘটাং—প্রায় এতদূর শোনা গেল। রাখু এলে এত ঝক্কি পোয়াতে পারত না। তবু সঙ্গে থাকলে ভাল হত। বঁড়শি তুললে মাছটা ডাঙা দেখে আছড়াতো দু'চারবার—তারপর রাখুর জিম্মা করে আবার জলে নামত। প্রথমে ডুবে কোঁচ তুলতে হবে—তারপর কর্ড ধরে ধরে ছিপ, শেষে হুইল ঘোরাও করর্ করর্।

আবার মেঘ উঠছে। গুড়গুড়ি থামার নাম নেই। যদ্দুর দেখা যায় তার শেষাশেষি বোধ হয় বৃষ্টিতেই ধোঁয়াটে। ঝেঁপে এল বলে। কোঁচ,

ছিপ, মাছ সব নিয়ে ট্রেনটা ধরতেই হবে—কামড়ায় বসে গা মাথা মুছবে। ঢেউ দিয়ে পাড়ে উঠতে লাগল। খুব পেছল। থামলে হয়। গাদা গাদা পিঁপড়ে জলে ভাসছে। ডিম ফুটে এত তাড়াতাড়ি সব বেরিয়ে আসছে!

এমন ফাঁকা মাঠ। বৃষ্টিতে কাক আসেনি ত?

তার চেয়েও কালো— বড় মানুষের থাবার চেয়েও বড় মাথা—শুধু উড়তে পারে না।

আর এক পা এগিয়ে ঝুরি ঘাসের চাপড়া আলগোছে ধরে পাড়ে প্রায় উঠে পড়েছিল। জল এখন হাঁটুর নীচে।

গাছগাছালি জলে জলে সড়সড়ে। গর্তগুলো কবে ডুবে গেছে। রেলের পাটি জেগে উঠতে সেদিকেই যাচ্ছিল বোধ হয়। এক জায়গায় এতগুলো পিঁপড়ের ডিম দেখে আর এগোতে পারেনি। সবুজ কচু পাতার ওপর টিউবয়েলের কালো রংঙের ভারি হ্যাণ্ডেল পড়ে আছে—অনেকগুলো ডিম ছিটকে বাইরে পড়েছে, কাছে পিঠে কোন পোকা নেই, বুক অব্দি এগিয়ে আসার চাপে কিছু কিছু চটকেও গেছে। কোন শব্দ নেই। রোদ নেই—অন্ধকার সবে জমাট হয়ে বিকেল বানাচ্ছিল।—লেজটা মাটি থামচে বিড়ে পাকাচ্ছে, আবার ঢিলে দিয়ে সোজা হয়ে যাচ্ছে। মিশমিশে কালো ধেনো গোখরো। বাবু মশায়—

কী গেরো। ছোট ঘোড়াটা অব্দি ঘাস খেতে পারছে না। মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে। ভাপে কি তাপে—কিংবা সময় হয়েছে বলেই দু'একটা পিঁপড়ের ডিম ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে—বাইরেটা জানা নেই। ফণার নীচ থেকে কেমন একটা বাতাস বেরিয়ে সব শুষে নিচ্ছে এক একবারে। যারা জানে, তাদের কিছু ভুল করে জলে নেমে ভাসছে—আর কিছু পিঁপড়ে লম্বা ফাঁক ফাঁক ভেজা ঘাসের ভেতর দিয়ে লাইন করে এগোতে আরম্ভ করে দিয়েছে। মাছটা একটু নড়েছিল। রাখুর ছোট ভাইকে কোলে নিয়েছে—এইভাবে কনুই দিয়ে মাথা সুদ্ধ চেপে ধরল। ভাগ্যিস কাঁদে না। কানকোয় ফ্যাকাশে রক্ত। এইবার বুঝল, নাইলন কর্ড গায়ে কেটে বসেছে। নড়বার কথা দূরে থাক—জোরে নিঃশ্বাস ফেলারও উপায় নেই এখন। জলের ফোঁটা শুকিয়ে শিরদাঁড়া খচ্ করে কাঁটা দিয়ে উঠল।

পেছনে হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়ি এসে দাঁড়াল। ফিরে দেখতে গেলে জল নড়ে যাবে। কামরার ভেতর সেই লোকটা ঘুঙুর পরে নেচে আদর্শলিপি

ফিরি করছে—পেছনের কয়েক পাতা উর্দু। সরুপিয়াসল থেকে ওঠে। আজই একখানা কিনত দুলাল। বাবুমশায়—

কাতলাটাকে আরও জোরে বুকে চেপে ধরতে হল। মাথাটা হাতের জোড় পিছলে খানিক বেরিয়ে গেছে। হাত ভেঙে যাওয়ার যোগাড়। কাঁধ টাটাচ্ছে। সস্‌স—কয়েকটা ডিম ছিটকে গেল। শ্বাস নেওয়ার-ছাড়ার উপায় নেই, চোখের পলকও ফেলতে পারল না। গোখরো মাথা তুলেছে।

চিমে হুইসেলে বুঝল ইঞ্জিন একা একা জল খেতে এগোচ্ছে। এখন যদি কামরা থেকে কেউ আন্দাজেও চায়ের খুরি পুকুরে ছুড়ে দেয়—তাহলে মাথা গুটিয়ে ঠিক জলে নেমে আসবে। সস্‌স—কচুপাতা সুদ্ধ সব কেঁপে গেল। দুলছে। বুকের নীচে চাপা পড়ে কচুপাতার সেই জায়গা হলদে হয়ে গেছে—পুড়ে গেল।

মাছটা একটু নড়ল। বুকে কাঁটা কাঁটা পাখনা চেপে ধরল। আগে জানলে ধরতই না। এখন আল্‌গা দিলেই ঝপাং করে পড়বে, জল ছিটে গিয়ে কচুপাতাই হয়ত ভিজিয়ে ছাড়বে।

ট্রেন এত গোলমাল নিয়ে আসে। সস্তার সোডাওয়ালা ভস্‌ করে মুখ খুলল—ছিপি প্ল্যাটফর্মে পড়ছে, স্পষ্ট আওয়াজ পেল দুলাল। লোকজন একটু আস্তেও কথা বলতে পারে না। বড় ঘরের কুলুঙ্গিতে গীতার আড়ালে একপো পোস্ত পড়ে আছে। আজ চার মাস। ছাতকুড়ো ছাড়াতে রোদে দেওয়ার কথা। রাখু—

ইঞ্জিন ফিরে এল। দু'একজন দেরি দেখে প্ল্যাটফর্মের তার ধরে দাঁড়িয়েছে, 'কি পড়ল—'

জলে ছায়া দেখে বুঝল ওরা তিনজন—মাঝের লোকটা বেয়াড়া লম্বা। এখন মাথা একেবারে সাফ হয়ে গেছে। দুলাল ওদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ানো বলে কোলের কাতলাটা দেখতে পায়নি—গোখরো আরও দূরে, লম্বা ঘাসের ওপর সবুজ কচুপাতায় কালো রঙের। ইঞ্জিনের হুইসেল—ছায়া তিনটে মুচড়ে জলের বাইরে চলে গেল। চাকায়-পাটিতে অনেকখানি জুড়ে কাঁপছে—পায়ের নীচে ভিজে মাটি অব্দি। বৃষ্টি ছুটে এসে দুলালকে আবার পার হয়ে গেল। লম্বা ঘাসের মাথা বড় বড় ফোঁটায় মুড়ে যাচ্ছে। পাশ থেকে জল ছিটকে এসে নাকে লাগল। মোছার উপায় নেই। হাতে হাত আটকে আছে। সস্‌স—বাবুমশায়—আয়—য়—আরও উঁচুতে ফণা।

কোমরের নীচ থেকে ঠাণ্ডা ভিজে কাপড় বেয়ে আপনা আপনি অনেকটা গরম জল থেমে থেমে সময় নিয়ে পুকুরে মিশে যাচ্ছে। কাপড় না থাকলে আলাদা শব্দ হত। রাখুরে—

ফণা নামিয়ে মাটির ওপরেই লেজটা ভাঁজ করে খুলে—আবার ভাঁজ করে খুলে ধেনো গোখরো লেজের ধাক্কায় ধাক্কায় ধীরেসুস্থে বাউণ্ডারি বাঁধ পার হল—তারপর লাইনের এবড়ো খেবড়ো পাথর সমান জায়গায় বুক লাগিয়ে এগোতে লাগল। দুলাল আর ঘাড় ফেরাতে পারল না। মাথার পেছনটা টন টন করছে। তিনটে চল্লিশ চলে গেছে।

হাত খুলে নাক মুছতে গিয়ে বুঝল কাতলাটা পিছলে গিয়েই জল ছিটিয়েছিল। ফণা তখন সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছিল। অথচ বুকের ওপর ঢালের মত মাছটা তখন ছিল না।

ওপরে উঠে বড় ঘোড়াটার গলার দড়ির জট খুলে দিতে লম্বা একখানা মুখ ঘাসে নামাল। মাঠের মাঝখান থেকে আবার বৃষ্টি ছুটে আসছে। ছিপের ডগা জলের ওপর উঁচু হয়ে বেরিয়ে। নাইলন কর্ডের ছেঁড়া মাথা জলের ওপর ভেসে। নাই থেকে খানিক শ্যাওলা টেনে বাইরে ছুঁড়ে দিল। ট্রেন সেই ছ'টা দশে। ভোঁতা কাঠের মুগুরে লোহার শিক বসানো কোঁচটা নিশ্চয় বৃষকাঠের কাছেই কোথাও পেড়ি কাদায় পড়ে আছে।

হরিয়ালদা

প্রথম দেখা হয়েছিল সিঁড়ির মুখে। ঘুপচি ঘরে। আমি দোতলার নতুন ভাড়াটে। শীতকালে বৃষ্টি হচ্ছিল ক'দিন ধরে। দেখি ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। একতলায় দু'খানা ঘর। একখানা কাদের গোডাউন। অন্যখানায় দু'জন কবি থাকেন। অল্প বয়স। গোঁফ আছে। এই ছেলেটি তাদের বয় সারভেণ্ট। নাম কানাই। প্রায়ই দোতলা থেকে শুনতে পাই—কবিদের একজন ডাকছে—ক্যানাই। জল নিয়ে আয়—

অমনি কানাই তার হাঁটুর চেয়ে উঁচু দু'বালতি জল নিয়ে রাস্তার কল থেকে টলতে টলতে ঘরে ঢোকে।

হাফ প্যাণ্ট। হাফ সার্ট। সাড়ে চার ফুট উঁচু। ফ্যাকাশে রঙ। মুখে হাসি। ছেলেটা বৃষ্টির দিন দু'একবার আমাকে ট্যাক্সি ডেকে দিয়েছে মোড় থেকে। আমার বেলায় অফিস। বেলায় বেরোই। দেখি কানাই রান্না করছে। বেশির ভাগ রান্নাতেই গুচ্ছের পেঁয়াজ। কেননা, সিঁড়ির মুখে প্রচুর পেঁয়াজের খোসা পড়ে থাকে।

আবার কথনো কানাইয়ের সঙ্গে আমার ট্রাম-স্টপে দেখা হয়। হাতে ব্যাগ।

কোত্থেকে ?

অচিনদা লেগ্ মারগেডে নিয়ে গে বাজার করে দিল।

দেখি কি বাজার করলি—

সন্ধ্যেবেলা রান্না করব তো। তাই—বলে কানাই ব্যাগ খুলে দেখাল। গোটা কয়েক ফ্যাসা মাছ। দশ বারোটা আলু। তৎপরিমাণে পেঁয়াজ। আর কিছু সবুজ সবজি। তাতে লঙ্কাও আছে।

কবিদের মধ্যে একজনের নাম অচিন। তার বাবা ডি এস পি ছিল।

কবি নিজেই একদিন বলেছিল আমাকে। সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেওয়ার সময়।

আমি দোতলায় বাড়িওয়ালার সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকি। আসলে কল্যাণবাবু বাড়িওয়ালা নয়। সেও ভাড়াটে। আমাকে, নিচেরতলার কবিদের সাবলেট করেছে। নিজে থাকে দোতলার সবচেয়ে বড় ঘরখানায়। দক্ষিণ খোলা। সেখানে নিলামে কেনা বড় ডাইনিং টেবল। তাতে বেলা দেড়টার সময় বাপের আমলের বুড়ো চাকর—বাবুলাল, কষা করে রান্না মাছের ঝাল, মাংস সার্ভ করে। বউ আর মেয়ে নিয়ে ফ্যান চালিয়ে কল্যাণ খায়। বয়সে আমার চেয়ে ছোট। গলায় হার। পাড়ায় ড্রাই ক্লিনিংয়ের দোকান। দোকানের নাম 'দি রোব'। আমি ছোট ভাই বলে ডাকি। সে আমায় বড় ভাই বলে ডাকে। কমন প্যাসেজ। সেখানে দেখা হলে একদিন বলল, বড় ভাই আমি খুব জিদ্দিবাজ ছেলে আছি।

আমার দুই মেয়ে স্কুলে পড়ে। তারা আগে কখনো এমন বাংলা শোনে নি। তারা তাকিয়ে থাকল।

কল্যাণের সম্বন্ধী ভোলাবাবু। বিয়ে করেন নি। তারও ড্রাই ক্লিনিংয়ের দোকান আছে। বেলেঘাটায়। গায়ের রং কালো। বিয়ে করেনি বলে কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপন দেয়। পাত্রীপক্ষের চিঠি আসে। নিজের একটা স্কুটার আছে। বৃহস্পতিবার দোকান বন্ধ বলে ভগ্নীপতির বাড়ি চালিয়ে চলে আসে।

তখন চিলেকোঠার ঘরে কচি মুরগি রান্না হয়। সঙ্গে মিলিটারী রাম। কখনো পিটার স্কট। আকাশের নীচে খোলা ছাদ। বাবুলাল কষা করে রাঁধে। হিম পড়ে। বড় ভাই বলে আমায় ডেকে নিয়ে যায়। আমি হিমে ভিজে যাওয়া সতরঞ্চির ওপর গিয়ে যখন বসি—তখন আমার পরিবার ঘুমিয়ে পড়েছে। সকাল সকাল স্কুল বলে দুই মেয়েও তখন অঘোর ঘুমে।

এই সময় এক একদিন এক এক বিষয়ে গল্প হয়। আবছা জ্যোৎস্নায় ভোলাবাবু আমার গ্লাসে ঢেলে দেন। আমি বলি, আর দেবেন না। আমার বিশেষ অভ্যেস নেই কিন্তু।

ওরা আরো দেয়। কল্যাণ বলে, এই সাবধান সবাই—বড় ভাই কিন্তু খুব বড়জাতের খাইয়ে। গোড়ায় বোঝা যায় না।

কিন্তু আমি রিয়ালি আনাড়ি।

আমি আর ভোলাবাবু সমবয়সী। সারা পাড়া ঘুমোচ্ছিল সেদিন। আমরা তখন রাত বুঝি না। ভোলাবাবু বলল, আমার কি বিয়ে হবে না দাদা?

কেন হবে না? চিঠিগুলোর জবাব দিয়েছেন?

তা তো দেওয়া হয় নি।

তবে!

কল্যাণ বলল, এমন ভাবে জবাব দিতে হবে—যাতে বোঝা যায়, পাত্র শুধু সুন্দরী মেয়ে চায়। পাত্র নিজে কালো। মোটা। কিন্তু দিলদার। এটাও জবাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে—যদিও পাত্রের বয়স একটু বেশি—তবু সে তার ড্রাই ক্লিনিংয়ে পুজোর সময় বাইশজন কারিগরকে বোনাস দেয়। গাড়ি কিনতে পারে। কিন্তু কেনেনি। কারণ, তাহলে পাড়ার পুজোয় নিট দু'শো টাকা চাঁদা দিতে হবে। কমপালসারি জুলুম।

আমি বললাম, ভোলাবাবুর বয়স তো এমন কিছু বেশি নয়।

সেটা কে বুঝছে বলুন দাদা! এমন মোটা হয়ে গেছি। গায়ের রংটাও খুব কালো। পেটটা এর ভেতর এত বড় হয়ে গেল। যে মেয়েই দেখে—সে-ই ঘাবড়ে যায়। আমি চাই হেলদি, সিমপ্যাথেটিক, কালচারড্, হায়ার সেকেণ্ডারি।

চেহারার দোষ কি বলুন! এবার কল্যাণ মুরগির ঠ্যাঙ আমার দিকেই এগিয়ে দিল। নিতে হল। ছ'বছর সম্বলপুরের জঙ্গলে গাছ জমা নিয়ে কাঠের ব্যবসা করেছে। তখন তো শুধু পয়সাই চিনতো।

জঙ্গলের কথায় ভোলা পাগল হয়ে ওঠে। কুঠে নামে এক পাহাড়ি জাতির সঙ্গে সম্বলপুরের ফরেস্টে ছিল। তারা ওকে বড় আদর করত। বড় জেদি জাতি। প্রায়ই ওরা ময়ূর মেরে আনত। এসে বলতো, পয়সা দে বাবু। রান্না হবে। অনেকদিন ময়ূরের মাংস খেয়েছে ভোলা। তার সন্দেহ, অমন সুন্দর পাখির মাংস খেয়েছে—সেই পাপেই কি তার বিয়ে আটকে আছে?

আমি বলি, না না। পাগল নাকি মশাই। ময়ূর একটা খাবার জিনিস, তাই খেয়েছেন। উদ্যোগী হন। ঠিক বিয়ে হবে আপনার।

প্রায় অন্ধকারে আমরা তিনজন তখন কাৎ হয়ে বসে আছি। ভোলা

আদুড় গায়ে। কোন আলো ওর গায়ে রিফ্লেক্ট করে না। কল্যাণ সিধে বসে থাকার চেষ্টা করছে। অন্ধকারে মুরগির সরু সরু হাড় দাঁতে ভাঙছে। তার আওয়াজ বুঝে বাবুলাল চিলেকোঠার ঘর থেকে নতুন নতুন মাংস ভাজা নিয়ে আসছিল। বোতলে তখনো অর্ধেকেরও বেশি।

এমন সময় ছাদের কোণে দেখি, কানাই একখানা লাঠি হাতে একটা রড পেটাচ্ছে। আর সেই তালে গুন গুন করে গাইছে।

কল্যাণ এক ধমক দিতেই নিচে নেমে গেল।

বললাম, ছেলেটা ভাল।

না না বড়ভাই। কোন বিশ্বাস নেই।

কেন বিশ্বাস নেই জানি না। ওর সঙ্গে আমাদের কোন ব্যবসাপাতি নেই যে অবিশ্বাসী কাজ করবে। চুপ করে রইলাম।

এর মধ্যে একদিন কবি অচিনবাবুর হাতে বেদম পিটুনি খেয়ে কানাই আমার কাছে চলে এল। আমি ওকে আমার বাড়ির কাজে নিতে প্রস্তুত ছিলাম। একা একা গান গায়। কোন গ্রাজ নেই। আমার বড় মেয়ের চেয়ে কিছু বড় হবে। তাই বোধহয় ওর জন্যে আমার কিছুটা বাবা ধরণের স্নেহ কাজ করছিল।

অচিনবাবু বলল, নিচ্ছেন নিন। কিন্তু কানাই বড় নোংরা।

বাবুলাল বলল, ও খুব বড় অ্যাকটর আছে। ওর মুখ দেখে কিছু বুঝবেন না।

কানাই আমার কাজে জয়েন করার পর ভীষণ খাটতে লাগল। আমি ওকে বাটার দোকানে নিয়ে গিয়ে স্থ-জুতো কিনে দিলাম। সঙ্গে মোজা। খাকির হাফপ্যান্ট আর শাদা সার্ট। বাবুলাল চমকে গেল। অচিন বিরক্ত। কল্যাণের এসব দেখার সময় নেই। আমার স্ত্রী বললেন, ছেলেটার মাথা বিগড়ে দিচ্ছ।

কানাইয়ের মুখে একটা সারল্য আছে। গায়ের রঙ ফরসার দিকে। নিজের শরীরটাকে পাখির পালকের মত রেখেছে। এই সিগারেট আনছে এক ছুটে। এই ট্যাক্সি ডাকছে। এই রান্না বসিয়ে নুন নিয়ে আসে।

কথায় কথায় বলল, গাঁ থেকে এসে প্রথম বি জি প্রেসের ক্যানটিনে বাসন ধুতো। ছ'মাসে একটানা জলের কাজে হাতে হাজা ধরে যায়। সেখান থেকে আমাদের এই পাড়ার বাজারে ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে। কবি

অচিনবাবু ফুটপাত থেকে ধরে আনে কানাইকে। তখন কানাই মুড়ি খাচ্ছিল। চোখে পিচুটি। হাফ প্যান্টে বোতাম নেই বলে কোমরে পাকিয়ে গোঁজা ছিল প্যান্টটা।

কানাই ক'দিনের ভেতর আমার মেয়েদের মন হরণ করে ফেলল। বাঘবন্দী, চোরপুলিশ খেলা শেখালো দুই মেয়েকে। ওর গাঁয়ের সব ধাঁধা শেখালো। যেমন:

হোকোলের মধ্যে খোকোলের বাসা।
ডিম পাড়লো ঠাসা ঠাসা।
হে ভগবান! তুমি সাক্ষী
ডিম পাড়লো কোন্ পক্ষী?

মেয়েরা চেঁচিয়ে বলে, পেঁপে—

উপরন্তু দিদি, আপনি, আজ্ঞে বলে ওদের ডাকতে থাকায় ওরা কানাইয়ের রীতিমত বশ হয়ে গেল। কানাই না ভেঙে পার্শে মাছ রাঁধতে জানে। চিঠি রেজিষ্ট্রি করতে পারে। ওষুধের দোকান থেকে মিকশ্চার আনতে পারে। উপরন্তু মেয়েরা রাতে শোয়ার সময় ওর গল্প শোনে। শুনতে শুনতে ঘুমোয়। কানাই একাই রেশন ধরে। খোলা ছাদে রাতে গান গায়। শব্দ বোঝা যায় না। গাঁয়ের গান। দোতলা সমান দু'টো সুপুরি গাছে গানের তালে লাঠির বাড়ি মারে। আমি বিছানায় শুয়ে খোলা জানলা দিয়ে সুপুরি গাছদুটোয় ঝাঁকুনি দেখে বুঝতে পারি।

মেয়েরা একদিন বলল, বাবা বলতো?

ইরিক বিরিক ছিড়িক ছাই।
চোখ ড্যামরা মাথা নাই।

মেয়েরাই চেঁচিয়ে বলে: কাঁকড়া—

এসব কানাইয়ের শেখানো।

কানাইকে নিয়ে অসুবিধেও আছে। টিউবয়েল থেকে খাবার জল আনতে গেলে ফিরতে চায় না। বাজারের দোকানে দোকানে বাকি। মাস মাইনে মাকে পাঠাবে কি? সবটাই প্রায় ধার শুধতে যায়। কখনো কখনো হাওয়া হয়। তখন দেখি বাড়ির সামনের মাঠটায় পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে কাদা মেখে বল পেটাচ্ছে। চেনার উপায় নেই। ওরা সবাই নানান ভাড়াটের ছেলে। স্কুলে সেভেন এইটে পড়ে। আর কানাই একজন অল্পবয়স্ক

চাকর। আমার স্ত্রী অনুযোগ করে। কানাইয়ের কাজে মন নেই।

এখানেই খেলুড়ে ছেলেদের মুখে একদিন শুনলাম: আমি নাকি হরিয়ালদার বাড়িতে থাকি।

কে হরিয়ালদা?

কাদা মাখানো একটা ছেলে বলল, কেন। কানাই।

কানাইয়ের নাম হরিয়ালদা?

হ্যাঁ। আপনি জানেন না?

হরিয়াল কেন?

এমনি। বলেই ছেলেটা ভিজে বলটা পায়ে নিয়ে মাঠে ঢুকে গেল। ঠিক মাঠ না। এক ফালি জমি। শরিকে শরিকে মামলা চলছে বলে এজমালি জায়গাটা এখন এই পাড়ার একমাত্র মুক্তাঙ্গন। সামনে ছাইগাদা ও একটি বকুল গাছ আছে। তাতে ফুল হয় না।

ছাদে হিম পড়া রাতের আসরে প্রায়ই আমার ডাক পড়ে। যখন নেমে আসি তখন পাড়া ঘুমোয়। খালি গায়ে ভোলা ঝিমোয়। কল্যাণ নীচে শুতে চলে যায়। পরদিন সকালে কল্যাণের স্ত্রী কল্পনা তার দাদা ভোলাবাবুকে বকাঝকা করে। সারারাত ফুটপাতে ভোলাবাবুর দাঁড় করানো স্কুটারে হিম পড়ে।

দুপুর বেলা দেখি আমাদের কমন প্যাসেজে স্টেনলেস স্টিলের বাসনওয়ালারা এসেছে। খালিগায়ে ভোলাবাবু পা ছড়িয়ে বসে। পাশে মোড়ায় কল্পনা। ওদের হাতে নানারকমের গরম কাপড়। ফুলপ্যাণ্ট। জাম্পার। পুরনো বেনারসীও আছে। আছে ডবল ব্রেস্টের কোট। তার বদলে বাসন নিচ্ছে ওরা। বেনারসীর জরি ওজন হয়ে বড়বাজারে বিক্রী হয় শুনেছি।

ব্যাপারটা বুঝলাম। লনড্রীতে যেসব খদ্দের জামা-কাপড় কাচতে দিয়ে আর নেয় না—সেগুলো দিয়ে ওরা বদলি বাসন রাখে। এরকম নাকি অনেক খদ্দের আছে।

কল্পনা নতুন হিন্দী ছবি এলে চুমকি বসানো শাড়ি পরে কল্যাণকে নিয়ে দেখে আসে। ম্যাটিনিতে। সেদিনই সন্ধ্যেবেলা সে প্রথামত নায়িকার ফ্যাশনে শাড়ি ব্লাউজ পরে।

এই পাড়ায় একজন পার্লামেন্টের মেম্বার আছে। অল্পবয়সী। পাউডার মাখে খুব। বাড়ির সামনে সিকিউরিটির পাহারা। সাহায্যপ্রার্থীর ভিড়।

কল্যাণের ঘনিষ্ঠ এই এম পি। যখন আনইমপর্টান্ট ছিল—তখনকার ঘনিষ্ঠতা। কল্পনা মাঝে মাঝে ভালো রান্না বাটিতে করে পাঠিয়ে দেয়।

পাড়ায় প্রচুর বেকার। তারা বিখ্যাত চায়ের দোকানে—তার চারদিকের রকে ও চেয়ার পেতে বসে আড্ডা দেয়। চা খায়। পুজো করে। জলসা বসায়। মারামারি করে। এবং নেশা করে।

আমি আর পাঁচজন গৃহস্থের মতো রাতে বাড়ি ফিরে এই পাড়ায় ঘুমোই। দিনে চাকরি করতে বেরোই। আমার মেয়েরা স্কুলে যায়। ভোলাবাবু ডাকলে ছাদের আসরে গিয়ে বসি।

একদিন দুপুর বেলা আসর বসল। তারপর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের জবাবে আসা সাতচল্লিশখানা চিঠির সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখলাম সন্ধ্যে পর্যন্ত। সঙ্গে চলল সোডার অভাবে জল মেশানো হুইস্কি। আঠাশখানা চিঠি লেখার পর থেকে আমি বাকিগুলোয় যে কি লিখলাম—তা আমিই জানি না। কৃতজ্ঞ ভোলাবাবু মোড়ায় বসে আমার দ্রুত চিঠি লেখা দেখছিল। আর ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে মাঝে মাঝে গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছিল। ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছে। আলো জ্বালানো হয় নি। কানাই কয়েকবার মাছ ভাজার প্লেট এনে দিল। বাবুলাল চিলেকোঠার ঘরে মাছ ভাজছিল বসে বসে। আমি চোখের দৃষ্টি ছুঁচলো করে অন্ধকার খুবলে খুবলে পোস্টকার্ডে লিখছিলাম: কোন দাবি নাই। পাত্র চল্লিশ। বাইশজন কর্মচারীকে পূজা বোনাস দেয়। ইচ্ছা করিলেই মোটর গাড়ি কিনিতে পারে। কিন্তু কেনে নাই। সময় হইলে কিনিবে। সচ্চরিত্র। সুদর্শন। আগামী রবিবার বিকাল পাঁচটায় পাত্রীর ফটো সহ দেখা করুন।

পাত্র তখন হুইস্কির গ্লাসে কেটলি থেকে ঠাণ্ডা খাবার জল ঢালছিল। আমি তাকালাম। বড় বড় চোখ। ভারি ঠোঁট। সহৃদয়। বন্ধুবৎসল ভোলাবাবু মাপ মতো বোতল কাৎ করে গ্লাসে ঢালছে।

এই বাড়িটার সিঁড়িঘর অন্ধকার। কবি অচিনবাবুর পাশের ঘরটা কার যেন গুদামঘর। সব সময় বন্ধ থাকে। মাঝে মাঝে দেখি—দরজা খোলা হয়। কারা যেন এসে মিল্ক পাউডার ওজন করে। বস্তা বন্দী করে। প্যাকেট সাজায়। আবার চলে যায়। আমি এরকম একটা বাড়িতে থাকি।

বারোখানা চিঠির জবাব দেওয়ার পরেই দেখেছিলাম—কল্যাণ উঠে গেল। হাতে হুইলের ছিপ। চার। মাঝে মাঝে গ্রাম দেশে পাড়াগাঁর

পুকুরে মাছ ধরতে যায়। এখন এই অবস্থায় কোথায় মাছ ধরতে গেল? কিন্তু একটু টিপসি হওয়ার ঝোঁকে যে কোন আনরিজনেবেল্ কাজ করতে দেখলেই ভাল লাগার কথা। আমারও তাই লেগেছিল। ভোলারও তাই।

ভোলা বলছিল: বিয়েটা হয়ে যাক দাদা। তারপর কাস্টমস্ থেকে সস্তায় পঞ্চাশ হাজার টাকার হুইস্কি নিলামে ডেকে নেব। এক বোতল খাব। এক বোতল বেচবো। কোন খরচই লাগবে না। অথচ ফুর্তি। আরেকটু দেব? দিই—

আমি গ্লাস এগিয়ে দিয়েছি। এমন সময় কল্যাণ ছিপ ও বড় একটা পাঁচ কেজির মত রুই নিয়ে ঘরে ঢুকলো। আমরা লাফিয়ে উঠলাম। সবচেয়ে খুশি কল্পনা।

কোত্থেকে ধরলে?

গেস্!

আমরা মালুম করতে পারছিলাম না। কল্যাণই ভাঙলো। লেক থেকে। হ্যাংগিং ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে চার দিয়ে ফেলতেই এক ঝটকায় কপাৎ! কেউ ছিল না ভাগ্যিস।

তারপর মাছ আর ছিপ পরিষ্কার মেঝেতে ফেলে দিয়ে কল্যাণ আমার খাটে দিব্যি কাৎ হয়ে বসে হাঁপাতে লাগল। বাঘ শিকার করেও শিকারী বোধহয় এমন রেষ্ট নেয়।

আমার স্ত্রী এসে ঘরের আলো জেলে দিলেন। কল্পনা বঁটি নিয়ে এল। বাবুলাল ছাই।

ভোলাবাবু সকাতরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে চিঠি ক'খানা বাকি থাকবে?

কল্যাণ বলল, হ্যাঁ থাকুক। এখন মাছ ভাজা হবে। খাওয়া হবে।

কানাই কোথায়?

আমি কানাই কানাই বলে চেঁচালাম।

আমার স্ত্রী ঘরে ঢুকে বলল, চেঁচাচ্ছ কেন? কানাই তো মাঠে খেলছে।

আমি ঝুল বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখলাম, সারা গায়ে কাদা মাখানো কানাই আমার দিকে পিঠ ফিরে সেণ্টারে বল নিয়ে এগোচ্ছে। অন্যরা সবাই পাশাপাশি কাছাকাছি বাড়ির অভিভাবকদের ছেলে। শুধু কানাই একাই ওর ভেতর নিজে নিজের গার্জিয়ান। ড্রিবলিং করে বল নিয়ে গোলের দিকে

ছুটে গেল।

ঝুলবারান্দার পাশ দিয়ে সেই সুপুরি গাছ দুটো দাঁড়ানো। আমি ব্যালকনি থেকে হাত বাড়িয়ে একটাকে একটু ঝাঁকিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠল।

আমি ডাকলাম, কানাই—

কোন উত্তর নেই। কানাই বলের পেছনে ছুটছে। কি ফূর্তি। সেই এম পি-র সিকিউরিটিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। আমি কবি অচিনবাবুর গলায় ডাকলাম—ক্যানাই—

কোন জবাব নেই।

কখন দেখি ভোলাবাবু আমার পাশে দাঁড়িয়ে একটা সুপুরি গাছকে টেনে ধরেছে। গাছটা—এই কি হচ্ছে—ছেড়ে দাওনা মাইরি—এই ঢঙে ভোলার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইছে।

আমার খুব মজা হল।

আমি জোরে ডাকলাম—হরিয়ালদা—

কানাই খেলা থামিয়ে ছুটন্ত বল আর প্লেয়ারদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ঘুরে অবাক হয়ে তাকাল। শুধু চোখ জোড়া দেখা যাচ্ছে। সেখানেই শুধু কাদা মাখানো নেই। বহু ধাঁধার ছড়া জানে।

আমি আবার ডাকলাম—হরিয়ালদা—

কানাই ফিক করে হেসে ফেলল।

ভোলাবাবু তখনো সুপুরি গাছটাকে ধরে আছে।

পুরনো হিসেব

রাত সাড়ে ন'টায় অফিস থেকে ফিরে মাসমাইনেটা বউয়ের হাতে তুলে দিল শিশির। কয়েকখানা একশো টাকার নোট। কিছু খুচরো। রুনু আঁচলে খুচরোটা বেঁধে একশো টাকার নোটের গোছা লক্ষ্মীর আসনে ছোঁয়াল। তারপর আলমারিতে সবটা তুলে একখানা একশো টাকার নোট বটুককে ডেকে দিল। যা, মাংসের দোকান খোলা আছে এখনো। এক কেজি বাকী আছে। শোধ দিয়ে চারশো মেটে নিবি। দেখে আনিস বিকেলের কাটা কিনা।

বটুক ব্যাগ নিয়ে চলে গেল। বড় রাস্তার ওপর বাড়ি। একটু এগিয়ে একই ফুটপাথে মাংসের দোকান। ফ্যাকাশে রঙের বছর বারো তেরোর ছেলে। খালি গা। একটা কথা বলে না। নিঃশব্দে ঘর ঝাঁট দেয়। ঘর মোছে।

পূর্ণিমা এনে দিয়েছে জল। পূর্ণিমা আজ চার বছর শিশিরের বাড়ি বাসন মাজে। আরও পাঁচ বাড়ি কাজ করে। কথার খুব ঠিকঠাক। শুধু বাজারে যাবে না। সেখানে ওর দাদা সবজি নিয়ে বসে। তার কারণ আছে, ওরা ষোল নম্বর বস্তিতে থাকে।

পূর্ণিমার মাসে পাঁচ দিন ছুটি নিতে হয়। তখন ওর মা এসে কাজ করে। পূর্ণিমার মা বলে, দাদাবাবু, এবার পূর্ণিমাকে দেশে পাঠাবো। ঝি-গিরি করলে ওর আর বিয়ে হবে না। এই পোড়া বস্তির মেয়ে কেউ নেয়!

পোড়া বস্তি বল কেন তোমরা?

যুদ্ধের সময় উড়োজাহাজ ভেঙে পড়েছিল।

বাঁচলে কি করে?

তখনো আমরা আসি নি। আগুন ধরে গিয়ে অনেক লোক মারা যায়।

ঘরগুলো পুড়ে যায়। তারপর এসেই তো ফাঁকা মাঠে ঘর বেঁধে আছি আমরা। এখন তো শুধু ঘর আর ঘর।

বাড়ির এত কাছাকাছি কলকাতার বুকে যুদ্ধবিধ্বস্ত এমন একটা জায়গা আছে—অথচ তা দেখা হয় নি শিশিরের। শিশিরকান্তি রায়, জুনিয়ার ম্যানেজার। মাইনে ছাড়া উপরি সামান্য। কিছুকাল আগেও অফিস থেকে ফিরে টিউশনি করতো। এখন অনেকদিন চাকরি বলে ইনক্রিমেণ্ট হয়ে হয়ে মাইনের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে। আরও চোদ্দ বছর চাকরি আছে। পাড়ার ছেলেরা দাদা ডাকে। ওর বড় জানতে ইচ্ছে করে, সত্যিই পূর্ণিমার মায়ের সাত পাকের বিয়ে হয়েছিল কিনা?

গা-হাত-পা ধুয়ে হাতঘড়ি দেখে শিশির বলল, বটুক তো এলো না এখনো। একশো টাকার নোট নিয়ে গেল। কাল সকালেই তো আনাতে পারতে।

রুনু বলল, ভোরে রান্না থাকে। তাই ভেবেছিলাম, এনে রাখুক। রান্না চাপিয়ে দিয়ে বাজারে যাবো। হয়তো মাংস কাটে নি এ-বেলায়। তাই ট্রাম লাইনের দোকানে গেছে। এখুনি আসবে।

রাত সাড়ে দশটাতেও বটুক এল না। বটুক নাইয়া। একদিন জিজ্ঞাসা করে পুরো নামটা জেনেছিল শিশির।

পাড়ার ছেলেদের নিয়ে রাত প্রায় এগারোটায় শিশির বেরোলো।

বাড়ি চেনেন শিশিরদা?

না। পূর্ণিমা জানে। কিন্তু পূর্ণিমা তো দেশে।

পূর্ণিমাদের বাড়ি চলুন তাহলে। সে বাড়ি চেনেন তো?

তা চিনি। দু'একবার ডাকতে যেতে হয়েছে।

পোড়াবস্তি কিন্তু অনেকটা জায়গা নিয়ে। তেরো নম্বর, ষোল নম্বর আর চুয়ান্ন নম্বর।

নম্বরের কথা অনেকবার শুনেছে শিশির। বটুর খোঁজে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। সরু গলি। পেছনে রেল লাইন। ডান দিকে বাবুদের বাড়ি বাড়ি রেডিও বন্ধ হচ্ছে। কি একটা কারণে সি.এম.ডি.এ. এদিকে পৌঁছতে পারে নি। বোধহয় রেলের জমিও এরা দখল করে বসে আছে। কার জমিতে সরকার রাস্তা বানাবে, আলো দেবে, কলের লাইন টানবে? তাই রেলের আলো আর বাবুদের বাড়ির আলোর মাঝখানে বিরাট একরাশ অন্ধকার।

ঘরে ঘরে ডিবের আলো। বর্ষায় পাঁক-মেশানো পায়ে-চলতি মাটির পথ।

পূর্ণিমা ক'দিন হল দেশে গেছে। ওর মা ভাই ডাকতেই বেরিয়ে এল। তারা বলল, বটুককে দেখেছি। কিন্তু ঘর তো চিনি নে। কার ছেলে?

বাপের নাম তো জেনে রাখি নি।

তাহলে পূর্ণিমা দেশ থেকে ফিরুক। তখন পাত্তা হবে।

শিশিরের রাগ হল রুনুর উপর। কেন যে টাকা ভাঙিয়ে রাখার জন্যে বড় নোট ভাঙাতে দিল।

পাড়ার ছেলেরা বলল, তেরো, ষোল, চুয়ান্ন নম্বর মিলিয়ে হাজার তিনেক লোক থাকে। এখানে বারো বছরের একটা ছেলেকে খুঁজে পাবেন কোত্থেকে? তাও রাতের বেলা।

পূর্ণিমার মা, তার ছেলে, অন্য প্রতিবেশীরা—যারা কথা বলছিল শিশিরের সঙ্গে, তাদের কারও মুখ-চোখ দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে। খবরের কাগজে শিশির পড়েছে—মহানগরীর তেইশ লক্ষ লোক বস্তিতে থাকে। তার অনেক জায়গায় পাকা রাস্তা, পাকা বাথরুম, কলের জল, ইলেকট্রিক আলো হয়েছে।

জায়গাটা হিল্লি-দিল্লী নয়। একদম ঘরের পাশে। এ-পাড়ায় বারো বছর আছে শিশির। অথচ দেখা হয় নি এ-জায়গা। এই অন্ধকার দ্বীপের ভেতর থেকে ক্রমাগত পচা গন্ধ উঠে এসে নাকে লাগছিল শিশিরের। বটুকের কল্যাণে আজ একটু আন্দাজ পেল মাত্র।

বটুক একজন মহাপুরুষ। প্রায় একমাস নিঃশব্দে কাজ করে গেছে। কোন কথা বলে নি। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এতদিন। মুখ দেখে কিন্তু বোঝা যায় নি কিছু।

বাড়ি ফিরতে রুনু বলল, পাড়ায় সিনেমা দেখাচ্ছে। সেখানে হয়তো ভিড়েছে। ছেলেমানুষ তো।

রুনুর আশা মিথ্যে হল। পরদিনও বটুক ফিরলো না।

বটুকের সম্পর্কে যা তথ্য পাওয়া গেল তা হল—ও নিজেই কাজ করতে এসে বলেছে—ওর বাবা মিষ্টির দোকানে কাজ করে। অনেক ভাইবোন। ওর সম্পত্তি—একটা ছেঁড়া শার্ট আর একটা ছেঁড়া হাফ-প্যান্ট।

জামাকাপড় একদম নেই দেখে শিশির নিজের একটা পাজামা বটুককে দিয়েছিল। সেটা বড় হয় বলে বটুক কোমরে গুঁজে পরতো। ইচ্ছে থাকলেও জামাকাপড় দেয় নি শিশির। আগের দু'তিন জনকে কিনে দিয়ে দেখেছে,

তারা জিনিস পেলেই পালায়।

পূর্ণিমা দেশ থেকে ফিরলো তিনদিন বাদে। বছর চোদ্দ-পনেরোর ছিমছাম কিশোরী। গম্ভীর। কাজ করে ঠিকঠাক। টাকা জমায়। হাসি খুশী। সে বলল, সব শুনেছি দাদাবাবু। আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়ি এসো। ওর বাবা অমূল্যকে ডাকবো।

বটুক ফিরেছে?

না দাদাবাবু, বাড়ি যায় নি। লোক দিয়েছি বলে মা আমায় বকছে।

তোর দোষ কি। তুই তো ভাল মনেই দিয়েছিলি। তোদের ওখানে আলো যায় নি দেখলাম।

আলো নেই। জল নেই। রাস্তা নেই। পায়খানা নেই দাদাবাবু।

তা থাকিস কি করে?

এবার দেশে চলে যাবো।

শিশির মনে মনে এই কিশোরীকে শ্রদ্ধা করে। হেসে বলল, একবারে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠবি। তোর দাদাদের ডাকছি দাঁড়া।

ভালো হচ্ছে না কিন্তু দাদাবাবু।

পাড়ার একজন উঠতি যুবনেতা শিশিরের সঙ্গে দেখা করতে এল। ছোকরা প্রায়ই বলে—যুগ যুগ জিও। আরও কি সব বলে। দেশের কাজে সামিল হবার জন্যে শিশিরকে চাঁদা দিতে বলল।

শিশির পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে বলল, তোমরা ভাই এশিয়ার নতুন সূর্য। বাড়ির পাশে পোড়া বস্তিতে এতগুলো মানুষ কী কষ্টে আছে কি বলব। একটা কিছু কিন্তু করা দরকার। এটা তোমাদেরই দায়িত্ব।

আমরা ওখানে প্রাইমারী ইস্কুল করেছি।

ভালো করেছো। কিন্তু এমন অবস্থা দেখলাম—ওখানে যে কোন দিন কলেরা লাগলে সবাই ফৌত হয়ে যাবে।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের কথা ভাবছি আমরা। আপনি ওখানকার একটা ছেলেকে মানুষ করুন না।

কি করে করবো? ওখানকার একজন তো আমায় ফকির করে দিল! তারপর সবটা বলল শিশির।

যুবনেতা সব শুনে বলল, খুব অন্যায়। আমাদের ছেলেদের বলছি। আপনি ডাক্তারদাকে বলুন না। উনি ওখানে চিকিৎসা করেন।

ডাক্তারদা মানে পাড়ারই একজন ডাক্তার। এ-পাড়ারই লোক। গোড়ায় জনহিতকর কাজে প্রাণ মন দিয়ে কাজ করেছিল। এখন তা থেকে সুদ পায়। মানে, মন দিয়ে রোগী দেখে না। কিন্তু চার টাকা ভিজিটের রোগী রোজ শ'খানেক লেগে থাকে। পাইকারি হারে নাড়ী টিপে ওষুধ দিয়ে যায়। সবাই ভুগে ভুগে ডাক্তারদার ওষুধ কিনতে কিনতে তবে সেরে ওঠে। জ্বরকে টাইফয়েডে তুলে তবে ডাক্তারদা থামে।

সন্ধ্যেবেলা পোড়া বস্তির অন্ধকারে বাসী গুড়ের গন্ধ ভাসছিল। পূর্ণিমার কথামত পাড়ার দু'তিন জন ছেলে আর সেই যুবনেতাসমেত শিশির গিয়ে হাজির। উনুনের ধোঁয়া, কাঠের মিস্ত্রীর কাশি, অন্ধকারে বিড়ি ফোঁকা দু'চার জনের মুখের কথার সঙ্গে দিশির গন্ধ বাতাসে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

উঁচু আলপথ দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন আলো জ্বালিয়ে ছুটে গেল।

হাঁকডাকে বটুক নাইয়ার বাবা অমূল্য নাইয়া বেরিয়ে এল। সঙ্গে মাইমুখে বাচ্চাসমেত তার বউ। বটুকের মা। সে-ই বেশী কাঁদতে লাগলো।

অমূল্য নাইয়া গরম ভিয়েনে কাজ করে করে কেশো রুগী। সে কথা দিল, তিন দিনের ভেতরে বটুককে খুঁজে বের করে এনে দেবে। তারপর মারুন, ধরুন, থানায় দিন—সে আপনাদের ইচ্ছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে যুবনেতা বলল, কোনো চিন্তা করবেন না দাদা। এ হল গিয়ে আমাদের ফিল্ড। সামনেই ইলেকশান। পালিয়ে যাবে কোথায়? ডাক্তারদা ঠিক ধরে ফেলবে। এখানকার সবার ক্রনিক পেটের রোগ। ব্যথা হলেই ডাক্তারদার কাছে যাবে। তখনই সনাক্ত হয়ে যাবে দেখবেন।

পাড়ার ছেলে রানা ফুটপাথে টেবিলের উপর ক্যারাম-বোর্ড চাপিয়ে সারাদিন ম্যাচ খেলে। রাতে রাস্তার আলোয় খেলে। হায়ার সেকেণ্ডারী ফেল করার আগে বারাসতে পীরের দরগায় রেজাল্ট জানতে গিয়েছিল। পীরসাহেব রানাকে বলেছিলেন, ফেল করবে।

রানার মুখেই সব শোনা শিশিরের। রানা বলেছিল, চাকরি পাবো?

না।

ব্যবসা হবে?

না।

আর চলছে না যে পীরসাহেব

এই চলছে-না অবস্থাই চলতে থাকবে।

সেই রানা শিশিরকে বলল, আপনার টাকা আদায় করে দেবো দেখবেন।

শিশির বলল, কি ভাবে?

সে আপনার দেখার দরকার নেই। আপনার টাকা পাওয়া নিয়ে কথা।

তাহলে দরকার নেই ভাই। মারধোর, থানা-পুলিসের হাঙ্গামা পোহাতে পারবো না।

কলকাতায় এবার বর্ষা কুথে কুথে এল। বাজারে শুধু পুঁইশাক আর পচা মাছ। স্টেটবাসের ভ্যাপসা ঘামের সঙ্গে কণ্ডাক্টরের ব্যাগের কাঁচা চামড়ার গন্ধ। অফিসে ভিজে ছাতার গা দিয়ে জলের লাইন।

ট্রানজিস্টারে দুষ্টু! মিষ্টি!! ছিঃ!!! মাইকের ন্যালবেলে গান আর শুধু সাবান কিংবা তালার গুণকীর্তন। জীবনে কিছুই করা হয় নি বুঝতে পেরে শিশির বিমর্ষ হতেই লাগলো। রুনু কাপড় কাচা আর শুকোনোকে শিল্প করে তোলায় হাত পায়ের আঙুলে হাজা বাধিয়ে বসে আছে। পৃথিবীর সবাঙ্গে শ্যাওলা বলে বটুকের কথা ভুলতে শিশিরদের বেশী দিন লাগলো না।

এক সোমবার বারুইপুর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেটে হিসেবপত্র করতে যেতে হল শিশিরকে। বাস থামলো বটতলায়। ধানক্ষেত থেকে মাটি তুলে বসতি হয়েছে। কচি পেয়ারার গাছ। পানের দোকান। এখানে পীচ রাস্তা সারাদিন পড়ে থাকে। বেশির ভাগই বাচ্চা ছেলে। তারা সবাই মিলে রাস্তার গায়ে ভিড় করেছে। মাঝখানে ঢাউস একটা বেলুন ভাসছে।

পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে শিশির উঁকি দিল।

আরে! এ যে বটুক দেখছি! চেনাই যায় না।

আরও ভাল করে তাকালো শিশির। হ্যাঁ। বটুক।

পরনে লাইন আঁকা পাতলুন। গায়ে ফুলতোলা চুড়িদার পাঞ্জাবি। মাথায় টেরি। কপাল তেলতেলে। এই মাসখানেকেই ছোকরার গায়ে সামান্য গত্তি লেগেছে। পায়ে হাওয়াই। পাকা ফেরিওয়ালার কায়দায় গ্যাস বেলুন বিক্রি করছে। গ্যাসের সিলিণ্ডার কাঁধে করে বইবার জন্যে দাড়িওয়ালা মধ্যবয়সী একজন মুটে এখন মাটিতে বসে জিরোচ্ছে।

বাঃ। পাকা ব্যবসায়ী বটুক বিড়লা এখন তো হাল ফিরিয়ে ফেলেছে। মূলধন আমার সেই একশোটা টাকা। তাতে জামাকাপড় কিনে ভোল

পাল্টেছে। তারপর সিলিণ্ডার ভাড়া নিয়ে বেলুনের কারবার। তোফা!' বটুকের বাতেলা শুনছিল শিশির, আর এসব কথা ভাবছিল।

মেটাল রোডের গায়ে একখানা টিনের পাতে লেখা স্টেট হাইওয়ে নাম্বার—সেভেন। খানিক এগোলে ধানক্ষেত। খানিক পিছোলেও ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে বসতি। মাটির ঘর। গোলপাতার চাল। বসে বসে দূরের বাঁশ বাগানের মাথায় বসা তেড়ো পাখির ডাক শোনা যায়। তার এক জায়গায় বটতলায় খানিকক্ষণের জন্যে বালক বটুক এখন ফেরিওয়ালা। সন্ধ্যেরাত থেকে এসব জায়গা ভোর অব্দি মরে পড়ে থাকে। কাল দুপুরে হয়তো এতক্ষণে বটুক কাছারি বাজারে আবার ফেরিওয়ালা হবে। ষোল কিংবা চুয়ান্ন নম্বরের পোড়া বস্তির জমাট অন্ধকার থেকে বাসী গুড়ের গন্ধ এত দূর ভেসে আসতে পারে না। শিশির এক সময়কার গাঁয়ের ছেলে। এতদিন শহরবাসী হয়েও রাস্তার এপারে একটু দূরে দাঁড়ানো হেঁতাল গাছটাকে চিনতে পারলো।

বটুকের বিজ্ঞাপন ভাসন্ত গ্যাস বেলুনটা নেমে পড়ছিল দেখে প্রোপাইটার বটুক নাইয়া তার কর্মচারী মাঝবয়সী দাড়িওয়ালাকে ধমকে উঠলো। ও বুড়োদা। বসে না থেকে একটু পাম্প কর।

লোকটা কলের পুতুল হয়ে উঠে দাঁড়ালো। সুতোলি বাঁধা ঢাউস বেলুনটাকে টেনে এনে গ্যাস পাইপে ফিট করলো। তারপর পাম্প। বেলুন আবার ভাসলো।

বটুক তখন ক্যানভাসারি ভাষায় চড়চড় করে বলে যাচ্ছিল—শূন্যে দুনিয়া দেখুন। মোটে পাঁচ পয়সা। আপনার হয়ে বেলুন মনুমেণ্ট দেখবে। ভিক্টোরিয়া দেখবে। গঙ্গা দেখবে। কলকাতা বেড়াবে। মোটে পাঁচ পয়সায় দুনিয়া দেখুন।

বলছে আর পাঁচটি করে পয়সা নিয়ে এক এক বাচ্চাকে বুড়োদার হেফাজত করে দিচ্ছে। বেলুন ফাউ।

বাচ্চাদের কেউ কেউ বটুকের চেয়ে বড়। তবু এদের মধ্যে ভূয়োদর্শী বটুককেই প্রবীণ বলা যায়। সরকারী টাকায় গড়ে ওঠা শিল্প এস্টেটের হিসেব দেখতেই শিশিরের এখানে আসা। মোটে একশো টাকাকে সঠিকভাবে কি করে খাটানো যায়, তাই দেখতে পাচ্ছিল শিশির।

ওই ভিড়ের ভেতর বটুক কাউকে ফাঁকি দিতে দিচ্ছিল না। পাঁচটি করে

পয়সা বুঝে নিয়ে তবে ফাউ বেলুনে গ্যাস ভরতে দিচ্ছিল। আবার নেহাৎ বাচ্চা—পয়সা নেই বলে শুধু হাতে ফিরে যাবে? তাকে নিজেই গ্যাস ভরে এমনিই বেলুন দিয়ে দিচ্ছিল। এটা-ও কি বটুকের বিজনেস ট্যাকটিকস? বটুক কি আসলে বিজনেস ব্রেইন, না নেহাতই ঘর পালানো ভবঘুরে বালক? কোন্ দাগে ছোকরাকে দাগানো যায় ঠিক করে উঠতে পারছিল না শিশির। কিংবা এও তো হতে পারে—বটুক নিজ দায়িত্বে দুনিয়ার নিরানন্দ বালক-বালিকাদের আনন্দ দেবে বলে ঠিক করেছে। তাই পৃথিবীর এ-দিকটা বেছে নিয়েছে নিজের পছন্দমাফিক। বগল বাজিয়ে হাপু খেলার নিয়ম জানে না বলেই গ্যাস বেলুনের পথ বেছে নিয়েছে।

শিশির দেখলো, এখুনি লোক জড়ো করে সে বটুককে পাকড়াও করতে পারে। ওর বডি সার্চ করলে কিছু টাকাপয়সাও পেতে পারে। তাহলে খোয়া টাকার খানিক তো উসুল হয়। পাশেই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেট। সেখানে গিয়ে বুক-পকেটের আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে শিশির লোকজন ডেকে আনতে পারে। ধরা পড়ার আগের মুহূর্তেও বটুক কিছু জানতে পারবে না।

এ বাজারে একশো টাকা কম কথা নয়। শিশিরের চার-পাঁচ দিনের মাইনে। কি করে ছেড়ে দেয়? দেবেই বা কেন? একটা বকাটে ছেলের জন্যে? হোতো গরিবের মেধাবী ছেলে—পড়াশুনোর বই নেই—তাহলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু বটুক?

ছোকরা ততক্ষণে পুরোদমে পাঁচ পয়সা করে গুনে যাচ্ছে। আর মাঝে-মাঝেই চেঁচাচ্ছে—আপনার হয়ে বেলুন শূন্যে দুনিয়া দেখবে। কালীঘাট দেখবে। দেখবে লেক।

এখানে নেমে একটা গান জুড়ে দিল বটুক।

লেকের ধারে দাঁড়িয়ে কে রে? কার মেয়েডি কালো—

বেশ সুর করে ফিরিয়ে গাইলো বটুক। আশেপাশের দোকানদারদের জন্যে এটি বটুকের টোপ। রসের স্বাদ মাখানো গান। বাচ্চারা সুর ভুলে গিয়ে একটু থমকালো। তারপর আবার সেই বেলুন।

দুপুরবেলার হাইওয়েতে বটুক এখন দিব্যি হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা। তাকে ঘিরে বড় ছোটো সবাই। এর ভেতরে শিশির একটা গোলমাল করে ফেললো। ভেতরে ঢুকে পড়ে খাঁ করে বটুকের জামা চেপে ধরলো। কি বহুরূপী? আমার একশো টাকা?

কে? কে তোমার টাকা নিয়েছে? জামা ছাড়ো বলছি—

চুরি করে চোটপাট?

গ্যাস সিলিণ্ডারের মাঝবয়সী মুটে সেই বুড়োদা চমকে উঠে দাঁড়ালো। তার পাওনা দু'দিনের মজুরী। এই গোলমালে নগদ আটটা টাকা তামাদি হয়ে যায় দেখে সে ছুটে এসে তার কচি মালিককে শিশিরের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল। গায়ে হাত দিচ্ছো কেন? যা বলবার মুখে বলো।

ঠিক এই সময় সুতোলি ছিঁড়ে গিয়ে ঢাউস বেলুনটা সোঁ করে শূন্যে উঠে গেল। এবার দুনিয়া দেখতে বেরিয়ে পড়বে নিশ্চয়ই।

নীচে তখন শিশির অন্য জিনিস দেখছে। দোকানদারের দল, বাচ্চারা, বুড়োদা, সবাই মিলে তাকে ঘিরে ধরেছে।

কেউ বলছে, বাবু, এ তোমার সে বটুক নয়। কারবারী ছেলে কেন পরের বাড়ি বাসন মাজতে যাবে? চুরিই বা করবে কেন?

পুরো ঘটনাটা বলে শিশির ভেবেছিল, সবাই তাকে সায় দেবে। কিন্তু ফল দাঁড়ালো উল্টো। বটুক বলল, আমি তোমায় চিনি নে। কার কথা বলছো? কোন্ একশো টাকা?

এ তো মহা মুশকিল হল!

এক দোকানদার বলল, ছোট ছেলের হাতে একশো টাকা দিতে গেলে কেন? রেজগি করে রাখলে পারো। রোজকার খরচ আলাদা করে রাখবে। রাত হলে পাকা খাতায় লিখবে।

মহা চটে গিয়ে শিশির বলল, আমি কি দোকানদার? রেজগির ধার ধারি।

রেজগির ধার সবাইকে ধারতে হয় বাবু। এক সময় না এক সময় কাজে লাগে।

শিশির ভাবছিল, হোতো কলকাতা—তাহলে বাছাধন এতক্ষণে টের পেতো। রেগে-মেগে শিশির তার আইডেনটিটি কার্ডখানা বের করে দেখালো। এই দ্যাখো। আমি অফিসে চাকরি করি। থানা-পুলিশ করলে টের পাবে।

থানা-পুলিসের ভয় আজকাল সবাই দেখায় বাবু। একটা মামলা ঠুকে দেখতবে এসো। এমন ছোকরা কারবারীর ভাতে হাত দিও না বাবু।

পাকা চোর।

তাতে আপত্তি করে উঠলো স্বয়ং বটু। ইস্। নিজি কি? নিজি? ভদ্দর

লোকদের আমরা ভালো করে জানি।

শিশির জানে, ব্যাপারটা এবার ঘোরালো হয়ে যাবে। এখুনি এদের যদি সে অমূল্য নাইয়াকে দেখাতে পারতো। পূর্ণিমা কিংবা বটুকের মাকে। তাহলে? তাহলে এতখানি বোঝানোর, বিশ্বাস করানোর ঝামেলা থেকে বাঁচতো। টেরি বাগানো বাছাধন তাকে মানে মানে টাকা বের করে দিতে বাধ্য হোত।

কিন্তু কোথায় কলকাতা? আর কোথায় বারুইপুরের ফুলতলার মোড়? সবই ভাগ্য। টাকা খোয়া গিয়ে এখন শিশির নিজে চোর বনতে চলেছে. প্রায়। নাহলে এত কৈফিয়ত দিতে হবে কেন তাকে? তার না পায়ের জুতো খুলে বটুককে পেটানোর কথা। তা নয়—

একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল শিশির। সেই ফাঁকে একটা সাত-আট বছরের খালি গা ছেলে তার হাত থেকে আইডেনটিটি কার্ডখানা ছোঁ মেরে তুলে নিয়েই দৌড়।

শিশির খানিকটা ছুটে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। পুকুরের গায়ে সরু পায়ে-চলতি পথে সজনে ফুল ছড়িয়ে আছে। জিওলের আর ভেপলতের কাঁটাওয়ালা ডালের বেড়া। কোন্ দিকে গেল বাচ্চাটা? মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড়। আইডেনটিটি কার্ড খোয়া গেলে তো চলবে না। তাহলে অফিসে শতেক খোয়াড় হবে তার।

ভাঙা ভিড়ের দোকানদারদের কাউকেই বোঝাতে পারলো না শিশির—আইডেনটিটি কার্ড জিনিসটা কি?

পানওয়ালা বলল, আবার গোড়া থেকে বল তো বাবু।

শিশির দেখলো, আজ তার উদ্ধারের রাস্তা নেই। এখন যদি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেটের লোকজনকে গিয়ে ও বলে—তারা তাকে বিশ্বাসই করবে না। বলবে, আপনি একজন অফিসার হয়ে গ্যাস বেলুনওয়ালার কাছে গিয়েছিলেন কেন? বুঝিয়ে বলতে গিয়ে আরও জটিল করে ফেলবে শিশির।

মাঝবয়সী বুড়োদা সিলিণ্ডার কাঁধে তুলে নিল। বেলা পড়ে এসেছে। দোকানদাররা দোকানে ফিরছে। ভাসন্ত বেলুনের পেছন পেছন বাচ্চারা পীচ রাস্তা ফেলে গাঁয়ের পথ ধরলো। পুকুরপাড়, ঢেঁকিঘর, গোলাবাড়ি, ছেচতলা—সবই দেখা যায় রাস্তা থেকে, কিন্তু সেই বাচ্চাটি? যে শিশিরের আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে ছুটেছে, তার টিকিও কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

সে নিশ্চয় এতক্ষণে আইডেনটিটি কার্ডখানা খড়ের সঙ্গে গাই-কে খাইয়ে দিয়ে বসে আছে। কিংবা ধানসেদ্ধ করার বড় চুলোতেও ফেলে দিতে পারে। ওর তো এ-সবের মর্ম বোঝার কথা নয়। কোন্ বাড়ির ছেলে তাই বা খুঁজে বের করবে কি করে? সবাই তো এখানে খালি গা। আনমনে জিনিসটা নষ্ট করে দিয়ে ছেলেটা হয়তো খেলতে ছুটেছে এতক্ষণে। ভুলেই গেছে আইডেনটিটি কার্ডের কথা।

বটতলা ফাঁকা। গ্যাস সিলিণ্ডার কাঁধে বুড়োদার পিছুপিছু কচি কারবারী বটুক নাইয়া চলেছে। মাথায় টেরি। ডোরাকাটা পাতলুন। গায়ে কাজকরা চুড়িদার পাঞ্জাবি। আজ শিশিরের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেটে যাওয়া মাথায় উঠলো। ওদের পুরনো হিসেব খুঁটিয়ে দেখার কথা ছিল।

এই বটুক! বটুক—

কি বলছো বল।

কাছাকাছি কেউ নেই। চারদিক দেখে শিশির বলল, এই তো বেশ সাড়া দিলি।

আমার দাঁড়াবার সময় নেই। যা বলবে বলে ফ্যালো।

শিশির অবাক হচ্ছিল। এই সেদিনের বটুক, যে কিনা তার বাড়িতে কাজে থাকতে সাত চড়েও রা কাটতো না, সে এ'কদিনে কারবারী বনে গিয়ে দিব্যি সোজাসুজি কথা বলে। কোন ভয় ডর নেই। মাইনে করে মুটে রেখেছে।

তোর মা বড় কান্নাকাটি করছে।

ফিরে গিয়ে বোলো, আমি ভালো আছি।

বাড়ি ফিরবি নে?

এখন না। হাতে দুটো পয়সা হোক। তখন ফিরবো। এখন যদি যাই তো কারবার লাটে উঠবে। তোমরা পিটিয়ে পিটিয়ে ছাল তুলবে।

চুরি করে পালালে পেটাবো না?

সেইজন্যই তো রোজগার করে তবে ফিরবো। তখন নগদ একশো টাকা ফেলে দিলে কিছু কি আর বলতে পারবে? যাই—। ও বুড়োদা, একটু আস্তে হাঁটো।

একটু উপকার করবি?

তাড়াতাড়ি বল।

আইডেনটিটি কার্ড বললে বটুক বুঝবে না। তবু কলকাতার ষোল নম্বর পোড়া বস্তির অনেকদিনের বাসিন্দা। চাকরি-বাকরি কী জিনিস জানে। অফিস বলতে কী বোঝায় তাও জানে।

পূর্ণিমা তোর খুব বিপদে পড়েছে। ওর দাদারা তোর জন্যে ওকে মারধোর করেছে।

পূর্ণিমাদিকে বোলো, আমি ফিরে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বটুক এখানে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

সেই সময় শিশির বলল, বাচ্চা ছেলেটা আমার অফিসের একখানা কাগজ নিয়ে ছুটলো। আর ফিরলো না রে বটুক। মহা মুশকিল।

অফিসের কাগজ?

হ্যাঁ রে। তুই একটু দেখবি বাবা?

কেমন ছিল দেখতে যেন?

আমি তো মনে রাখি নি বটুক। খালি গা ছিল। নীল হাফপ্যান্ট।

কোন দিকে গেল?

ওই পুকুরপাড় ধরে—

ও বুড়োদা। বুড়োদা গো—। বটুকের লম্বা ডাকে তার মাইনে করা লোক দূরে আরেকটা গাছের নীচে দাঁড়ালো। একটু জিরিয়ে নাও। এখুনি যাচ্ছি। তারপর শিশিরকে বললো, একটু হাতে-পায়ে চলো। তোমার কাজ সেরে সন্ধ্যের আগে কাছারি বাজারে আরেকবার বেলুন ভাসাবো। তাড়াতাড়ি হাঁটো।

পুকুরপাড়, সজনেতলা, ঢেঁকিঘর। এবড়ো-খেবড়ো মাটি। শিশির বটুকের সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না। তেপলতের বেড়া দেওয়া ঘর-গেরস্থালীর ভেতর দিয়ে ডোরাকাটা পাতলুনটা পাই পাই করে এগোচ্ছে।

তারা বাজি

ভূতচতুর্দশীর দিন পাড়ার একপাল মেয়ে জুটিয়ে অন্নর বাড়ন্ত গড়নের নাতনিরা পুকুড়পাড়ে, বকুলতলায়, খালধারে চোদ্দ রকমের শাক খুঁজে খুঁজে তুলে এনেছে। খাওয়া দাওয়া মিটতে মিটতে রোদ পড়ে এল। বেলা ছোট হয়ে এসেছে। রাখাল ছেলেটা বেশ আলো থাকতেই গরুগুলো গোয়ালে তুলে দিয়ে অন্নর নাতিদের সঙ্গে গিয়ে ভিড়ে পড়ল। কাল কালীপুজো। তুবড়ির খোলে মসলা ভরা সারা। সেগুলো এখন দু'একটা জ্বালিয়ে দেখা হবে।

বছর ঘুরতে চলল—অন্নকে একাহারী হতে হয়েছে। অভয় চক্কোত্তির পিণ্ডিদানের সময় হয়ে এল। এতটুকুন সব নাতনি হই হই করে আজকের নিয়মকানুন মেনেছে। উঠোনের দক্ষিণে বড়ঘরের উঁচু বারান্দার পোটোয় বসে দূর থেকে তাদের ঠাকুমা কোনটার পর কি করতে হবে দেখিয়ে দিয়েছে।

বেলাবেলি খেতে বসে ভাত কিছু পোড়া লেগেছিল। আঁচিয়ে দেখলো বোকনোর তলা ধরে গিয়েছিল। ঘাটলায় ডুবিয়ে রাখতে এসে অন্নর চোখে পড়ল, পুকুরের পুব পাড়ে বড় ছেলে ভুবনের হাতে পোতা বৃষকাঠের মাথায় একটা কাক বসে। এঁটো কলাপাতার ওপর উড়ে এসে বসার জন্যে লেজ তুলে ঝোঁক নিচ্ছে।

বিয়ে হয়ে ইস্তক এবারের মত কায়কল্প বৃষ্টি আর দেখে নি অন্ন। পর পর দু'বছর খরার পর জো মত বর্ষা পেয়ে মোটা মোটা ধানের গোছে মাঠে পা ফেলার জায়গা নেই।

এই ত সেদিন রোয়া হল। এরই মধ্যে পাতায় কি ধার। খোয়ালি দেবারও উপায় নেই। ঠিক ঠিক জল পেয়ে তেজি জমিতে চারদিকে মেঘের

চেয়ে কালো করে গাছ ঠেলে উঠেছে। তারই মধ্যে কোম্পানির উঁচু পুরনো ভেড়ির পিঠ এখানে সেখানে জেগে আছে শুধু। চৌদিকের আবাদ ঠেলে রাস্তাটা এগিয়েছে। তার ওপর দিয়ে মানুষজন, গরুবাছুরের যাওয়া-আসা চোখে পড়ে।

ভুবনের বাপের মুখে ধানচারার আরেকটা নাম শুনেছিল অন্ন। অমরলতা। অভয় বলত, যেখানে পুঁতবে মাথা ঠেলে উঠে দাঁড়াবে। মার নেই কোন। সত্যি তাই। ক'দিন পরেই বছর ঘুরে যাবে—মানুষটা নেই। গতবারও চাষের মরসুমে সারাদিনের খাটাখাটুনির শেষে আবাদবাড়ির পুকুর থেকে কই ধরে ধরে খেয়েছে। এবারে মাথার ওপর লোকটা ছিল না একদম। ভুবন সাহস করে হালের গরু কিনল। সবটা ভাগে না-দিয়ে কিছু জায়গা নিজ চাষে রাখল। উৎসাহের চোটে পুকুরধারে কয় কলি রুয়েছিল। সেগুলোও এখন মাথা ধরে উঠেছে। সব সময় খালধারের ধোয়াট জল গিয়ে পড়ছে সেখানে।

কলকাতার ট্রেন এসে ভেড়ি আড়াল করে দিল। কাকটা এঁটো পাতা পুকুরে নিয়ে ফেলেছে। একেবারে বৃষকাঠ বরাবর। ঢেউ দিয়ে দিয়ে অন্ন খানিকক্ষণ তা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। হল না। বাবাকেলে ভিটে ছেড়ে এখানে উঠে এসেই অভয় এই পুকুরটা কাটিয়েছিল।

বড় শখের একটা মাছ ছিল অভয়ের। ভুবন হওয়ার পর হাতে খানিক ভাত নিয়ে দুপুরে ঘাটলায় আচাতে বসে ডাক দিত—বর্ণ—বর্ণ। বোঁ করে পুকুরের কোন্ তল থেকে জল ঠেলে হাজির হত মাছটা। রান্নাঘর থেকে কোন কোন দিন 'যাই' বলে অন্নও ছুটে যেত। ভুল বুঝে মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ত। গৌরবর্ণের লম্বা মানুষটা একমনে ভাত ছড়াচ্ছে পুকুরে। প্রাণে সব সময় ফুর্তি ছিল ভুবনের বাপের। এই মানুষই একা সারা তল্লাটের মামলা-মোকদ্দমা তদ্বির তদারক করে বেড়াত। বিয়ের পর থেকে নাগাড়ে বাহান্ন বছর লোকটাকে রাতে খই দুধ খাইয়েছে অন্ন। গোহালে গাই পুষেছে। বড় তোয়াজের শরীর ছিল।

ভুবনের বড় মেয়েটা খুব ধিঙ্গি হয়েছে। পাড়ার সইদের নিয়ে চোদ্দ প্রদীপ দিতে বেরিয়েছে। টাঁটির তেল পুড়ে চিটপিট আওয়াজ হল। তুলসীতলায়, খিড়কিতে তারপর ঘাটলায় এসে থামল পুরো দলটা, 'এখানে কি করছিলে ঠাকমা?'

'এঁটো পাতা ফেলেছিস একেবারে পূবধারে—'

'কেন কি হয়েছে ?'

অন্ন খুলে বলতে পারল না—তোমার দাদুর বৃষকাঠখানা ওদিকে। একবার মুখ তুলে তাকাল। শ্রাদ্ধের অত ক্রিয়াকাণ্ডের শেষে তার চিহ্ন বলতে এইটুকুই পড়ে আছে। নাতিদের তুবড়ি হুস করে আকাশে উঠে ফুলঝুরি ঝরাচ্ছে। কোত্থেকে যে এত আনন্দ হয় ওদের। এইত সেদিন ভুবনের বাপ গেল। বছরও পেরোয় নি।

ভুবনের কোলের ছেলেটা বাজির প্যাকেট হাতে মেয়েগুলোর ঠিক পেছনে উবু হয়ে বসে লম্পের আগুনে একটা বাজি ধরাচ্ছিল। লম্পটা সরিয়ে নিতে গিয়ে দেখল, লম্বা কাঠি মত কি একটা জিনিস।

'তোদের আঁচলে আগুন ধরে যাবে যে—', বলতে বলতে অন্ন লম্পটা হাতে নিল। ততক্ষণে ছেলেটার হাতখানেক দূর দিয়ে তারা খসতে শুরু করেছে। ঘোর অন্ধকারে মেয়েগুলোর মুখ দেখা গেল। সবাই হাসছে। মিস্ত্রীদের মেজো মেয়ে তারাবাজির আলোতে হাত ডুবিয়ে তুলে নিল। সব আলো ঝির ঝির করে তারা হয়ে খসে যাচ্ছে।

খড়ের গাদার পাশেই ধাড়ি ছাগলটা আছে। চারটে বাচ্চা দিয়েছে। অন্ন লম্প নিয়ে ওদের দেখতে গেল। যাবার সময় বলল, 'হয়ে গেলে বাবা পুকুরে ফেলে দিও। নইলে এই ঘুটঘুটে আঁধারে পোড়া বাজির ওপর পা পড়লে দেখতে হবে না—'

'জলে যে ছ্যাঁক করে ওঠে ঠাকমা।'

ধানসেদ্ধর কাঠকুটো জড়ো করে রাখা হচ্ছে কিছুদিন। তার পাশ দিয়ে খড়ের গাদায় গিয়ে দাঁড়াতেই বাচ্চাগুলো চেঁচিয়ে উঠল। অন্ন ফিরে আসছিল। হঠাৎ খুব পাকা কাঁঠালের গন্ধ পেল। তারপর বাচ্চাগুলো এক সঙ্গে ডেকে উঠল। ভাম ? নয়ত বুড়ো শেয়াল ? এমন নাক আটকানো গন্ধ আর কার গায়ে থাকবে। ফিরে তাকাতেই অন্নর হাত থেকে লম্প পড়ে গেল।

সাদা মত ছোট্ট একখানা কুলো। আলোর মুখে ঝক ঝক করে ঠেলে উঠেছে।

'ভুবন! ভুবন—' ডাক তুলে অন্ন একেবারে সামনের বারান্দায় এসে পড়ল।

জালের সুতো ভেজাবার গাবের আঠা জ্বাল দিচ্ছিল ভুবন। ছুটে এল।

'সাপ। পদ্মগোখরো।' হাঁপাতে হাঁপাতে আর যা বলল অন্ন, 'বুড়ো। এই এ্যাতখানি চর্বি গলায়—'

'কোথায় ?'

'লম্প পড়ে আছে খড়ের গাদার ধার দিয়ে—'

বাচ্চাদের বাড়ির ভেতর ঢুকতে বারণ করে ভুবন বড় ছেলেকে নিয়ে লাঠি হাতে ভেতরে ঢুকলো। ছেলের হাতে আলো দিয়ে প্রথমে লম্পটা কুড়িয়ে নিল। তারপর ভাঙা টালির গাদা থেকে একখানা একখানা করে টেনে সরাতে লাগল। পাওয়া গেল। কালো। চর্বিতে লদ লদ করছে। সেই শরীর নিয়ে সাপটা সেকেণ্ডের মধ্যে রান্নাঘরে উঠে গেল। ভুবন বাড়ি দিল। ফসকে গেল।

তারপর রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়ি কলসি সামলে আরেকটা বাড়ি দিতে হল। মোক্ষম জায়গায় লাগল। সাপটা মাথা ঠেলে উঠতে চাইল। ভুবন এবারে কোমরে এক ঘা বসাল। তারপর গুনে গুনে তিন ঘা। বাকী যেটুকু ঝটপটানি খালধারে খিরিশতলায় ফেলে আগুন দিতেই থেমে গেল। পুড়তে কি চায় !

শুধু চর্বি। ভুবন বলল, 'বাদার গর্তে গরম লাগায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল।'

চোদ্দ দিকের চোদ্দ প্রদীপ নিবে গেছে। দূরে দু'একটা দোবোমা ফাটার আওয়াজ। ভুবন কোলের ছেলেকে নিয়ে ঘুমোচ্ছে। ছেলেটার মাথার কাছে বাজির বাক্স।

সন্ধ্যেবেলা যাকে ধিঙ্গি মনে হয়েছিল, তাকেই এখন কচি লাগল অন্নর। গলা জড়িয়ে ধরে হাতে হাত রাখল মেয়েটা, 'একি ঠাকমা। এমন করে কে আঁচড়ালো তোমাকে—'

'ক্ষেত্র পালের ঘোড়া—'

'তার মানে ?'

'ওই একটা কথা আর কি ! অন্য কেউ নাম ধরে মনে করলে, চর্চা করলে, অমন দাগ পড়ে গায়ে। কেউ কেউ বলে চর্চা পোকায় আঁচড়েছে—' তারপর কি মনে হতে থেমে গেল অন্ন। ফট করে বলে দিল, 'আজ একটা

ফাঁড়া কেটে গেল আমার। তোর দাদুকেও সাপের হাতে পড়তে হয়েছিল—'

'কেমন?'

'তোদের রূপ তখন ইসরালের পোড়ো। আমি বাড়ির বৌমানুষ। ভিটেবাড়িতে বড় সংসারে আছি। গরমকালে বারান্দার ধারে খাট পেতে শুতেন তিনি। সামনেই মাটির মোটা দেওয়াল। খাট ঘেঁষে একটা গর্ত। রোজ ভোরে গোবর লেপে বুজিয়ে দিই। পর দিন দেখি আবার গর্ত। ইঁদুরের কাণ্ড হবে ভেবে গা করি নি। একদিন মানুষটা ঘুমের ঘোরে কোল-বালিশে গর্তটা চেপে শুয়েছে। পরদিন দেখি, কোলবালিশের অনেকটা গর্ত বরাবর কুরে কুরে ফুটো করা।'

'সেদিন সন্ধ্যেবেলা এসেই শুয়ে পড়ল তোদের দাদু। ঘুমোলে মানুষটা ভারী হয়ে যেত। উঠোনে জ্যোছনায় তোদেব বাবা কাকা খেলছে। আমি এমনি লম্প হাতে বেরিয়ে এসে দেখি, গর্তের ভেতব থেকে কালকেউটে বেরিয়ে এসে ওনার পায়ের উপব দিয়ে নামছে। সেদিনও আলো পড়ে গেল হাত থেকে। উঠোনে লাফিয়ে নেমে খুড-শ্বশুরের কাছে ছুটে এলাম। তিনি শুনেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে সাবধান করলেন—'আস্তে হাঁটো। দাওয়ায় কেউটে।'

'লম্পটা উল্টে পড়ে খাটের পায়ায় বেধে গিয়ে জ্বলছিল। আলোতে সাপটা দেওয়াল বেয়ে গর্তে ফিরে যাওয়াব চেষ্টা করছে বাব বার। দেওয়াল হড়কে নীচে পড়েই ক্ষেপে উঠছে।'

'শ্বশুর মশাই ডাকলেন, অভয়—অভয়। খাট থেকে এক লাফে উঠোনে নেমে পড়। বারান্দায় রাজগোখরো।'

'কয়েক ডাকে উঠলেন তিনি। ঘুম থেকে উঠলে মানুষটা ঢিলে হয়ে যেত। সেই অবস্থায় হুড়মুড় করে উঠোনে পড়লেন।'

'সাপটা মারা হল। সেই রাতেই দেওয়াল ভাঙা হল। ভেতরে গোল গর্ত। গোখরোর গায়ের ঘষানিতে তেল হয়ে আছে।' খানিক চুপ করে থাকল অন্ন। সেদিনের সেসব ঘটনা ফিরে ঘটলে মানুষটা বেঁচে উঠত।

কার্তিকের তেসরা। ডাঙার গেঁতু ধানের শিষে দুধ এসে দানা ভারী হয়ে উঠেছে। জ্যোৎস্নায় শেষরাতে কোত্থেকে টিয়ার ঝাঁক এসে নামছিল

কদিন। এখন আর তারা আঁধারে পথ পায় না। শীত খুব জাঁক করে নামবে শীগ্‌গিরি। অন্নর পাশেই বড় নাতনি খুকিটির মত হাঁ করে এখন ঘুমোচ্ছে। এইমাত্র গল্প শুনছিল। খিরিশতলার আগুনটা ধিকি ধিকি জ্বলছে।

অন্ন আর ভেতরে গেল না। মাদুরখানা পাকিয়ে বালিশ করে সেখানেই গা ঢেলে দিল। তখন আধপাকা কলার কাঁদি ঘিরে কয়েকটা চামচিকে উড়তে লাগল।

'তুমি চিনলে না? আমি এসেছিলাম অন্ন।'

'ও মা! কখোন এলে—' বিশ্বাস হচ্ছিল না অন্নর। 'আজ যা একটা ফাঁড়া গেল কি বলব তোমায়—' তখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না।

বারান্দায় বসল মানুষটা। চারদিকে কাঁঠালের গন্ধ। ঘুমন্ত ভুবনকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল, তারপর বলল, 'জানি। খড়ের গাদার ধারে তুমি যে অমন চমকে উঠে আলো ফেলে দেবে ভাবি নি। নইলে—'

'তুমি-ই— !'

চৌচালার তেল-খুঁটিতে হাত পড়ে হড়কে গেল। আঙুলে খটাং করে লাগতেই অন্ন উঠে বসল। ক্বা ক্বা করে কিসব পাখি এক সঙ্গে হেসে দিল। ভাসা ভেড়ির ওপর দিয়ে খামারবাড়ির অনেকগুলো কুকুর কি একটা তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর জড়ানো একটা গোঙানি। একটা প্রহর কাটলো নিশ্চয়। এইমাত্র এখানে ছিল মানুষটা। বিশ্বাস হয় না। অন্ন উঠে দাঁড়াল।

একফালি চাঁদ থাকলেও কিছু দেখা যেত। চারদিকের আকাশ কালি-গোলা। খালধারে উঠে এল অন্ন। মাঝ-রাতের বাতাসের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে অল্পখানি জায়গা নিয়ে আগুন সাপ পোড়াচ্ছে।

কাছে যেত না অন্ন। কি দেখে ঘুরে দাঁড়ালো। ভুবনের কোলের ছেলেটা উবু হয়ে বসে একটা কাঠি গুঁজে দিতে চাইছে আগুনে। ভাল জ্বালা। তিন বছরের খোকাটি সন্ধ্যে বোঝে না। নিশুতি রাত বোঝে না। ঘুম ভেঙেছে তো উঠে এসেছে।

'কি করছিস? এই দ্যাখো হাত পুড়বে যে—'

ধরে ফেলল অন্ন। বাঁ-হাতে বাজির বাক্স।

'ছ্যাকা লাগবে ঠাকমা—সরো, সরো—'

ততক্ষণে হাতের কাঠির মাথা গলে তারা ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে—ঝিরঝির করে।

ভয়ংকর দস্যি। অথচ ঘুমোলে ভারী হয়ে যায়। তুলতে গিয়ে দেখল, আগুনে পোড়া ঘামে কি চড় চড় করে জ্বলছে।

'ছ্যাকা লাগবে—'

'লাগুক।' বলে কোলে তুলে ফেলল অন্ন। এমন আঁধার—পুকুরধার—ধারের বৃষকাঠ—কিছুই চোখে পড়ে না। তারা ছিটিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে বাজির বারুদ।

খরার পরে

ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পর পর ছিমছাম তিনখানা একতলা বাড়ি দেখে গোবিন্দর মনে হয়েছিল, এমন অগামার্কা জায়গায় এই তিনটি বাড়ির মালিক নিশ্চয় খুবই রুচিবান। কিন্তু কোনদিনই আগ বাড়িয়ে যেচে আলাপ করা তার ধাত নয় বলে সেই তিনজন রুচিবানের সঙ্গে তার কোন পরিচয়ই হয়নি। গত ২৮শে জুন রাতে এমন একটা ঘটনা ঘটল যে, তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে তার ইচ্ছা থাকলেও আর আলাপ করার উপায় থাকল না।

কারণ সেই ভদ্রলোক অর্থাৎ সুবোধ দত্ত ওইদিন রাত সওয়া আটটায় খুন হলেন। সুবোধ দত্তকে গোবিন্দ প্রামাণিক অবশ্যই স্টেশনে নয়ত গম ভাঙানোর লাইনে কিংবা ডাকঘরে দেখে থাকবে। কিন্তু মুখোমুখি আলাপ হয়নি বলে তার পক্ষে স্থির করা কঠিন হল, আসলে কে খুন হলেন।

খবরটা শোনার পর নিহত বলে যাকে মনে হয়েছিল, তার সঙ্গে দুদিন বাদে স্টেশনেই দেখা হল। অতএব ইনি খুন হননি। তাহলে কে হলেন ?

এই আগ্রহটুকুও তাকে ক'দিনের মধ্যেই জলাঞ্জলি দিতে হল। ছোট মেয়ে বছর পুরোতেই আনারসের মাথি খেয়ে প্রচণ্ড গোলমালের মধ্যে পড়ে গেল। বড় মেয়ের অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খেলেই চোখের ভিতর আঙুনি বেরোয়। গোবিন্দর বউয়ের আজ সতের বছর রাত ন'টা বাজতেই পেট ফাঁপে। বাঁ পায়ের গোড়ালিতে মোক্ষম একটা যন্ত্রণা পুষে রেখে গোবিন্দ স্থির করেছে, এটা তার মোবাইল ক্যানসার। কেননা রাতের দিকে সেটা হাঁটুতে ওঠে। গুপো বোধহয়।

সুতরাং সুবোধ দত্তের বিবরণ যত বিশদই হোক না কেন, নানান ফ্যাচাংয়ে জব্দ বলে তার মনে কিছুই ধরত না। কেউ বলত, অমন লোক হয় না। একজন বলল, বড় ধার্মিক ছিলেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের ট্যাক্স রসিদে দেখা গেল, খুন হওয়ার তিন দিন আগে চার বছরের বকেয়া বসতি-কর তিনি একসঙ্গে পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

গত ২৮শে জুন সন্ধ্যে থেকেই একটানা ভয়ঙ্কর খরার পর বছরের প্রথম বৃষ্টি নেমেছিল। ২৯শে জুন ভোরে গোবিন্দর বাড়িওয়ালা বলেছিল, সুবোধবাবু কাল রাতে দোতলার সিঁড়ি থেকে পড়ে-মারা গেছেন। অমন বৃষ্টির রাতে মড়া পোড়ানোর এক্সপার্টরা এমন একটা ভাল সুযোগ হারাল। কেননা, পোড়াতে হলে সুবোধবাবুকে কাঁধে করে পাঁচ মাইল দূরের মিউনিসিপ্যাল শ্মশানে যেতে হত। হল না, কারণ সুবোধ দত্ত ছিলেন খৃষ্টান।

স্ত্রী বীণা দত্ত সুবোধকে গোয়াল-ঘরে মাটি দিলেন। এরপর আর সুবোধ, বীণা ইত্যাদিদের আপনি আপনি করা পোষাবে না। লোকাল খৃষ্টানরা প্রশ্ন তুলেছিল। বীণা তাদের এই বলে থামিয়ে দিল, ওনার ইচ্ছে ছিল নিজের জায়গায় শোবেন। ফলে গোর দেওয়ার সময় সমাজের কেউ থাকল না। না থাকাতে বীণার সুবিধাই হল।

কিন্তু হিন্দু হলে বীণা এ যাত্রা বেঁচে যেত। ৩০শে জুন সন্ধ্যেবেলা পুলিশের সামনে তিনজন ডোম কাঁচামাটি তুলে সুবোধকে বের করল। বাঁ কান নেই—খুলির গর্তে মাটি বসে গিয়ে কালো হয়ে গেছে।

সুবোধকে ওপরে তোলার সময় সাক্ষী ছিল বীণার খুড়তুতো ভগ্নীপতি বিপুল দাম, পাতানো মামা ডাঃ সুখেন রায় ডি টি এম আর টাইলের পাইকারি ব্যবসাদার অজিত বসু। তিনজনই পঞ্চাশোর্ধ্ব। এদের সামনে বীণা বিয়ের পর বছর তিনেক গুডফ্রাইডের শেষ রাতে সরল ধর্ম-সংগীত গেয়েছে।

তারপর আর পাঁচজনের সঙ্গে গোবিন্দও শুনলো সুবোধ দত্ত খুন হয়েছে। একে খুন তায় নারীঘটিত—ব্যাপারটা বাসন্তীর চানাচুরের চেয়েও আগে আগে ট্রেনের কামরায় চাউর হয়ে গেল।

নিজের নানান কাজে জড়ানো বলে গোবিন্দ এমন ব্যাপারটাও গোড়া মিলিয়ে শুনে মনে রাখার চেষ্টা করল না। তবে ওই পথ দিয়ে যাওয়ার

সময় এবার দেখল, গেটে বসানো পাথরে বাড়ির নাম লেখা—দয়া। তার উল্টোদিকে ধানক্ষেতের মাটি কেটে ভরাটি জায়গায় দশ ইঞ্চি দেওয়ালের একটি পলকা চার্চ, রানীগঞ্জ টালির লাল ছাদে শাদা রঙের ক্রস।

বিঘে দুয়েক জায়গার ওপর বাড়িটা। কম্পাউণ্ড ওয়ালের পাশে পাশে সুপুরির সারি—অনেকটা ফাঁকায় কলমের আম আর লিচু গাছ। মাঝখানে সেই আধা-বাংলো।

থাকার পক্ষে আইডিয়াল বাড়ি। অন্তত বাইরে থেকে দেখে তাই মনে হল। বাড়িটা ভাড়া পাওয়ার ইচ্ছে হল গোবিন্দর।

কানাকানিতে যা শোনা গেল, তাতে একখানা নভেল হয়ে যায়। সে-সব কথায় যাওয়ার আদৌ দরকার নেই।

শুধু বলা প্রয়োজন, বয়স ভাঁড়িয়ে সুবোধ গত সনে বাষট্টি বছরে রিটায়ার করার দশ সাল আগে বীণাকে বিয়ে করে। তখন বীণার ছিল সতেরো, সুবোধের বাহান্ন।

বীণার আগে সুবোধ আরও দু'বার বিয়ে করে। প্রথমার সঙ্গে বছর না ঘুরতেই ছাড়াছাড়ি, দ্বিতীয়ার খবর কেউ জানে না। অপুত্রক সুবোধের ঔরসে বীণার গর্ভে প্রথমে একটি ছেলে পরে একটি মেয়ে হয়েছে।

এই দুই নাবালককে বি-এ পার্ট ওয়ানের একটি ছাত্র পড়াতে আসত। নাম জানতে পারেনি গোবিন্দ। সুবিধার জন্য ধীরেন বলা যেতে পারে। জনশ্রুতি, ধীরেন মান্নার বয়স বাইশ। আর চার স্টেশন উজিয়ে একটা শুকনো নদী পার হয়ে তার বাড়ি। সেখান থেকে সে রোজ এখানে পড়াতে আসত।

বীণা গত ২৮শে জুন এই ধীরেনকে দিয়ে সুবোধকে খুন করায়। সামনের বসবার ঘরটা সবচেয়ে বড। সেখানে সন্ধ্যে থেকেই ইজিচেয়ার নিয়ে সুবোধ বসে থাকত। তখনই নাকি তাকে শেষ করা হয়। সেদিন বিকেল পর্যন্তও খরা ভেঙে বৃষ্টি নামেনি। তবে সবার সঙ্গে গোবিন্দও সেদিন আশা করেছিল, খুব জল হবে।

জীবনের শেষ ক'দিন আগে সুবোধ যে কটা বড় বড় কাজ করেছে, তার মধ্যে একটা বকেয়া বসতি-কর ক্লিয়ারের কথা আগেই বলা হয়েছে। সমাজের নাতনিসমা এক স্কুল শিক্ষয়িত্রীকে সুবোধ বলেছিল, এ বাড়ি আর ভাল লাগছে না—পারলে দু' স্টেশন এগিয়ে জংশনে গিয়ে ভাড়া বাড়ি নেব।

পাড়ার একটি বি এস-সি পাশ ছেলে অঙ্কের টিউটোরিয়াল খুলবে। তিন নম্বর বড় কাজ হল, সুবোধ তাঁকে মাসিক ষাট টাকা ভাড়ায় সামনের দু'খানি ঘর ভাড়া দিতে স্বীকার হয়েছিল। ছেলেটি ট্রেনে বসে গোবিন্দকে সুবোধের পোস্টকার্ড দেখিয়েছে। চার ও শেষ নম্বরের ব্যাপারটিই সবচেয়ে ইন্টারেষ্টিং। সুবোধ দত্ত স্থানীয় সরদারদের মেদিনীপুর জেলার ভীমপুরায় একলপ্তে বাইশ বিঘের বাঁশবাগান কিনবে বলে মবলক আটত্রিশশো টাকা বায়না করেছিল। ইচ্ছে ছিল বাঁশ চালানের ব্যবসা ধরবে।

এর থেকেই বোঝা উচিত, সুবোধ দত্ত একেবারে আনপ্রেডিক্টেবল ছিল। কেননা, ষাট পেরিয়ে কে আর বাঁশের কারবারে নামে?

বীণার সঙ্গে বিয়ের আগে অব্দি সুবোধ বেচারাম ছিল। আজ মদারাটের সস্তায় কেনা তিন কাঠা ঝেড়ে দিল, কাল মহামায়াতলায় ইটখোলার পুকুর সাত বছরের জন্যে জমা দিয়ে দিল। যেখানে যা পেত, ফিক্সড ডিপোজিটে ভরে দিয়ে সুদের টাকায় বারান্দায় বসে বসে ঝিমোতো। আসলে গুটোনোর পালা চলছিল তখন।

পোষ্ট অফিসের কাজ—যা পেয়েছে সেভিংসে রেখেছে। রাই কুড়িয়ে বেল। বীণার সঙ্গে বিয়ের পর সেই বেলের মোরব্বা, সরবৎ—সব চলছিল এতদিন। শেষ বয়সের খোকা খুকুর জন্যে বাড়ির সামনেই ধানি জমি করেছিল সতের বিঘে। সুবোধ দত্ত আস্তে আস্তে পুরুষসিংহ হয়ে উঠছিল। এমন সময় ধীরেন এসে সব গুলিয়ে দিল।

সে-সব কথা যাক। গোবিন্দ প্রামাণিক যা জানে তার বাইরে যাওয়ার দরকার কি? গোবিন্দ যা দেখেছে, যতটুকু শুনেছে—শুধু ততটুকুতেই খুশী থাকতে হবে।

এ-সব মনের ব্যাপার। অথচ প্রমাণ অপ্রমাণও রয়েছে। এখানে অনুমানের কোন জায়গা নেই। এখন পুরো ব্যাপারটাই সাবজুডিস হতে চলেছে। এতদিনে সেসনসে উঠে যেত কেস। কিন্তু মুসকিল বাধিয়েছে স্বয়ং বীণা। গেল হপ্তায় পুলিশ হাজতে তার একটি মেয়ে হয়েছে।

বীণাকে ধরিয়ে দিতে যারা সাহায্য করে, তারা এখন বলছে, কেস না কেচে যায়। শিশুকন্যা দেখলে কোন্ জজ না গলে যায়।

মেয়ে হওয়ার খবর শুনে পাড়ার মেয়ে-মহলে একটি কথাই বার বার শোনা গেছে—মাগী, আস্ত মাগী। শিশুবালা মর্নিং স্কুলের রিটায়ার্ড ভূগোল

দিদিমণি বলেছেন, মহাপাতকি—শেষে বাইশ বছরের কাঁচা ছেলেটাকেও মজালি।

গোবিন্দর বড় মেয়ে যে-কোন জীবজন্তু পেলেই পুষতে পারে। মোটামুটি পোষ-মানা চাই। তার বড় ইচ্ছে হাঁস, নয়ত গরু পোষে। এ জায়গায় গোবিন্দরা নতুন এসেছে। দোতলায় ভাড়া থাকে। সেখানে কিছু পোষা যায় না। এখন দেশময় বৃষ্টি হচ্ছে। শেষ রাতে যে-সব বৃষ্টি নামে তারা ফার্স্ট লোকাল বেরিয়ে যাওয়ার আগে থামে না। ততক্ষণে দুই পুকুরের জলে যাতায়াত প্রায় শুরু হয়ে যায়। পানা উথলে ওঠে। রাস্তায় লেগে যায়। একতলার সিঁড়ির ধাপ জলে ডুবু ডুবু। তখন পাড়ার সব হাঁস উঠোনের জলে চুল ঝাড়ে আর ফুলপাড়ের ষ্টাইলে হাফডুব খাওয়ার চেষ্টা করে। সেইসব সময় গোবিন্দর বড় মেয়ে দোতলার জানলা থেকে হাঁসগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। এই বড়মেয়ের জন্যই বাড়িটা পাওয়া দরকার। গোবিন্দ বাড়িটা পেলে হাঁস গরু দুইই পুষবে। গরমের দিনে সুবোধ দত্তর বাড়ির লনে সন্ধ্যেবেলা বেতের চেয়ারে বসে গল্প শোনাবে। কত দিন ভেবেছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে মেয়েকে একটা দারুণ মনভুলোনো গল্প বলবে। অর্ধেক দিন রাত এগারোটার আগে ফিরতে পারে না। তখন মেয়েটা বছর খানেকের ছোটবোনের পাশে আরও ছোটো হয়ে ঘুমোয়। যেদিন জেগে থাকে, গল্প বলতে গিয়ে গোবিন্দ টের পেয়েছে—সে কোন গল্পই জানে না। আজ বারো বছর একই নিয়মের একই চাকরি করে সে এখন আস্ত একটি টেবিল। খুব প্লেন।

নতুন জায়গায় বাড়িটার জন্যে কাকে বলবে।

একদিন দুপুরের ট্রেনে সেই রিটায়ার্ড ভূগোল দিদিমণি আর টিউ-টোরিয়াল-প্রতিষ্ঠাকামী টাটকা যুবকটির পাশে একই কামরায় বসে কলকাতা গেল।

মাঠের ধানগাছের দিকে তাকিয়ে দিদিমণি বললেন, অমাবস্যা পূর্ণিমায় চারার গিট থেকে কোড় বেরোয়—সেখানে প্রথম দুধ হয়ে ধান ধরা পড়ে। কলকাতার এত কাছে একজন শিক্ষয়িত্রী এত খুঁটিনাটি খবর রাখেন জেনে গোবিন্দ সশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিল। এমন সময় সুবোধ দত্ত তথা বীণাপ্রসঙ্গ এসে পড়ল।

মহিলা যা বললেন, তা মোটামুটি এরকম—

ধীরেনের যাতায়াত আমরা অনেকদিন আগেই জানতাম। সুবোধবাবু কী লম্বা লোক ছিল! এদানী তারও পছন্দ ছিল না ধীরেনকে। বীণাকে বলেছিল, বারণ করে দিও আসতে। বীণা একজন শোনার পাত্রী বটে! চোখে পোকা পড়লে পুরুষ লোক নাকি বোকা হয়ে যায়। যখন যা করা দরকার, তা করতে ভুলে যায়। ধীরেনকে আড়ং ধোলাই আর বীণাকে নাকি সময় থাকতেই ইস্ত্রী করা উচিত ছিল। তা না করায় ছেলেটার সময় অসময়ে আসা বন্ধ হয়নি।

ভূগোল দিদিমণি এখান থেকে গোবিন্দর দিকে তাকিয়ে বলেছে, ছেলেমেয়ে দুটোর যে কি হেনস্তা চলেছে কি বলব। অথচ মাগী পাড়া-বেপাড়ার ছেলেমেয়ে ধরে এনে গানের ইস্কুল পাতিয়েছে। আমরা আমাদের মেয়ে পাঠাইনি।

মহিলা স্বীকার করলেন, বীণার গলা ভাল ছিল। সুবোধ খরচপাতি করে কলকাতা থেকে গাইয়ে এনে এই ছোট ষ্টেশনের লোকালয়ে বীণাকে বছরের পর বছর গান শিখিয়েছে।

বাকিটুকু গোবিন্দ এইভাবে কল্পনা করে নিল—বুড়োমানুষ সুবোধবাবু ভেবেছেন—আহা বীণার ত এখন বয়সকাল, আমার জন্যে সাধ আহ্লাদ মুছে ফেলতে হবে কেন। কাঠিমাদুরে হারমোনিয়ম বসিয়ে সরগম সেধেছে বীণা—বাইরের বারান্দায় বসে লাইট চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে হলদে ব্লটিং করে জিভ দিয়ে চেটেছে সুবোধ—আর তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিয়েছে। আমার বউ গাইছে।

বীণার একটা গিটার ছিল। বিক্রি করে দেবে শুনে ভূগোল দিদিমণি তার মেয়ের জন্যে চেয়েছিল। কী দেমাক। ওসব হাল্কা বাজনা আমরা বাজাইনে। অথচ কিনতে গেলে দিল না। বলল, কাল এলেন না মাসিমা—ধীরেনবাবুর দেশের একজন নব্বই টাকা দিয়ে নিয়ে গেছে। কী মিথ্যে! পুলিশের তল্লাসীর সময় পালঙ্কের নীচে পাওয়া গেল গিটারটা। এই প্রথম বীণাকে দেখার ইচ্ছে হল গোবিন্দর। কিন্তু সে তো এখন সেন্ট্রাল জেলের হাসপাতালে। আজ হপ্তাখানেক ধীরেন মান্নার মেয়ে হয়েছে।

সুবোধ দত্তের বাড়ির তীরবর্তী পিচ রাস্তা সাইকেল, রিক্সা, মোটর—সব রকম গাড়ির পক্ষেই সুখ। বাম্প করে না। এই রাস্তা দিয়ে গোবিন্দ

তার খুকির মাকে নিয়ে সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে গেছে। 'দয়া' লেখা বাড়িটা দেখাতে বউ বলেছে, বাড়ি বদলে কি হবে—আর কিছুদিন পরেই ত' বাড়ি করে আমরা উঠে যাব।

সে-রকমই ত' কথা। অথচ এ-বছর পঞ্জিকায় গৃহারম্ভের দিন নেই। এক যদি দেবীপক্ষে ভিত-পুজো করে দোষ খণ্ডন করে ফেলা যায়, তাহলে কোন অসুবিধে নেই।

প্রামাণিকরা সালকের অতি বিখ্যাত পরিবার ছিল। গোবিন্দর ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ রামহরি প্রামাণিক সৈন্ধব লবণের কারবার করে লাল হয়ে যান। গঙ্গাতীরে তাঁর নুনের গোলা ছিল। সেই পয়সায় তিনি পাঁচখানা বাড়ি করেন ও সাতটি মেয়েমানুষ রাখেন—তার মধ্যে একটি আবার সিদ্ধি ছিল। ছোটবেলায় ঝিয়ের কোলে চড়ে সেই সিদ্ধি বড়মা'র অয়েল পেন্টিং দেখেছে গোবিন্দ। এমন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সংসার পাতা, বাড়ি করায় খুবই এলেম চাই। দিনে দিনে গোবিন্দ সে বস্তুটির পরিচয় দিচ্ছে।

সাতাশশো স্কোয়ার ফুট ঝামা ব্যাট্‌স্ দরকার—সওয়া ইঞ্চি সাইজের খোয়া পিটিয়ে মেঝে ঢালাই করতে হবে। একটা বাড়ি তৈরি করার বিশদ সব শুনে ঠিকাদারের মুখের দিকে তাকিয়েছিল গোবিন্দ। অথচ চোখের সামনে 'দয়া'—ঘোরানো বারান্দায় গ্রিল বসিয়ে নিলে অসাধারণ হবে।

গোবিন্দ বউকে বলল, 'রাজি হয়ে যাও—কী সুন্দর লন, পরিষ্কার থাকলে গড়াগড়ি দেওয়া যাবে।'

'তার মানে? তুমি বাড়ি বানাবে না?'

তাই বলেই কলকাতার বাড়ি তুলে দিয়ে গোবিন্দ বউকে এখানে এনেছে। ওকে সাত কাঠার একটি প্লটও দেখিয়েছে। সাফ কোবালা হয়েছে।

'বানাবো। কিন্তু যদ্দিন না হচ্ছে, ততদিন এখানে থাকতে ভাল লাগবে না?'

'তুমি সারাদিন বাইরে থাক। বাড়ির পেছনে জঙ্গল। অতগুলো ঘর আগলে বসে থাকতে পারব না।'

গোবিন্দ ঠিক করল, এখনই দীপ্তিকে আর ঘাঁটাবে না। পরে সইয়ে

সইয়ে বলে একদিন দুপুরে টেম্পোয় মালপত্র চড়িয়ে 'দয়া'য় উঠে আসবে। পরের বাড়ি দু'টি ঝক্‌ঝক্ করছে। একখানির মালিক হেঁসো দিয়ে লতার বেড়ার আগাছা কাটছে—শেষেরটির মালিক বারান্দায় বসে রেডিও শুনছে। গোলাপ বসানো চত্বর পার হয়ে লোকটির মাথা দেখা যায়। এরকম স্বচ্ছন্দ ফুল্ল ঘরদুয়ার আজকাল শুধু সিনেমায় পাওয়া যায়।

আঞ্জুনির ওষুধ আনতে গিয়ে বীণার পাতানো মামা সুখেন রায়ের কাছে মুখ ফসকে 'দয়া'র কথা বেরিয়ে গেল। গোবিন্দ কিন্তু কিন্তু করে বলেই ফেলল।

'আপনি বাড়িটা নেবেন? নিলে খুব ভাল হয়। ম্যারেড আছেন। আর যারা চেয়েছে—'

'ম্যারেড নয়।'

'হ্যাঁ। ইলেকট্রিক অফিস করতে চাইছিল—'

তারপর ডাক্তারবাবু অসুবিধের দিকগুলো বলল। সুবোধ দত্ত পাঁচ বছর আগে দু' নম্বর বাচ্চা হওয়ার পর 'উইথ লাভ অ্যাণ্ড ইন গুড্ ফেইথ' বীণার নামে এই বাড়ি দানপত্র করে দেয়। সুতরাং 'দয়া'র মালিক এখন সুবোধের বেওয়া বীণা দত্ত। খুদ্‌খুশীতে বেওয়া বনে বীণা এখন পুলিশ হাজতে। বাড়িভাড়া নিতে হলেও সেই বীণার অনুমতি চাই।

কিন্তু অনুমতি কে চাইবে?

তার আগে আর একবার জানা দরকার গোবিন্দ কী কী জানে।

২৮শে জুন রাত ন'টা নাগাদ আশু ডাক্তার এম. বি. বি. এস-কে ডেথ্ সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য ডাকা হয়। সামনের বসবার ঘর জল দিয়ে ধোয়া হয়েছে যেন একটু আগে। দোতলার সিঁড়ির নিচেই সুবোধের খুলিফাটা বডি দ হয়ে দুমড়ে পড়ে আছে। ছেলেমেয়ে দুটো বোবা হয়ে দাঁড়ানো। বীণার বেণীতে একটা বেখাপ্পা গিট। ডাক্তার গজ ভরেও রক্ত থামাতে পারল না। খুলির রক্ত দু'চোখ ঢেকে দিয়েছে। বাঁ কান নেই। আশুবাবু সার্টিফিকেট দেবে না বলে ফিরে গেল। ভূগোল দিদিমণি কটমট করে বীণার মুখে তাকিয়ে।

পরদিন পুলিশ বারান্দায় দাঁড়ানো। পাতানো মামা সুখেন রায় ঘরের ভেতরে যেতেই বীণা বলল, 'এখন কি হবে মামা?'

মামা পুলিশের শেখানো বুলিই বলে গেল, 'পুলিশ সব জেনে ফেলেছে

মা। যা জান সত্যি বললে বেঁচে যাবে।'

'পুলিশ সব জানে? কি করে জানল?'

'ওদের কি আর জানতে কিছু বাকি থাকে—'

বড় দারোগা নোটবই নিয়ে সব লিখে নিলেন। বীণা বলে গেল। সামনের ঘরে সুবোধের মাথার পিছন থেকে ধীরেন রডের বাড়ি দেয়। উঠে পালাতে গিয়েছিল। দিশেহারা অবস্থা অনেকটা। বড় ছেলেটা ছুটে এসেছিল। বীণা তাকে আর মেয়েটাকে পাশের ঘরে ধাক্কা দিয়ে ভরে দিয়ে শেকল টেনে দেয়। তারপর সুবোধকে ওই অবস্থায় বুকে জড়িয়ে ধরে আবার চেয়ারে বসায়। তখন ধীরেন গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে আবার একবার—

শেষে ঘর ধোয়াধুয়ি। ধীরেনকে পেছনের পুকুরের পাড় দিয়ে পার করে দিয়ে বীণা সুবোধকে টানতে টানতে দোতলার সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপে নিয়ে তোলে এবং শেষে ছেড়ে দেয়।

বাকিটুকু মেয়েটাই বলে যায়। দরজার ফাঁক দিয়ে সে তার বাবাকে এলোপাথাড়ি ওঠার চেষ্টা করতে দেখেছে। ধীরু মামার দাড়ি ঘামে ভিজে গিয়েছিল।

'আমার কী হবে মামা?' এমনভাবেই বলেছিল বীণা। ন'মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এতটা টানা-হ্যাচড়ায় কাহিল হয়ে পড়েছিল। এইসব তথ্য পর পর সাজিয়ে বলা যায়, বীণা অনেক আগেই হাঁপিয়ে উঠেছিল। কেননা রিটায়ারের পর সুবোধ যে-ভাবে ঘর সংসার সাজিয়ে বসেছিল, তাতে দু' দশ বছরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে তার পটল তোলার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। তারপর রোজ বেলা তিনটে বাজলেই বীণা বুঝতে পারত হাতে-পায়ে দারুণ জাব্দা শক্ত একটা ছেলে নদী পার হয়ে 'অভয়নীল' স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মাইল পথ কাবার করে দিয়ে ধীরেন এখুনি এসে যাবে। চলে আসার সোঁ সোঁ শব্দ অব্দি সে শুনতে পেত। তখন খরায় গোলাপ পাপড়িগুলো নির্বিষ ভারি ভারি পিঁপড়ের অত্যাচারে ঝুরঝুরে হয়ে পড়েছে। বাতাস ওঠে না তাই রক্ষে। জল নেই, ছায়া নেই। আট দশ বছরের ছেলেমেয়ে দুটো মা মা করে ডাকে। অন্যটা পেটের ভেতর পাশ ফেরে। আর বুড়োর শুধু ঘ্যান ঘ্যান, 'আমি মুখ দেখাতে পারব না বীণু—ছেলেমেয়েরা আমার এখানে থাকল। তুমি ওটিকে নিয়ে

গালুটিতে বেশ থাকবে। বাড়ি ভাড়াও সস্তা। ব্যাংকে লিখে দেব—মাসে মাসে টাকা পাঠাবে।'

শেষদিকে, আন্দাজ করলে ভুল হবেনা, সুবোধকে বীণা তার গায়ে হাত দিতে দিত না। কিংবা সুবোধ হয়ত দিত না। ফটফটে শাদা রঙের 'দয়া' জ্যোৎস্না পড়ে চারদিক পাথর হয়ে থাকত। তখন হয়ত বীণা বলে থাকবে, 'আমি আর মুখ দেখাতে পারিনে।' ঘুমন্ত বাচ্চা দুটোকে দেখিয়ে এমন কথা নিশ্চয় বলেনি, 'আগে বুঝিনি—বয়স কম ছিল। ও দুটোকে পেটে ধরতে হয়েছে মনে করলেই ঘেন্না হয়, বমি আসে।' সেইসব সময় পিছনের পুকুরে বড় বড় মাছ লেজের ঘাই দিয়ে জল সরিয়ে দিয়েছে। দু'একটা শ্বাস টানতে না পেরে ভেসেও উঠেছে। শব্দগুলো সব শোনা যায় ঘর থেকে। সুবোধ খড়ম পায়ে বাথরুমে যেত আলো জ্বালিয়ে। অল্পক্ষণের জন্য আলোময় ঘরে বীণা টেবিলে বসানো জল-ভর্তি কাঁচের গ্লাসটা দেখত। তার ভেতর থেকে সুবোধের নীচের পাটির দাঁতের সেট বীণার দিকে তাকিয়ে হাসত।

খুবই অনধিকার চর্চা হয়ে গেল। এ-সব ঘটনা গোবিন্দ প্রামাণিকের জানার কথা নয়। তবে, না জানলেও ঘটতে আপত্তি নেই। এক্তিয়ারের বাইরে না গিয়ে যা ঘটেছে শুধু সেটুকুই বলতে চাই।

'দয়া'কে ভাড়া দেওয়ার অনুমতি চাইতে পারে একমাত্র ধীরেন মান্না। তাছাড়া এখানকার সবাইকে বীণা গ্রেপ্তার হওয়ার আগে আগে চিনে নিয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে সেই তিনটি বাড়ির একটির চত্বরে গোলাপ বসানো। বাড়িটি সুবোধের জামাইবাবুর। অপুত্রক সত্যসাধন গঞ্জাম চার্চের ক্যাথলিক। বীণার ননদ হাডসন বুথওয়েল কিণ্ডারগার্টেনের ট্রাষ্টি। দু'জনেই সমাজের নেতা গোছের। সত্যসাধন তবু তাকে কিছুটা মোলায়েম চোখেই দেখত। কিন্তু ননদ কোনদিন হেসে কথা বলেনি। এক রবিবার চার্চের মাঠে সন্ধ্যেবেলা প্রার্থনায় ফাদারদের সামনে বেথেলহেমের পবিত্রকূপের ফিল্ম দেখানো হল। শুরুতে বীণা একটা গান গাইতে চেয়েছিল। তখন অল্প দিন বিয়ে হয়েছে। সুবোধের পাঞ্জাবির হাতা বাড়িতেই গিলে হয়। লজ্জা কাটিয়ে ইচ্ছেটা জানাতেই ননদ বীণাকে ধমকে থামিয়ে দিয়েছিল।

এতসব শুনে গোবিন্দ আন্দাজ করার চেষ্টা করেছে। বীণা পাড়ার

মেয়েদের নিয়ে বারান্দায় গানের ইস্কুল বসিয়েছে। রেলিংয়ের গুঁড়ো ধুলো বাতাসে মিশে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বীণার ভরাট সুরেলা গলাও। এসব গান মোটা থাম পেলেই পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে অদৃশ্য লতার ভঙ্গীতে আকাশে উঠতে চায়। রঞ্জন দেওয়া গলা আরোহণের পর সুবোধের কান তরে পুরনো জাভার চিনির বড় দানা হয়ে স্বরশীর্ষ থেকে ভেঙে ভেঙে ঝরে পড়তে লাগল। শুধু বীণার একখানি নতুন সতেজ মুখ ঘিরে ওই কেয়ারি করা বাগানেরবারান্দায় খানিকক্ষণের জন্য এত দিনের প্রচণ্ড খরা কোন জায়গা না পেয়ে দূরে হলদে ঘাসের ওপর নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকল। এতখানি আন্দাজ করলে ভাবতে বাধা নেই, বীণার নাকটি টিকোলো।

'দয়া'র কথায় ফিরে গেলে ধীরেন মান্নাকেই স্মরণ করতে হবে। 'দয়া'র জন্যে অনুমতি ধীরেনই জোগাড় করে দিতে পারে। সুখেন রায় রবিবার রবিবার চার্চের মাঠে ভক্তিমূলক ছবি আনে। সমাজের মাথা একরকমের। বীণার খুড়তুতো ভগ্নীপতি বিপুল দাম হিন্দু। টাইলের পাইকারি কারবারি অজিত বসু। এঁরা তিনজন বীণার কনফেশন লেখা হয়ে গেলে সই করেছে দারোগাবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে। অতএব বীণা এখন উকিলের বুদ্ধিতে কনফেসন অস্বীকার করলেও এরা ছাড়বে না। তাহলে এদের কথায় বীণা বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে না।

অথচ আরও অন্য বড় দরকারে 'দয়া'য় ভাড়া বসানো প্রয়োজন। সুবোধের ছেলেমেয়ে দুটি সত্যসাধনদের ওখানে। সত্যসাধন রিটায়ার্ড—সুবোধের দিদির ট্রাস্টির মাসোহারা খুব একটা কিছু নয়। এই অবস্থায় বাচ্চা দুটির ভরণপোষণের জন্যেও 'দয়া'কে ভাড়া দিলে টাকা আসত।

সুখেন রায় অবস্থাটা আগাগোড়া বুঝিয়ে দিল। বাড়িটি ভাড়া দিলে বাচ্চা দুটির ভরণপোষণ হয়। বীণাকে না জানিয়ে ভাড়া দিলে জেলে বসেই দুটি মামলা ঠুকতে পারে! ভাড়াটের বিরুদ্ধে ট্রেসপাসের একটি—অন্যটি যে ভাড়া দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে অধিকার হরণের। ফলে এই ফালতু দুই মামলার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আদত কেসের কনভিকশন পেণ্ডিং হয়ে যাবে। কিন্তু সুবোধের দিদি বীণার শাস্তি পাওয়ার পথে কুটোটিও ফেলে রাখতে চায় না। আমরাও চাই না। সমাজে এমন একজন অপরাধী এতদিন গা ঢাকা দিয়ে বসে ছিল—আমরা ধরতে পারিনি, এইটেই কি কম লজ্জার কথা নয়? আমরা চাই বীণার চরম দণ্ড হোক।

আবার বীণা যদি কোন লুভিষ্ঠি উকিল-ব্যারিস্টারের খপ্পরে পড়ে? তাহলে এযাত্রা বাঁচিয়ে দেব বলে মক্কেলের একমাত্র সোনার হাঁস 'দয়া'কে বেচে ফি-র টাকা তোলার ব্যবস্থা উকিলবাবু নিজেই করে নেবেন। কে না বাঁচতে চায়! ধীরেন মান্নার সঙ্গে সাজানো ঘরবাড়িতে অনায়াসে খাপ খেয়ে যাবে—এই আশায় ওই শরীরেও এমন একটা কাজ বীণার হাতে আটকায়নি। তাহলে বুড়ি পিসির ঘরে আশ্রিত ছেলেমেয়ে দুটো পথে বসবে।

ভাড়া না-দিলে বাড়িটা অব্যবহারে সাপখোপের আস্তানা হয়ে পড়তে পারে। ভাড়া দিলে বাচ্চাদুটির ভরণপোষণ চিন্তা থাকে না। থানার বড়বাবুকে সুবোধের দিদি চিঠি লিখেছিল। তিনি একটি সেনটেন্সে দায় সেরেছেন। আইনসঙ্গত অধিকার থাকলে ভাড়া দিতে পারেন। অধিকার ত সেই দানপত্রে লেখা আছে। তার বয়ান দেখলে অন্তত অন্ধিসন্ধি খুঁজে খুঁত বের করে 'দয়া'য় চাপা যেত। কিন্তু দানপত্রও যে কোথায় কেউ জানে না।

একমাত্র জজসাহেব খারাপ কিছু ঘটে না থাকলে মানবিক কারণে নাবালক ও নাবালিকাটির গার্জেন পদে পিসিকে বসিয়ে 'দয়া'র ভার তার হাতে তুলে দিতে পারেন। কিন্তু কেস তো ওঠা চাই। সরকার বাহাদুর সন্তবিয়োনীকে রেস্ট না দিয়ে কাঠগড়ায় তুলছেন না।

গোবিন্দ দীপ্তিকে দুপুরের দিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সত্যসাধনের বাড়িতে নিয়ে গেল, 'আগে তুমি বাড়িটা দেখ একবার। অনেক ঘর। মেয়েদের খেলাধুলোর অঢেল জায়গা। কেউ এসে থাকলে বারান্দায় শুতে হবে না—'

আরও একটা কারণ ছিল। তা খুলে বললে গোবিন্দ ছোট হয়ে যাবে। এমনি অন্যের তুলনায় তার ঘাড় কিছু সর্ট। খুনের বাড়ি খুঁতো বাড়ি। ভাড়ায় সস্তা হয়।

সত্যসাধনের স্ত্রী বলল—'বীণাকে আমি ক্ষমা করতে পারব না।'

(সে তোমার ক্ষমার জন্যে হত্যে দিয়ে পড়ে নেই। বীণা কি কখনও লিখতে পারে, দিদি এবারের মত আমায় ক্ষমা করে দিন।)

'ভাড়া দেওয়ার অধিকার আমারই ত আছে। আমি এজন্যে মনের মধ্যে শক্তিও পাচ্ছি।'

(পেয়ে থাকলে ভাল। কিন্তু আইন তা বলে না।)

'বিপুল দাম ছেলেমেয়েদের কথা লিখে জেলে চিঠি দিয়েছে। জবাবের জন্যে বসে না থেকে আপনি উঠে আসুন। চুণকাম করিয়ে নিয়ে ভাড়ার

থেকে টাকা কেটে নেবেন।'

(যদি মামলা হয়, ধীরেন মান্নার আগে বিপুল দাম বীণার ক্যাণ্ডিডেট ছিল না ত? লোকটা গোবিন্দকে বলেছে—নিজের বাড়ির মতই থাকবেন। তবে পুকুরে মাছ ছাড়া বা ধরার ভোগ দখল পাবেন না।)

'ওপরের ঘরখানা পাবেন না। কলকাতা থেকে লোকজন এলে থাকতে দেব।'

(দোতলার একখানা ঘরই 'দয়া'র চার্ম। প্রথমে পুকুর নিয়ে বিপুল ঐ কথা বলেছে। এবার দোতলার ঘর নিয়ে সুবোধের দিদি যা বলল, তাতে সেপারেট থাকার মজাটুকুই উড়ে গেল। গোবিন্দ দীপ্তির সামনে বিমর্ষ হয়ে পড়ল।)

'যা পল। ওঁদের দেখিয়ে নিয়ে আয়।'

এই ছেলেটা গেটের মুখে ঘাসের মাথা ধরে কেটে কেটে বস্তায় ভরছিল। যারা বোর্ড-বাঁধাই ম্যাট্রিকুলেশন বেঙ্গলি সিলেকশন পড়েছে তারা জানে—সল পলে পরিণত হয়েছিল। ১৩৭৩ সনের ভাদ্রে এই পলকে ছেলেটা বলা যায় না—লোকটাও বলা যায় না। মাঝামাঝি আর কি।

'দয়া'র গেট খুলে পল ওদের ভিতরে নিয়ে গেল। সামনের বারান্দা জল পড়ে পড়ে এই ক'মাসে ফেটে গেছে। একবস্তা সিমেন্ট লাগবে ভাড়ার টাকা থেকে দশ টাকা পাঁচ পয়সা কাটতে রাজি হলে হয়।

প্রত্যেক দরজা জানলা বড় ছোট—তাতে লোহার জাল লাগানো।

পল বলল, 'গরমকালে জাল লাগানো দরজা আটকে শোবেন—হাওয়া ঢুকবে।'

দীপ্তি ভুরু কোঁচকালো, 'ভীষণ নীচু সিলিং—'

'পাখা লাগিয়ে নেব।'

পল সুইচ টিপল। বিকেল হতে বাকি আছে এখনও। সামান্য অন্ধকার নিওন টিউবে ফরসা হয়ে গেল। চাপ বাতাস ভক্ করে বেরিয়ে এসে প্রামাণিক পরিবারের নাকে লাগল।

ফাঁকা মেঝেয় একটা টিপয়। তার ওপর মহাভারত মার্কা একখানা বই হাট করে খোলা। বাংলা বাইবেল। বাঁ দিকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২০।

পল একটার পর একটা ঘর খুলে এগিয়ে গেল। বসার ঘরের দু পাশে দুই ফালি ঘর। একটা খাবার একটা গানের। গানেরটায় অনেক কাগজ ছড়ানো। ভাঙা সেতারটা দেওয়াল-তাকে ঠেসে বসানো। একটা হাতকাটা

ব্লাউজের নীচে ভাঁজকরা কাগজ একখানা। পলের সঙ্গে দীপ্তি বাথরুম দেখছে। রীতিমত অ্যাটাচড।

কাগজখানার ওপরে লেখা ওঁ শ্রীশ্রীমা। আমার মনোবীণা। এতদিনে জানিলাম পুরুষ ও প্রকৃতি কাছাকাছি হইলে কী হয়। কাল তোমার হাত ধরিলে ওরকম করিতেছিলে কেন? বর্ষাকালে আমাদের নদীতে রোজ খেয়া থাকে না ওপারে দাঁড়াইয়া ট্রেন দেখিয়াও তাই শনিবার আসা হয় নাই। নৌকাগুলি আজকাল কয়লা, মেছোঘেরির মাছের খেপ মারিতেছে। তুমি যা চাও আমি তা বুঝি। ঈশ্বর কৃপায় সব ঠিক হইয়া যাইবে। আং তোমারই—মান্না (ধীরেন)।

কাগজখানা বুক পকেটে রাখল গোবিন্দ। রান্নাঘরে পলের সঙ্গে ঢুকে সে বুঝল, দীপ্তি শিউরে উঠেছে। এনামেলের ডেকচিতে ভাত লেগে আছে—থালা বাসন ছড়ানো। উনুনের গাদানো আঁচ আপনাআপনি ভেতরে বসে গেছে।

'এই জায়গাটায় বাবুর মুরগি থাকত।'

কাঠের ঘর পুকুর পাড়ে। নতুন জাল লাগানো। পুকুরটাও কম্পাউণ্ড ওয়ালের মধ্যে। মাছ চুরি যায় বলে সুবোধ মাঝপুকুরে কাঁটাসুদ্ধ বাবলার ঝাড় ফেলে রেখেছিল। এখন বৃষ্টির দিনে তার অনেকটাই জলে ডুবে গেছে। শোবার ঘরে তোষক ওল্টানো। ময়লা একখানা শাড়ি রেডিওর এরিয়ালে ঝুলছে। সেখানা সরিয়ে দোতলায় ওঠার মুখে চোখ পড়ল দুজনেরই। কয়লা ভাঙার মাটির ঘর দিয়ে একটা কুমড়ো লতা এই কমাসে অবাধে বাড়তে পেয়ে গোটা তিনচার ডাঁটালো ফুল সুদ্ধ মেঝের ওপর খুব দুলছে। পল দেখেই পটাপট ছিঁড়ে নিল, 'খুকুমনির অরুচিতে ভাল কাজ হবে।'

'এ বাড়িতে তোমার ভয় হয় না?'

'ভয় কিসের? ছোটবেলা থেকে এখানে বাবুর কাছে আছি। বাবু নেই বলে এখন ও-বাড়ি থাকি।'

'বাবু লোক কেমন ছিল?'

'খুব ভাল। যুদ্ধের সময় আমায় পানাগড় থেকে নিয়ে আসেন।'

কটা চোখ, ঝোলা গোঁফ, বুকে-গালে ছুলি—ঘাস কাটার দা নিয়ে পল দাঁড়ানো। সময়টা ছিল যুদ্ধের। পলকে সুবোধ পানাগড় থেকে কুড়িয়ে আনেনি তো। এখানে আগে ধানের মাঠ ছিল। সুবোধ দত্ত ঘর বসিয়ে ছিল। এখানকার লোকগুলোর যে কী হয়ে গেল। কেউ নেই। এক

একজন এক এক দিকে চলে গেল। কাপড় কাচতে সুবিধে হবে বলে সুবোধ কলতলায় সিমেণ্ট দিয়ে উঁচুমত আছড়ানোর জায়গা করে দিয়েছে। সেখানে মুরগিরা জ্ঞানী মহাপুরুষের চেয়েও মেপে মেপে পা ফেলছে।

'সবই সাজানো ছিল'—দীপ্তির এই প্রথম কথা, 'কপালে নেই—'

পল দোতলায় ওঠার মুখে দাড়িওয়ালা একটা লোকের ছবি দেখিয়ে বলল, 'বাবুর বাবা—।' গলাবন্ধ কোট। একখানা বাইবেল বুকে চেপে ফটো তুলেছিলেন। সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপে উঠে গোবিন্দ বুঝতে পারল, আধমরা সুবোধকে ওই শরীরে এতটা ওপরে একা একা টেনে তুলতে বেশ কষ্ট হয়েছিল বীণার। নীচে দীপ্তি দাঁড়িয়ে।

'ওপরে এসো।'

'দরকার নেই আর। এ বাড়িতে আমি আসছিনে।'

'ওপরটা দেখে যাও। কী নাইস। রেলিংয়ে সিমেণ্টের ফুলদানি। ভেতরে মাটি বসিয়ে দুপুরমণির চারা লাগানো—ফুল ধরেছে।'

'তুমি দ্যাখোগে।'

পলও দীপ্তিকে ডাকল, 'দোতলায় বসে গান হত কত। আমি ঝারি করে জল দিয়ে দিতাম বিকেল বিকেল। সন্ধ্যে হলেই গন্ধ চারিয়ে ফুল দেখা দিত। বাবু এদানী ওপরে আসতেন না।'

'কেন?'

'মা গান নিয়ে থাকত। মাস্টারবাবু রেলিংয়ে বসে পা দোলাতো।' পশ্চিমের সামিয়ানা সাইজ জানালার ওপরের কার্নিশ থেকে ঢালাই সিমেণ্টের বিশাল একখানা সানশেড ঝুলছে। বোঝা যায়, বিকেলে ঘরে মজলিশ বসলে ওই জমানো আয়তক্ষেত্রে রোদ এসে আটকে যেত। সে জানলা এখন বন্ধ।

পলকে বলতে হল না, নিজেই জানালো। ও-ঘরে মাস্টারবাবুর, বড়বাবুর গায়ের জিনিসপত্র রয়েছে। দরজায় পুলিশের তালা ঝুলছে। মামলা উঠলে ঘর খোলা হবে। ভাগ্যিস দীপ্তি এসব শুনতে পায়নি। সুবোধের বোন তাহলে ওপরের সবেধন ঘরখানা ভাড়া না-দেওয়ার কারণ যা বলেছে তা মিথ্যে। মহিলা সম্প্রতি 'দয়া'কে ভাড়া দেওয়ার শক্তি পাচ্ছেন মনে মনে। তিনি গঞ্জাম চার্চের ক্যাথলিক।

'দীপ্তি—'

ছুটে গিয়ে সরিয়ে দিল গোবিন্দ। রেলিংয়ে বুক দিয়ে কার্নিশের খানিক

ওপরের একটা লতানো ফুল ছিঁড়ছিল খুকীর মা।

'চমকে দিলে কেন?' ফুলটা ফসকে গেছে। একটা কালচে ত্রিভঙ্গ পাতা তুলে খোঁপায় গুঁজে নিল দীপ্তি। গোবিন্দ প্রামাণিক টু শব্দটি না করে ওপরে তাকাল। রেলিং আর দোতলার কানিশের মাঝখানে জমানো বিশাল সেই আয়ত সানশেড সোজা ঝুলে আছে। তারই ঠিক নীচে দীপ্তি এতক্ষণ মাথার সঙ্গে গলা ঝুলিয়ে দিয়ে লতানো ফুলটা তোলার চেষ্টা করছিল। জিনিসটার ওজন কম করেও সাত আট মণ। মঞ্চপ্রমাণ জানলার দু ফুট দূর দিয়ে ওপরেই তাগ মত ড্রপসিনের ঢঙে স্থির হয়ে আছে। পুরোপুরি বিকেল মাঠ, কলতলা পার হয়ে দোতলায় উঠে এসেছে। দীপ্তিও ওপরে এসেই একেবারে সহজ হয়ে গেছে। ঘরের লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে গোবিন্দকে ডাকল, 'দেখে যাও কী সুন্দর বাথটাব।'

গোবিন্দ কুলুঙ্গির শিশিটার দিকে তাকিয়ে থাকল। ছিপি খোলা, গলা অব্দি তেল, কয়েকটা লম্বা চুল গা ঘষার ধুঁধুল খোসায় লেপ্টে রয়েছে।

'চল যাই', বলেও দীপ্তিকে একতলায় নামানো যাচ্ছিল না। শেষ সিঁড়ির মুখে এসে দীপ্তি ঘুরে দাঁড়াল, রেলিং ধরে একতলায় লনের কোণে মাপমত কাটা মাটি আঙুল দিয়ে দেখালো।

পল ঝুঁকে পড়ে বলল, 'মুজিক ঘর।'

'কি?' এই সামান্য শব্দটায় এত হাসি মিশিয়ে দিল।

'মুজিক হল্—গানের ঘর।'

'ঘর কোথায়? গর্ত!'

'ওখানে হবার কথা ছিল। দেবেন মিস্ত্রী মেপেঝুকে কেটে দিয়ে গেল। ওখানে মা গানের ঘর বানাবেন ঠিক ছিল। ইটের অর্ডার নিয়ে গেল টিউমল।'

বনেদখোলা মাটি বর্ষায় ডেবে গেছে খানিক—তার ওপর দিব্যি ঘাস এখন। ভিতরে গর্তের জলে ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ল। গোবিন্দ পিঠে হাত রাখল, 'যাবে না?'

'যাচ্ছি,' তখনও দীপ্তি সেদিকে তাকিয়ে।

পল বলে যাচ্ছে, 'মা খুব গাইত। আগে আমি আর বাবু বারান্দায় বসে রাত অব্দি শুনতাম—খোকা খুকু ঘুমে কাদা হয়ে যেত।' যবনিকা যেভাবে নেমে আসে সানশেড তেমন অন্ধকার হয়ে আসছে। 'মজলিশ বসলে জানলাটা খোলা থাকত।'

'আমি চললাম।'

'যাচ্ছি গো।'

ছুটে নেমে আসা দীপ্তিকে গোবিন্দ ধরে ফেলে গতি কমিয়ে দিল। সিঁড়িটা ভয়ঙ্কর খাড়াই। 'দয়া' ভাড়া পেতে হলে ধীরেন মান্নাকে দিয়ে বীণার অনুমতি জোগাড় করতে হবে। খেয়াঘাটে ওৎ পেতে বসে থেকে পুলিশ ধীরেনকে ধরে। কেস উঠলে হাজত থেকে দু'জনকেই আনা হবে। পুকুর পাড় ধরে সেদিন রাতে সরিয়ে দেওয়ার পর বীণার সঙ্গে ধীরেনের ফিরে আবার দেখা হবে। চাই কি জজসাহেব জামিন দিলে দু'জনে আবার কথা হবে।

পল একটার পর একটা জানলা দরজা আটকাতে আটকাতে নামছে। দীপ্তি একতলার বসার ঘরে বাইবেলের পাতা উল্টে দিল কয়েকটা, 'ভদ্রমহিলার টেস্ট ছিল কিন্তু—'

'ছিল কেন? এখনও ত ফাঁসি হয়নি।'

'ছিঃ। অলুক্ষণে কথা বলছ কেন—,' নিজেই নেমে গেল দীপ্তি। তালা হাতে পল বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। আলো নিভিয়ে দিল। মিটার বক্সের ডালা হা হা করছে খোলা। দীপ্তি বেরিয়ে এল, 'লোক লাগিয়ে পরিষ্কার করা দরকার।'

'পড়ে আছে তো। তাই ময়লা জমেছে।'

গোবিন্দ প্রামাণিক ওদের কথায় থামল না। তখন সে লনের কোণে মুজিক হলের খোলা বনেদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার আলোগুলো জ্বলেনি। বিকেলের সব অন্ধকার ভিতের গর্ত থেকে উঠে আসছে। সামনেই দশ ইঞ্চি দেওয়ালের চার্চ। আগে আগে দীপ্তি চলেছে। পাতলা চটির ওপর সায়ার লেস ঢেউ হয়ে বাড়ি খেল। যে দু-চারটি গোলাপ মাথা চাড়া দেওয়া ডালের মাথায় বিকেল দেখে ফুটে উঠেছে, তার একটিও ক্ষীণ নয়—একেবারে তার দিয়ে লাগানো পাপড়ি, টানলেও ছিঁড়বে না।

গোবিন্দ পিছনে ফিরে তালাবন্ধ 'দয়া'র দিকে আর তাকাতে পারল না। দোতলার রেলিংয়ে তোলা টবে দুপুরমণি জ্বলজ্বল করছে। রাস্তায় উঠে একদম পাকাপাকিভাবে ঠিক করল, কিছুতেই না, কিছুতেই না।

তখনও দীপ্তি এগিয়ে হাঁটছে। আগের চেয়ে অনেক ফুল্ল।

নৃপেনদের বাড়ি

একদম ধানক্ষেত থেকে বাড়ি গেঁথে তুলতে হয়েছিল। নৃপেন বাঁড়ুজ্যের হাতে টাকা পয়সা ছিল না। ধারধোর করে জমি কিনেছিল। তাতে ধান ভাল হয় না। জল দাঁড়ায় না। কারণ উঁচু। তাই মন্মথ সরদাররাও দাঁও বুঝে নৃপেনকেই জমি বেচে দিয়েছিল। একদম শহুরে ভূত। গাঁয়ের তো কিছু বোঝে না। জল ভর্তি খাল, আকাশ ভর্তি মেঘ দেখলে কেবলি বলে, কি সুন্দর, কি সুন্দর!

বাজ পড়লে গাছের কি হয়—কিংবা জোঁকও তো তেমন দেখেনি কখনো শহরে!

আবার বাড়িও ভাল হয় না সেখানে। কারণ নিচু। তাই অল্প পয়সার লোক—নৃপেন একটু একটু করে বাড়িটা তুলেছিল। সিমেণ্ট কিনতে গিয়ে দেখল, ভীষণ দাম। বালিও তাই। ইটের তো কথাই নেই।

তখন গাঁয়ের লোকেরা তাকে বলল, বাবু তুমি ইট কাটো।

ইট কাটা মানে যে ইট বানানো—সেই প্রথম তা জানল নৃপেন। তখন তার বয়স বত্রিশ তেত্রিশ। খুব ইচ্ছে—নিজের একখানা বাড়ি হয়। কিন্তু হাতে তেমন টাকা কোথায়?

গাঁয়ের চাষীরা বর্ষায় ধান চাষ করে। শীতে খাল ছেচে মাছ ধরে সংসার চালায়। কেনাকাটার মধ্যে বাজারে গিয়ে তারা মাঝে মাঝে সরষের তেল কেনে। এই অ্যাতোটুকু হোমিওপ্যাথির শিশিতে। রান্নার সময় আঙুলে মাখিয়ে কড়াইয়ে ছিটিয়ে দেয় শুধু। বৈশাখ মাসভর সারারাত ধরে তারা পঞ্চাননতলায় হরির নাম গায়। রাম রাম হরে হরে। হরে হরে রাম রাম।

তারাই বলল, কয়লা কেনো সস্তায়। তাই দিয়ে লাথগঞ্জের ইট বানিয়ে

নাও। লাথগর কেন? কারণ আর কিছুই না, মাটি কেটে জল দিয়ে মেখে নিতে হয়। তারপর পা দিয়ে লাথি মেরে সেই মাখা মাটিকে মাখন করে নিতে হয়। সেই মাখা মাটি কাঠের ছাঁচে ঢুকিয়ে কাঁচা ইঁট বের করে রোদে শুকিয়ে নেওয়া চাই।

শুকনো কাঁচা ইঁটগুলো নৃপেন চাষীদের সঙ্গে ধরাধরি করে কয়লা দিয়ে পাঁজা করে সাজালো একদিন। তারপর আগুন দিল। মাসখানেক ধরে সেই ইঁট পাঁজার ভেতর ধিকি ধিকি জ্বলল। একবার একটু ফাঁক করে দেখে নিল নৃপেন। আগুনে পুড়ে লাল টক টক করছে।

তারপর মাসেকের মাথায় সেই পাঁজা খোলা হল। খুলতেও সময় লাগে। সবচেয়ে ভাল পোড়া ইঁট এক নম্বর। সেগুলো থাক দিয়ে সাজানো হল। তারপর কিছু নিরেস—দু'নম্বর। এইভাবে তিন নম্বর অব্দি সাজানোর পর ঝামাগুলো টাল দেওয়া হল। এই পৃথিবীরই নরম গা থেকে কেমন শক্ত জিনিস বানিয়ে তার নাম রাখা হল—ইঁট। যা দিয়ে কিনা বাড়ি হয়, রাস্তা হয়, ব্রিজ হয়, দেওয়াল হয়।

পাঁজার পোড়া কয়লার ছাই খুব দামী জিনিস। সেই ছাইয়ের সঙ্গে চুন মিশিয়ে দারুণ মশলা হল। চাষীরা বলল, নৃপেনবাবু এই তোমার সিমেণ্ট বালি। এবার তুমি বাড়ি গাঁথো। যত্ন করে গাঁথো।

সত্যি তাই। পাথরের মত শক্ত বাড়ি উঠে গেল। একটু একটু করে। ছাদ ঢালাই হল। চারদিকে ধূ ধূ ধানক্ষেত। মাঠ ভেঙে বৃষ্টি তেড়ে এলে বৃষ্টির সামনের পা সবার আগে দেখতে পায় নৃপেন। তার বাড়ি পার হয়ে তবে বৃষ্টিকে স্টেশনে যেতে হয়।

দিনের বেলা কাঠফাটা রোদে নৃপেনের সাদা রঙের একতলা বাড়িটা একা একা পোড়ে। জ্যোৎস্না রাতে তার বাড়িটাই একা একা চাঁদের আলোয় স্নান করে। বাড়িটায় ছাব্বিশটা দরজা জানলা। ছাব্বিশটা ছিটকিনি। সব পেতলের। জং পড়ার ভয় নেই। একখানা করে ইঁট বিছিয়ে তারপর স্টোন চিপের গুঁড়ো আর পাতলা সিমেণ্ট জল দিয়ে মেঝে হল।

বাড়িতে নৃপেন তার বউ আর দুই ছেলেকে নিয়ে গৃহপ্রবেশ করল। গেটে একটা কৃষ্ণচূড়ার চারা বসিয়ে দিল।

দেখতে দেখতে দু'বছরের মাথায় নৃপেনদের বাড়ির সামনের কৃষ্ণচূড়ায় ফুল এল। লাল রঙের। পুকুর কেটে নৃপেন বাড়ির ভিত সেই মাটিতে

ভরাট করেছিল। সে-পুকুরে বর্ষায় ফেলা চারা মাছগুলো একটু বড় হয়েছে। পুকুরে নামলেই ঠোকরায়। তাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চান করা যায় না। নেচে নেচে চান করতে হয়। নইলে মাছগুলো ভীষণ ঠোকরায়। ওরা এখনো বড় হয়নি। মানুষের নিয়মকানুন জানে না। নইলে এত সাহস পায় কোত্থেকে।

বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে, গাছের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে সঙ্গে—দুই ছেলে—সনৎ আর বিমলও বড় হয়ে গেল। তখন ওদের দু'জনকে স্কুলে দিতে হবে। এদিকে নৃপেনের বউ বেলা সারাদিন কাপড় কাচে, ঘর মোছে, গাছ লাগায়, বোগেনভিলার বাড়তি ডালপালা লম্বা কাঁচি দিয়ে ছাটে, চুল বাঁধে, টিপ পড়ে, খোঁপা করে, কাজল টানে। সময়ই পায় না। নৃপেনেরও সময় কম। ট্রেনে করে কলকাতায় চাকরি করে আসে। ফিরে এসে নিজের বাড়ির নিজের বারান্দায় খালি গা হয়ে বসে আরাম করে। কখনো শুয়ে পড়ে। কখনো দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো হাঁটে। একদম নিজের জায়গা তো। তাই।

তারপর একদিন ইলেকট্রিকও এল সে বাড়িতে। আলো জ্বালানো সন্ধ্যায় তার বাড়িটাকে নৃপেন এক এক সময় নির্জন অন্ধকার মাঠের ভেতর স্টীমারের ডেক বলে ভাবে। অন্ধকার নদীতে বেশ সুন্দর ভেসে আছে।

বাড়ি যত পুরনো হতে লাগল—নৃপেন তার বাড়িটাকে তত ভালবাসতে লাগল। বেলাও বাড়িটাকে ভালবাসতে লাগল। দেওয়ালে ছবি টাঙালো। দরজায় লোহার পাপোস। বাইরে থেকে কাদা পায়ে এসে পা ঘসে নিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে। বাড়ির ছাদে ত্রিশূল বসালো। বাজ আটকানোর জন্যে।

সনৎ সেভেন। বিমল ফোর। ওরা ট্রেনে করে কলকাতায় পড়তে যায়। শীতকালে ফিরতে সেই সন্ধ্যে। তখন বাড়ি ফিরে সনৎ বিমলদের তো মনে হয়—বাড়িটা তাদের একদম নতুন আলুসেদ্ধর মত মিষ্টি। ভেতরটা এত গরম। কোন শীত ঢুকতে পায় না। দরজা জানালা বন্ধ করে দিলে সারা মাঠের বৃষ্টি বাতাস শুধু বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গর্জায়। ভেতরে ঢুকতে পারে না একদম।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই চোখে পড়ে সামনের চওড়া খালের শাদা জল। লাল কৃষ্ণচূড়া ফুল। সবুজ ঘাস। নীল আকাশ। বেঁটে পেঁপে গাছে কালো দোয়েল। লাল সুরকির রাস্তা। এর সারা ছবিটা নৃপেনের

মাথার ভেতর সারাদিনের জন্যে গেঁথে থাকে। যেখানেই যায় ছবিটা মনে থাকে।

ওরা একটা গরু পুষে তার নাম রাখল উমা। সে এবেলা ওবেলা করে দুধ দেয় দশ সের। নৃপেন অফিস থেকে ফিরলে, সনৎ বিমল স্কুল থেকে ফিরলে উমা কান লটপট করে তাদের স্বাগত জানায়। ওর ভাষা সনৎ বিমল বুঝতে পারে। এমনভাবে হাম্বা ডাকবে যার মানে গোবর চোনা সরিয়ে দাও—শুতে পারছি না। তখনই ওরা দুই ভাই ঝাঁটা নিয়ে গিয়ে গোয়াল পরিষ্কার করে দেয়—তবে উমা শোয়। শীত করলে ডাকে। তখন গিযে ওরা চারখানা সেলাই করা বস্তা ওর পিঠে চড়িয়ে দিয়ে আসে। তবে উমার কাঁপুনি কমে। উমাকে ওরা ফি রবিবার পুকুরে চান করায়। দুধ দেয় ঘন ক্ষীরের মত। তাতে জল মিশিয়ে না খেলে লিভার জখম হয়ে যাবে। এত গাঢ়।

এসব নিয়ে ওদের বাড়িটা ওদের কাছে আরও মিষ্টি হয়ে গেল।

কিন্তু মুশকিল বাঁধলো পড়াশুনো নিয়ে।

সারাদিন চাষীরা আসে নৃপেনের কাছে। নৃপেন এখন আধা চাষী। ধান, গম, বেগুন, কুমড়ো কী করে চাষ করে—তার সব জানে নৃপেন। তাই নিয়েই মেতে থাকে। বীজ আনে। সার আনে। বিষ আনে। চাষীরা তাকে ভালবাসে। বেলা ঠাট্টা করে ডাকে—নেপেন চাষী। এখানে অনেকে তাকে নেপেনবাবু তুমি বলে ডাকে। নৃপেন মুখে আসে না তাদের। এদেরই ভিড়ে বাড়িতে পড়াশুনো উঠে গেল। তারপর ঘণ্টা তিনেক যায় ট্রেনে। ঘুম আছে। খাওয়া দাওয়া স্নান আছে। পড়াশুনোর সময় পায় না সনৎ বিমল।

ওরা দুজনেই ফেল করল।

নৃপেন বলল, ছেলেরাই আমার ভবিষ্যৎ। ওরা ফেল দিলে বাড়ি দিয়ে আমার কি হবে?

বাড়িতে তালাচাবি দিয়ে নৃপেন কলকাতায় বাসা ভাড়া করে চলে এল। মন টেকে না। তবু তাদের থাকতে হয়। তার মন পড়ে থাকল মাঠের ভেতর। দুজন ভবিষ্যৎ কলকাতায় পড়াশুনো করে যে।

বৃষ্টি হলে বাড়ির কথা মনে পড়ে। বাড়িটা একা মাঠের ভেতর ভিজছে। একদিন খবর পেল, পাড়ার গরু চরানীর রাখালরা নতুন খোলা বারান্দা

কেটে কেটে এক্কা দোক্কা খেলার কোর্ট করেছে। কৃষ্ণচূড়া গাছটার ডাল ভেঙে পড়েছে। আরেকদিন খবর পেল—নির্জন খালধারের লাইটপোস্ট থেকে চোর এসে তার কেটে নিয়ে গেছে।

একদিন দুপুরে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নৃপেন নিজের বাড়িতে গেল। রাখালরা তখন তার বাড়ির বারান্দায় নতুন কাটা কোর্টে এক্কা দোক্কা খেলছিল। চারদিক ফাঁকা। শুধু কিছু গরু চরে বেড়াচ্ছে। কৃষ্ণচূড়া গাছটা এখন দোতলা সমান উঁচু। বাড়িটা একা একা রোদে পুড়ে যাচ্ছে। পুকুর টোকা পানায় বোঝাই। নৃপেনের বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল।

রাখালদের সে কিছু বলল না। থাক। ওরা খেলুক। খেলে খেলে বাড়িটা সরগরম করে রাখুক। উমাকে খালের ওপারে গোষ্ঠদের কাছে গাভিন অবস্থায় বেচে দিয়েছিল। খালের ওপারেই গাছতলায় গোষ্ঠদের গোয়াল। এই দু' বছরে উমার সেই বাচ্চা বড়সড় হয়েছে। গোয়ালের বাইরে এসে সে বর্ষার নতুন জালি ঘাস মসমস করে খাচ্ছে। উমা গোয়ালের বাইরে মুখ বাড়িয়ে বসেছিল। নৃপেনকে দেখে চিনতে পারল। কান লটপট করে স্বাগত জানাল। এমন করে হাম্বা ডাকল—নৃপেন বুঝলো, তাকে বলছে—নৃপেনবাবু। ও নৃপেনবাবু। অনেকদিন দেখি না। কেমন আছো গো। উমার দুধ রোজ সাত সের করে স্টেশনের চায়ের দোকানে নৃপেন বেচে দিয়ে আসতো। তখন দুধের সের ছিল দু' টাকা। উমা মাসে গুড় খেত তিরিশ সের। খোল আধ মন। এখন আর সব মনে নেই নৃপেনের।

পথেও অনেকে বলল, কেমন আছো গো নেপেনবাবু? কবে দেশে ফিরবে?

ব্যাটা দুটো আরেকটু বড় হোক। তখন ফিরে আসব। এটাই তো আমার দেশ। যে লাল বারান্দায় রাখালরা খেলছিল—ওখানে একবার তার গড়াগড়ি দেবার ইচ্ছে হচ্ছিল।

কিন্তু কলকাতা বড় মায়াবী। তার অনেক ফাঁদ আছে। বাড়ি থেকে বেরোলেই হরেক সুবিধা। কথা কওয়ার বন্ধু, সিনেমা দেখার ছবিঘর, চা খাওয়ার দোকান, দূরে চলে যাওয়ার বাস, ট্রাম, মিনিবাস। এসব সে কোথায় পাবে তার বাড়ির দেশে।

তার ভবিষ্যৎ দুজনের পড়াশুনোও একটু একটু ভাল হতে শুরু করেছে। এখন আর ট্রেনে করে স্কুলে যেতে হয় না বলে ঘণ্টা তিনেক বাঁচে ওদের।

অফিস ফেরৎ নৃপেনকে আর শেয়ালদা গিয়ে প্যাচপেচে কাদায় ট্রেনের জন্যে দাঁড়াতে হয় না।

তবু এক একদিন মনে হয়—ফাঁকা গোয়ালটা জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। তার চালে দাঁড়াশ সাপ বাতাসে জিভ তুলে তুলে গন্ধ শুঁকছে। পাখির ডিমের খোঁজে ওরা যেখানে সেখানে উঠে বসে। বড় লোভী।

পুকুরের টোকা পানার নিচে মাছগুলো বোধ হয় আর নেই। থাকলে তারা এতদিনে বড়সড় হয়েছে। গভীর রাতে ওপরে উঠে পানার ভেতর হয়তো লেজের ঘাই মারে বড় বড়। আওয়াজ এসে ধাক্কা মারে—ঘাপাং।

অফিসের বন্ধুরা বলে, কি হে! মাছ বড় হল?

নৃপেন আন্দাজে বলে, তা তিন চার সেরি রুই তো আছেই।

দুধ কতটা হয়?

আগেকার অভ্যেসে নৃপেন বলে, তা দশ সের মত। চার মাস গাভিন থাকে। তখন উমা দুধ দেয় না। মনে মনে ভাবে, গাভিন থাকার সময় গোষ্ঠরা উমাকে লাউয়ের পায়েস খাওয়ায় তো? জাউ ভাত দেয় তো?

ধান বেচলে কত টাকার?

বছরে বিশ বাইশ হাজার টাকার মত হয়।

হাল না ট্রাক্টর?

শালাদের বোঝায় কি করে! ট্রাক্টর হলেই কি ধান বেশি হয়। বড় স্বপ্ন ছিল, মাথম মাটিতে বড় জোতের হাল নিয়ে নিজে কাদা করে নিজের হাতে অন্তত এক বিঘে রুয়ে দেখবে। চাষীরা জন খেটে তার জমি রুয়ে দিয়েছে। কিন্তু নৃপেনের মনমত কাদা কোন দিন তারা করতে পারেনি।

একদিন মাঝরাতে কলকাতার বাসাবাড়িতে তার মাথার কাছের জানলা দিয়ে তিন ফুট চওড়া একখানা জ্যোৎস্না মশারির ভেতর চলে এল। পাশ ফিরে শুতে গিয়ে নৃপেনের ঘুম ভেঙে গেল। বউ বেলা এককাতে শোয়। তার মাথা টপকে জ্যোৎস্নার টুকরোটা নৃপেনের বুকে এসে লাফিয়ে পড়েছে। সরে যাওয়ার নাম নেই। বাঁ হাত দিয়ে দুবার মুছে ফেলার চেষ্টা করল। জ্যোৎস্নার টুকরোটার সঙ্গে না পেরে নৃপেন উঠে বসল। বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে নৃপেন কলকাতার তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম পরিষ্কার গলায় বলল, আমার বাড়ি—

আরো অনেক কিছু কথা ছিল গলায়। কিন্তু কিছুই ফুটলো না। কোন সাক্ষী নেই বলে এই দুটো কথা বলতে তার একটুও লজ্জা করেনি। পাছে কেউ জেগে ওঠে—এই লজ্জায় সে আর কিছু বলল না। জ্যোৎস্না দিয়ে সে জানলায় তাকালো। আশ্চর্য! নৃপেনের বাড়িটা নৃপেনদের বাসা-বাড়ির জানলার বাইরে এসে একা একা দাঁড়িয়ে আছে। যদি কেউ ভুল করেও দেখে ফেলে।

নৃপেন মশারিসুদ্ধ উঠে দাঁড়াল। পট পট করে চারদিকের দড়ি ছিঁড়ে যেতে মশারিটা ঝুলে পড়ল। সেই অবস্থায় জানলায় চলে গেল নৃপেন। ধ্যাৎ। মশারিসুদ্ধ কিছু দেখা যায় নাকি। চোখের ওপর থেকে মশারির নেট সরাতে গিয়ে বেলাকে জাগিয়ে দিল। বউ উঠে এসে মশারি সরিয়ে নিতে নৃপেন দেখল—কোথায় কি? সব ভোঁ ভা। বাড়িটা এইমাত্র চলে গেছে।

নিজের জন্যে ব্রোমাইড মিকশ্চার আনা থাকে। টেন পারসেন্ট ডাইলিউশন। বেলা তাই খাইয়ে দিল নৃপেনকে। আবার মশারিটা টাঙালো। নৃপেনের দুই ভবিষ্যৎ পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিল। তারা কিছু টের পেল না।

পরদিন সকালে চাষী হাজরা নস্কর একখানা বড় মানকচু হাতে হাজির হল। নেপেনবাবু। তোমার বাড়ির ভেতর পেল্লায় বড় এক মৌচাক হয়েছে। যাও বাড়ি গিয়ে পূর্ণিমের দিন চাক ভাঙো। তখন ওরা মধু আনতে বেরোয়। সেই ফাঁকে—অনেক মধু হয়ে যাবে।

পূর্ণিমা অবধি অপেক্ষা না করে নৃপেন সেদিন দুপুরেই আবার বাড়ি গেল। স্টেশনে নেমেই পথ থেকে নেপালকে ধরল। বছর ষোল বয়স নেপালের। নেপালের আরেক নাম ঘড়িচোর। একবার জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার টাইমপিসটা চুরি করে ধরা পড়ে। এখন ট্রেনে করে মাতলা বাজার থেকে চাল এনে ব্যবসা করে।

বলতেই নেপাল রাজি হয়ে গেল। খানিকটা কেরাচিন কেনো নেপেনবাবু। লাগবে দেখো।

ক্যাঁচকোঁচ করে সামনের বড় দরজা খুলে ফেলল নৃপেন। মাকড়শার ঝুল। সামনেই বড় বারান্দা। এখানে নৃপেন অফিস থেকে ফিরে গড়াগড়ি দিত। মুখ ধোবার বেসিনটা ভেঙে পড়েছে। তাতে বোধ হয় পাখির বাসা। একটা কালো পাখি আওয়াজ পেয়েই উড়ে ঘুলঘুলি দিয়ে বেরিয়ে

গেল। জানলার গ্রিলে জং ধরে গাঁথুনি ফাটিয়ে ফেলেছে। পেতলের ছিটকিনিগুলো এখন কালো। ফাঁকা বাড়ির ভেতর মৌমাছি উড়ছে। খুঁজতে হল না বিশেষ। সামনেই রান্নাঘরের বন্ধ দরজার ওপর থেকে মুসকিল আসানের বড় লম্বা চাপদাড়ির মত তিন হাত প্রমাণ ঝুলে আছে। তেমনি মোটা। সারা গায়ে পুরু করে মৌমাছিরা বসে। বড় সাইজের। নির্জন বাড়িতে। কালো।

কালো চেহারার নেপাল শাদা ঝকঝকে দাঁত বের করে বড় একখানা হাসি হাসলো। অনেক মধু আছে নেপেনবাবু। তুমি এই বাঁশের মাথায় কেরাচিনটুকু দিয়ে আগুন জ্বালো। আমি দেখছি।

কামড়াবে তো। করিস কি নেপাল?

আগুন জ্বালো তুমি।

নেপাল একখানা ঝাঁটা জোগাড় করে নৃপেনের হাতে দিয়ে বলল, ঘোরাতে থাকো। নইলে কামড়াবে। বলেই নেপাল নৃপেনের হাত থেকে মশালটা নিল।

চাকের নিচে ধরতেই টুপ টুপ করে মধু খসতে লাগল। আর ফাঁকা বাড়ির ভেতর ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি এলোপাথাড়ি উড়তে লাগল। নেপাল আগুনের শিখাটা ঘোরায় আর নিজের গা থেকে মৌমাছি তুলে তুলে মেঝেতে আছড়ে মারে বাঁ হাতে—তারপর পাথুরে গোড়ালি দিয়ে বাঁ পায়ে থেঁতলে মারতে লাগল। মুখভর্তি হাসি। ফ্যাটা নাক। ভ্রূ নেই। বনবাদাড়ে ফলপাকুড় কুড়িয়ে খেয়ে মানুষ। অনেক মধু বাবু। অনেক—

নৃপেন ঝাঁটা ঘোরাচ্ছিল চারদিকে। তবু কি মৌমাছিদের তাড়ানো যায়। দেওয়াল জুড়ে মৌমাছি বসেছে। সেখানে নেপাল মশালের শিখাটা বুলিয়ে নিল। পট পট করে মৌমাছি ঝরে পড়তে লাগল। যেগুলো আগুনের আওতায় আসেনি সেগুলোকে নৃপেন ঝাঁটাপেটা করে মারলো। দু'চারটে তাকেও কামড়ালো।

বাইরে ফাঁকা মাঠ পড়ে আছে। ধানগাছে এবার ফুল আসবে। গাছ গর্ভবতী হবে। খালের ওপারে গোষ্ঠদের গোয়ালে বসে উমা এ সব কিছুই জানে না।

মশালের আগুনে দরজায় কালো দাগ পড়ে গেল। বাকি দু'চারটে মৌমাছি তখনো উড়ছিল। তাদের ভ্রূক্ষেপ না করে প্রায় ভালুকের মত

শাদা শাদা দাঁতে মুখ এগিয়ে নিয়ে নেপাল হামাগুড়ি অবস্থায় চাকের নিচের দিকে কামড় বসালো। উঃ। কত মধু বাবু!

মশালটা পড়ে পড়ে জ্বলছিল। এককোণে। মেঝেতে কালো দাগ পড়ে গেল। মশালটা তুলে নিল নৃপেন। করিস কি নেপাল? করিস কি?

নেপাল খানিকটা চাক ভেঙে নৃপেনের হাতে দিল। তুমিও খাও বাবু। কি মিষ্টি! ওরা মিষ্টি বলে না। মিষ্টে বলে।

বাড়ির লবিতে নৃপেনের মায়ের ছবি। মৃত্যুর পরে এনলার্জ করার সময় পেছনে মেঘ, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে দিয়েছিল আর্টিস্ট। মশালের আলোয় মুখখানা জ্বলজ্বল করছে।

নেপাল তখনো ভালুকের মত কসে মুখ দিয়ে চাক চুষে মধু খাচ্ছিল। একবার থেমে নৃপেনকে বলল, বাটি নে এসো।

কোথায় পাব? এই! মেঝেতে গড়িয়ে পড়ছে যে—

পড়বেই তো। বাটি নে এসো।

খুঁজে পেতে একখানা থালা পেল। সেখানা তলায় পেতে চাকখানা বেলুনের মত চুপসে কসে ধরল নেপাল। মুহূর্তে থালা বোঝাই। চুমুক দাও বাবু। চুমুক দাও।

চুমুকে শেষ করে নৃপেন আবার থালা পাতল। আবার ভরে গেল। আবার চুমুক দিল। বুঝলো—এ মধু বাড়ি নিয়ে যাবার মত পাত্র নেই সঙ্গে। রেখে গেলে নেপাল খাবে। নয়ত মেঝেতে গড়াবে।

তখন দুটো ভালুক ভাগাভাগি করে খেতে লাগল। চুষে। চুমুক দিয়ে। গলার ভেতরটা চিনির শিরার চেয়েও মিষ্টি হয়ে গেল। গায়ে তিন চারটে মৌমাছির কামড়ের কথা মনেও থাকল না নৃপেনের। তখন দুজনের হামাগুড়ি অবস্থা।

এক সময় চাক ছেড়ে দিয়ে নেপাল মেঝেতে বসে পড়ল। আর পাচ্ছিনে বাবু গো। তুমি খাও এবারে—

আমি তো খাচ্ছি। তুই খা—

না তুমি খাও। আমার মাথা ঘোরাচ্ছে—

আমারও ঘোরাচ্ছে। বলে নৃপেনের খেয়াল হল—জানলা দিয়ে বাইরে থেকে যে আলোটা এসে পড়েছে—তার নাম জ্যোৎস্না। এ দেশে বলে জ্যোৎছনা। এখানে কি আগে আগে চাঁদ ওঠে? হবেও বা! জায়গাটা

কলকাতা থেকে পনেরো মাইল এগিয়ে তো।

নেপাল আবার মুখ দিল চাকে। চাকের আর বিশেষ কিছু বাকি ছিল না। ঝুলে খুলে ফালি হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কোষে কোষে মধু। লাইট জ্বেলে দেওয়ায় চাকটার সাইজ এখন আন্দাজ করা যাচ্ছে। লম্বায় আড়াই হাত হবে। কাঁদতে কাঁদতে কিছু মৌমাছি ফিরে আসছিল। নেপাল তাদের হাতের চাপড়েই ফেরত পাঠাতে লাগল আর হাসতে শুরু করে দিল, কি মধুটাই খেলাম বাবু। তোমায় আর টাকা দিতি হবে না। পেট ভরে গেল একদম।

দু'টাকার কড়ারে চাক ভাঙতে নেপালকে ডেকে এনেছিল নৃপেন।

ভরপেট খেতে দিলে বাবু। তোমার একটা উবগার করি এবারে। চাকটা উপড়ে দি। নইলে আবার এসে জুটবে। বলতে বলতে নেপাল একদম গোড়া থেকে চেছে চাকখানা তুলে ফেলল।

তারপর মেঝেতে বসে জরাসন্ধ বধের মত লম্বা চাকখানা ধরে চেপে চুপসে শেষ মধুটুকু নিংড়ে থালায় ঢালল। নাও। খেয়ে নাও বাবু।

মাথা ঘোরাচ্ছে রে!

খাও না। কিছু হবে না। প্রমাণ বয়সের মানুষ তুমি।

মাথা ঘোরানির ভেতরেও ষোল সতের বছরের ভূয়োদর্শী নেপালের মুখে নিজের সম্বন্ধে এ কথা শুনে নৃপেনের হাসি এসে যাচ্ছিল। তবু হাসল না। নিয়ম নেই তাই। হাসলে ও পেয়ে বসতে পারে এখন।

শেষ মধুটুকু থালায় চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলল নৃপেন। তখন নেপাল নখসুদ্ধ আঙুলে সমস্ত চাকখানা ফেড়ে চিরে তিন টুকরো করে ফেলল। কোথাও যদি কোন মধু থাকে। ফাঁকা বাড়ির লবির দেওয়াল থেকে নৃপেনের মা সব দেখছিলেন। তাঁর মাথার পেছনে আর্টিস্টের আঁকা মেঘ। উল্টো দেওয়ালে একটা ম্যাটমেটে ডুম থেকে সামান্য আলো। জানলা দিয়ে চোরা জ্যোৎস্না।

চিরে ফেলা চাক থেকে একটা ধাড়ি মৌমাছি সোঁ করে বেরিয়ে এসে নেপালের কপালে ঠোকর দিয়েই লবির আকাশে উঠে গেল। ছোট্ট ঘেরা জায়গা। নেপাল বসে ছিল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ব্বাবাগো! বুড়ি মেম কামড়েছে গো! পালাও বাবু।

কি হল রে নেপাল? কি হল—

কোথায় নেপাল! ও তখন একছুটে খালপাড়ে। খোলা আকাশের নিচে।

লবির ভেতর মধু খাওয়া নৃপেন চাকের রাণী মৌমাছিটাকে চিনতে পারল। এখন তার মায়ের ফটোর সামনে উড়ছে। সুইচ টিপে আলোটা নেভানো দরকার। নেপালের ভাষায় বুড়ি মেম গোত্তা খেয়ে নৃপেনের দিকে নেমে এলো। সঙ্গে সঙ্গে খোলা দরজা দিয়ে নৃপেন একদম মাঠে। তারপর খালপাড়ে।

উঃ! এতক্ষণে খোলা বাতাসে মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে এল। বুড়ি মেম এত বড় আকাশের নিচে নৃপেনকে খুঁজে পেল না। মেটে জ্যোৎস্নার ভেতর বাতাসের তোড়ে কোনদিকে ভেসে গেল।

নৃপেন তখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

বেলার হাতে বসানো বোগেনভিলা ঝাড় বারান্দা ঘিরে বাতাসে দুলছে। চাঁদের আলো পেয়ে ছায়াও ফেলেছে। নৃপেন ফাঁকা বাড়ির আলো নিভিয়ে তালা আটকাতে যাচ্ছিল। এমন সময় পরিষ্কার শুনলো তার নাম ধরে কে ডাকছে: নেপেনবাবু। ও নেপেনবাবু।

চারদিক ফিরে তাকাল নৃপেন। কোথাও কেউ নেই। ফাঁকা মাঠের ভেতর বাড়িটা শুধু দাঁড়িয়ে। সামনের দরজা খোলা। আবার শুনতে পেল, ও নেপেনবাবু। নেপেনবাবু—

এবার আর বুঝতে ভুল হল না নৃপেনের। হাঁটার নাম করে মানে মানে দৌড়তেই শুরু করল নৃপেন। পেছনে তার বাড়ির খোলা দরজা। সামনে সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাস। তার ভেতর দিয়ে এলোপাথাড়ি হাঁটতে হাঁটতে নৃপেন টের পেল, তার বাড়ি তাকে ডেকে চলেছে, নেপেনবাবু। ও নেপেনবাবু।

ভারতবর্ষের সঙ্গে দেখা হোল

যখন যা লিখি—তখন তার ভেতর বাস করি। শরীর যতটা বয় ততক্ষণ লিখি। আরও শক্ত করে লেখাটাকে ধরার জন্যে ক্লান্ত শরীরে অনেক সময় ঘুমিয়ে নিই। কিংবা রেকর্ড বাজিয়ে মাথার ভেতরটা খুঁচিয়ে তুলি। ছায়া রাগে ফৈয়াজ। ভীষ্মদেবের তুখয়া।

কিন্তু লেখা শেষ হয়ে গেলে একদম ভুলে যাই। কারণ, লিখে পাতা ছিঁড়ে দিয়ে দিতে থাকি তো। মাঝখানেও মনে থাকে না—গোড়ায় কি লিখেছি। লেখার যখন যেখানে থাকি—সেখানটাই আমার বাসস্থান। কেউ তাই লাইন কোট করে প্রশংসা করলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। নিন্দা করলেও একই অবস্থা। কারণ, কিছুই মনে নেই।

লেখা হয়ে গেলে নতুন লেখায় চলে যাই। কিংবা অবসাদে। আমার যেন কিচ্ছু নেই। বড় অভাবে আছি। কেউ নেই আমার। লেখার পর ছাপা লেখা কখনো পড়িনি। ২।১ বার পড়তে গিয়ে এত বাজে লেগেছে যে ভয়ে আর তাকাইনি ওদিকে। জানিনা অন্য লেখক কি করে তাঁর প্রুফ দেখেন। লেখার ধারাবাহিক ··· হসাব রাখেন। কিংবা রচনাবলীর ক্রমপর্যায় স্থির করে দেন।

এরকম অবস্থায় আমার নিজের গল্পের কথা বলা আমার পক্ষে ভীষণ কঠিন। আমি কোন গল্পই গোড়া থেকে শেষ অব্দি পড়তে রাজি নই। এ-যেন ফুরোনো টিউব টিপে পেস্ট বের করা। কামিয়ে ফেলে দেওয়া ব্লেড কুড়িয়ে আনা। একবার লেখার পর নিজের গল্প ফিরে পড়া যায়? সে তো শাস্তি। কী জন্যে কোন্ কথাটা লিখেছিলাম—সে তো মাথা খুঁড়লেও মনে পড়বে না। এমন কি লেখার সাল সনও ভুলে গেছি অনেক। কোন কোন গল্প পড়তে শুরু করে মনে হয়েছে, অন্যের লেখা। বেশ তো লিখেছেন

ভদ্রলোক। তবে, গল্পের নাম দেখছি মোদ্দা কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছে। গল্প আসলে যে কোন জিনিস নিয়েই লেখা যায়। কারণ, আমার গল্পে কাহিনী একটা যা-কিছু থাকলেও সেটা প্রধান নয়। সেটা জীবনের কাঠামো মাত্র। সেই কাঠামোতে আমি আমার আবিষ্কৃত কোন জীবনবিশ্বাসের ময়াম দিয়ে শরীর বানাই।

শরীর বানানোটা আসলে একটা ভান। নজর থাকে জীবনবিশ্বাস থেকে চোরাগোপ্পা কী বেরিয়ে আসছে সেইদিকে। কখনো সত্য নির্মম হয়ে আপনা আপনি ফুটে উঠলো তো খুব ভালো। কিংবা টায়টোয়ে টিকে থাকার চেষ্টা। মানুষে মানুষে সম্পর্ক। নয়তো হাতঘড়ির কাঁচে 'বাতাসের যে-ফেনা পড়ে থাকে—যা-কিনা র‍্যাশানালিটি দিয়ে হিসেবে মেলানো যাবে না—অথচ সত্য এবং সুদূর কল্পনার চেয়েও কাল্পনিক। মানবজন্মের প্রথম শিকড়ের জটে যার জট। প্রকৃতির অতীত।

হাঁড়ির একটা ভাত টিপে যেমন সব ক'টা ভাত চেনা যায়—তেমনি আধা শহর আধাগঞ্জ—একখানা বড় গ্রাম উল্টে পাল্টে দেখেই আমার দেশ দেখা —মানুষ দেখা। এ-দেখার কোন শেষ নেই। একখানা হাসি হেসে গণেশ নস্কর চলে গেল। বাতাসের সে জায়গাটায় দেখি, গণেশের হাসি লেগে আছে। এই হাসির ওপরের আকাশখানায় কিন্তু গতকালের মেঘখানা নেই। আসলে মানুষকে বাদ দিয়ে তো এই প্রকৃতিখানাই মিছে।

শৈশবে দেখেছি—মা ধান বেচে বড়দার এম এ পরীক্ষার ফি পাঠাচ্ছেন কলকাতায়। বাবা মোরেলগঞ্জ থেকে নৌকোয় করে সম্বচ্ছরের ধান, গুড়, ডাল নিয়ে ফিরছেন। নদীর ঘাটে ভোরবেলা এসে বজরা ভিড়েছে। ভোরের রোদে বাবার গালে শাদা দাড়ির ভুলভুলি। মাছের লক্কের মাথায় অলস চিল। যুদ্ধের সময় আমাদের স্কুলটা এয়ারফোর্সের হাসপাতাল হয়ে গেল। আমরা সরে গেলাম রূপসার খেয়াঘাটে। নতুন বাজার ছাড়িয়ে। মিস ডেভিসের অনাথদের স্কুলে। মাটির মেঝে। গোলপাতার ছাউনি। গুঁড়ো দুধ। ম্যানার্সের ক্লাস। কস্তুরবা গান্ধী মারা যাওয়ায় ফোর্থ পিরিয়ডে ইস্কুল ভেঙে গেল। বৃষ্টি। ক্লাস ঘরের জানলা দিয়ে নদীতে পালতোলা নৌকো দেখা যায়। আবার লবণচোরার গায়ে হিন্দুদের শ্মশানের চিতার আগুনও চোখে পড়ে। সন্ধ্যেবেলা ব্ল্যাকআউট। মিলিটারির দশচাকার লরি। এ আর পি।

এই তো কৈশোর। ছেলেবেলা। কয়লার ডিপো। রেল কলোনী। তারপর ট্রেনে চেপে একদিন কলকাতা। দেশ স্বাধীন। ঠিকেদার। যুবক হতে না হতে মাথা ঘুরে গেল।

থিতু হলাম আরও ১০/১২ বছর পরে। তখন বৌ বাচ্চা উপন্যাস এসে গেছে। ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিমবঙ্গের একখানা গ্রামকে নিজের দেশ করে ফেললাম। আন্দাজে। না বুঝে ভালোবেসে ফেলা। সেখানে এখন আমার হাতে বসানো গাছের ছায়ায় হাটুরে লোক বিশ্রাম নেয়। আমার টেনে আনা ইলেকট্রিকে গমকল চলে। উদ্বাস্তু হয়েছিলাম বলেই হয়তো বাস্তু বানানোর নেশা ধরে ছিল।

তখনই দেখলাম, মানুষের শোণিতে নারী, সাপ, দখল, ভূমি, বৃক্ষ, ফসল, প্রভুত্বকে কেন্দ্র করে ঢেউ ওঠে। মানুষ খুন হয়। ইঁদুর ধান চুরি করে আলে গর্ত খুঁড়ে জমা করে। সে ইঁদুরকে তাড়িয়ে সাপ বাসা করে। সে নিজে তো ফণা দিয়ে গর্ত করতে পারে না। ইঁদুরকে তাড়াবার জন্যে গেরস্থ আলুর চপে বিষ মাখিয়ে গর্তের মুখে সাজিয়ে রাখে। সাপ ধরবার জন্যে সাপুড়ে সে গর্ত হাতড়ায়। ফুড্ গ্যাদারার শ্রেণীর মানুষ সে সাপ তাড়িয়ে গর্তের ধান কুড়োয়। জমি মালিক চাষীবউকে দিয়ে ধান ঝাড়ায়। গোহাল কাড়ায়। চাষীবৌ বাবুর জন্যে পাখি কাটে। আজ বাবুর খিদে নেই। পাখিটা কেটে রাখলে মাংস খারাপ হয়ে যাবে। তাই শনের সরু কাঠি পাখির এ-চোখ দিয়ে বিঁধিয়ে ও-চোখে বের করে নেয়। অন্ধ হয়ে পাখিটা জ্যান্ত থাকবে। কাল বাবু খাবে! টাটকা অন্ধ জ্যান্ত মাংস। পাম্পসু উথলে বাবুর পায়ের মাংস বেরিয়ে থাকে।

ডাক্তারের ছানা হাবিলদার বউয়ের পেটে। ডাক্তারকে ব্ল্যাকমেল করছে নাপিত ও ডাকাত। ভাতের জন্যে হাটবারে স্বৈরিণী হয় চাষী বউ। গোখরোর পুরনো গরল শিশিবন্দী অবস্থায় পুরনো ঘিয়ের চেহারা। এই সব নিয়েই দখল, ধানকেউটে, অন্নপূর্ণা, পরামর্শ ইত্যাদি গল্প লিখেছিলাম। একা একা নির্জন মাঠে থাকতাম। এদের দেখতাম। লেখার সময় ভাষা বা কাহিনী নিয়ে কখনো ভাবিনি। লিখতে লিখতে অফিসের সময় হয়ে গেছে। আধখানা গল্প পকেটে নিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন ধরেছি। অফিস। নিউজ ডিপার্টমেণ্টে টেলিপ্রিণ্টারের অবিরাম শব্দ। বাকিটা অফিসে বসেই লিখে ফেলেছি এক ফাঁকে। ভবেন, সন্তোষ টাকি, ভদ্রেশ্বর, বোকা ডাক্তার,

হাজরা, বেস্পতি, ভগীরথ, চুনী, জি পাল—এরা তো আমায় শ্যামল বাঙাল বলেই জানতো। আমিও ওদের জানতাম—পৃথিবীর একখানা গাঁয়ের ক'জন মানুষ হিসেবেই। এমন হয়ে থাকে—বলে আমরা অনেক জিনিস গ্রহণ করি। এই মানুষজনও তাই। এরাই দেশ। এরাই ভারতবর্ষ।

বোরোধান সেচের পাম্প সারাতে নিয়ে গিয়েছিলাম রেল লাইনের ওপারে। রিক্সায় করে। ধান জ্বলে যাচ্ছিল জলের অভাবে। সারিয়ে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। যা বেশি দিতে চাই তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে তিন চাকার রিক্সাওয়ালা। একটু একটু করে জানি ওর মন। বেশি অর্থকে ভয় পায়। রেল-প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থাকে—মানুষের উপকার করবে বলে। ওকে নিয়েই চন্দনেশ্বরের মাচানতলা। এই ভাবেই দেখা হয়েছিল বারুইপুর স্টেশনে বিপিন বিশ্বাসের সঙ্গে। বাড়ি মাদারহাট। সঙ্গে ব্যায়লার বাক্স। তারা বাজি গল্পে সাপের বিড়ে পাকানো মাটির দেওয়াল দেখেছিলাম পড়শী অভয় মণ্ডলের শোবার চৌকির পাশে। যুদ্ধ গল্পের হাজরাকে এখনো চোখ বুজলে দেখতে পাই। সে ব্যাঙ ধরার ছিপকে বলতো যন্তর। ব্যাঙের মোবাইল জেলখানা তাড়ি খাবার কলসী। মুখে নারকেল মালার ঢাকনা। বুকে ঝুলিয়ে হাজরা রেল লাইন বেয়ে ফিরে আসতো ভোর ভোর। চোখ লাল। কাঁধে ছিপ।

হাজরা নম্বরের যাত্রাসঙ্গী গল্পের হাজরা সেবারে শাকসয়ের হাট থেকে বলদ কিনে ফিরলো। কর্ষণ মানুষের প্রথম শিল্প। সেই চাষবাসের শিল্পে মানুষের প্রথম যন্তর—বলদ। এই বলদের সঙ্গে হাজরা আটার রুটির টিফিন ভাগ করে খেতো। তার সঙ্গে কথাও বলতো। বেহিসেবী বউয়ের বিরুদ্ধে নালিশ সে তার বলদদের শোনাতো। লেজ মুচড়ে মুচড়ে। হাল দেবার সময়।

এম এ পাশ করে আমার বড়দা কলকাতা থেকে এক ব্যাগ কয়লা নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের দেখাতে। সে সময় কয়লা, পটল আর আলু পূর্ববঙ্গে কম পাওয়া যেতো। আমার ছোট ভাই তখন শিশু। সে এক পিস কামড়ে দেখেছিল—জিনিসটা কেমন। তখন আমাদের বাড়িতে কাঠের আঁচে রান্না হত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কগুলো কী হয়ে যাচ্ছে—তাই নিয়ে কুকুর, সন্তান ও ভাই বিষয়ে লিখেছিলাম—গতজন্মের রাস্তা।

লক্ষ্মণ আমার বউকে ধান মেপে দিতো। ফিরে বিয়ে করার সময় আমার

একটা শাদা বুশ শার্ট গায়ে দিয়ে গেল। সুন্দর ইট কাটতো। ফর্মা সই সই। আমার হয়ে শাদা বালি এনেছে। খাল কেটেছে। গাঙ থেকে সামুদ্রিক কাঁকড়া এনেছে সস্তায়। দোসরা বউ নিয়ে বাড়ির বারান্দায় দোলনায় দুলতো। সময় মত নিড়েন দেয়নি বলে ওই অবস্থায় ওকে দোলনায় পেয়ে খুব ধাতিয়েছিলাম। নেফ্রাইটিসে ফুলে গেল লক্ষ্মণ। কোন ওষুধে কাজ হয় না। শেষে আত্মঘাতী হোল শেষ রাতে। মরার আগে পা দিয়ে হ্যারিকেনটা উল্টে দিয়েছিল। খবর পেলাম ভোররাতে। ওর দাহের জন্যে টাকা নিয়ে ওর খুড়ো বাংলার সঙ্গে জর্দাপান চিবিয়ে সন্ধ্যে সন্ধ্যে ফিরলো। ওর বাপ ক'দিন পরে কেরাচিন আনতে যাবার পথে ফলা ধান মন দিয়ে হাতে ঘষে দেখছিল—আর গাছ সোজা করে দিচ্ছিল। আমার আবার বিশ্বাস হোল—জীবনে তো এমনই হয়। এমনই তো হওয়ার কথা।

সন্তানসন্ততির মতই মানুষ তার গৃহপালিত পশু, বাস্তবাড়ি, গাছকে ভালবাসে। মানুষ তার বাড়ির সঙ্গে কথা বলে। খাদ্যের জন্যে মৌচাকও চিবিয়ে বসে। সে তখন মৌমাছির সঙ্গে ভালুক হয়ে যুদ্ধে নামে। মধুর জন্যে। এসব নিয়েই নৃপেনদের বাড়ি। সেই ভাবেই জানি—জীবনে হারানো প্রেম—গুণীনের হাত ফসকানো গোক্ষুর সাপ। সে শুধু পালিয়ে ফেরে—আর ফিরে ফিরে দংশাতে চায়।

গণেশ দেখতে সত্যিই কন্দর্প। ভীষণ তোতলা। কিন্তু দাবি করেছিল, গান জানে। মিনিটে কুড়িটা মিথ্যে কথা বলতো। ফাইজারের পাউডার খাইয়ে মুরগির ডিম বড় করলাম। কিন্তু ডিম হয়ে গেল রাজহাঁসের সাইজ। ডিম পাড়তে গিয়ে মুর্গির মৃত্যু। অত মাংস খাবে কে? গণেশ মজুত। সে খেতেও পারতো। খায় আর তুতলে তুতলে গান গায়। সঙ্গে দু'টো করে মিথ্যে কথা। আমার জায়গা তখন চষে। সেই সুবাদে আমি ওর বাবু। আমার গিন্নি আমাদের এই অ-ভদ্দরলোকের কাণ্ডকারখানা দেখে তিতিবিরক্ত। এর ওপর আবার গণেশের নিজের ফিরে ফিরে বিয়ে করার বাই ছিল। আমরা মহানন্দে তাড়ি খাচ্ছিলাম। আর পৃথিবীর রস বুকের ভেতরে নিয়ে নিচ্ছিলাম। সেই সময় শীর্ষেন্দু একটা পুরস্কার পায়। সাহিত্যের জন্যে। পার্ক হোটেলে। কী সব দুর্দান্ত গল্প লিখছিলো। সুনীলও। মতিও। কারও সঙ্গে যোগ নেই আমার। আমাদের খালপাড়ে তখন বিকেলের দিকে

মহাভারতেরও আগেকার ওয়েদার। খুন। সাপের খোলস। সন্ধ্যার আদি ছায়া। ঝিঁঝি পোকার পিঠে আলগোছে জল ঢেলে দিয়ে আমার বউ ক্লিক্ ক্লিক্ সেই অবিরাম বাজনাটা থামায়। গণেশ বোনের বিয়ে দেবে বলে দু'টো ছেলেকেই গায়ে হলুদ মাখিয়ে রেখেছে। পায়ে দড়ি বেঁধে। একটা পালালে তো আরেকটা আছে।

জীবনে এরকমই হয়। ইট হ্যাপেনস্। শীতের সকালে বারো মাইল বাইক করে গরাণবেড়ে গেলাম। পথে বিদ্যেধরীর শুকনো বুক। ক্ষেতের ঝাঝালো মুলো তুলে খাবো। ভোর রাতের ঠাণ্ডা শন শন বাতাসের হাত থেকে বাঁচতে মাফলার দিয়ে কান পেচিয়ে মাথা বেঁধেছি। গিয়ে থামলাম এক বুনো তেঁতুলতলায়। সকালবেলার রোদে ক'ঘর বসতি। তাদের বাপ, কাকা, জ্যাঠা, ঠাকুর্দার দাহের জন্যে গাছের এক একখানা ডাল বরাদ্দ। ওদের কোন্ এক পূর্বপুরুষ অতীতকালে নৌকো বেয়ে চলে গিয়েছিল। তখন বিদ্যেধরীর বুকে জল ছিল। সে-যদি ফিরে আসে—তাই তার জন্যেও একখানা বুড়ো ডাল বরাদ্দ করে রাখা আছে। বিশ শতকে একথা ভাবা যায়! কিন্তু এমন হয়। এরা কেউ সেক্সপীয়রের ভাইপো ভাগনে নয়। তবু হোরেসিওকে সেই কথাটা বলতে ইচ্ছে হয়। পূর্বপুরুষ কতকাল আগে উধাও। সেই সঙ্গে নদীও উধাও।

কিন্তু জীবনে এমন হয়। তার সঙ্গে হলেও-হতে-পারে এমন আরও কিছু মিশিয়ে দিয়ে দেখি না—কি হয়।

আমার লেখাও বোধ হয়—জীবনে এমন হয়-এর মতই কিছু একটা।

প্রিয় হোরেসিও। তোমাকেও আমি একই কথা বলতে পারি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়